CENTRAL LIBRARY

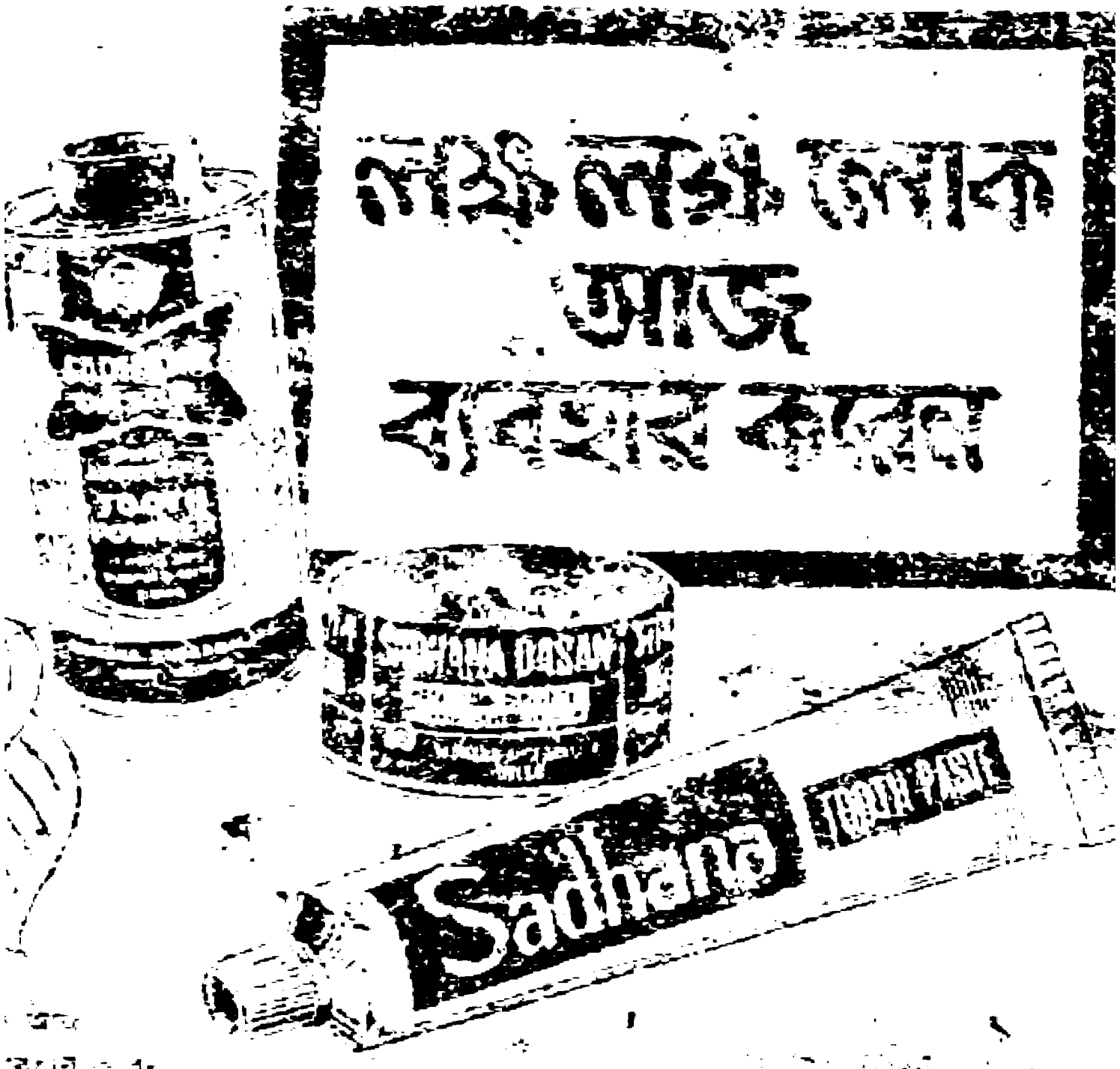

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

শতবর্ষ উপলক্ষে শরৎচন্দ্রকে জানাই আমাদের শতকোটি প্রণাম

অমর কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সন্দীপন পাঠশালা ৯৲ অভিযান ৯৲ যোগভ্রষ্ট ৯৲

উত্তরায়ণ ৭॥ সংকেত ৭৲ কবি ১০৲ না ৬৲

মহাসাধক মহাতপস্বী মহাপুরুষের মহান জীবনী

সন্ন্যাসিনী আশাপূরী (সংসার জীবনে বিখ্যাত লেখিকা) লিখিত

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ মহারাজের পুণ্যজীবন কথা

অমর জীবন ১০৲

বিমল মিত্রের

তিন নম্বর সাক্ষী (২য় মুদ্রণ) ১০৲

সমরেশ বসুর

অবরোধ (২য় মুদ্রণ) ১০৲

নিমাই ভট্টাচার্যের

নাচনী (২য় মুদ্রণ) ৭৲

আশাপূর্ণা দেবীর

যে যার দর্পণে (২য় মুদ্রণ) ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অমৃত পাত্রখানি (২য় মুদ্রণ) ৮৲

জরাসন্ধের

নিঃসঙ্গ পথিক ১৮৲

(১ম খণ্ড— ৩য় মুদ্রণ)

প্রমথনাথ বিশীর

অবিস্মরণীয় নাট্যোপন্যাস

বেনিফিট অব ডাউট ১০৲

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

রচনাবলী

১ম খণ্ড—২০৲ ২য় খণ্ড—২০৲

৩য় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

শত রূপে দেখা ১০৲ পঞ্চতপা ১৬৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ভোরের আকাশ ৬॥ ক্লান্ত বহ্নি ১১৲

টলস্টয়ের

ওঅর এণ্ড পীস (৩য় খণ্ড) ১৬৲

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

তরুণকুমার ভাদুড়ীর

নূতন অবদান

কাগজের নৌকো ১০৲

লেখকের আর একটি উপন্যাস

সন্ধ্যাদীপের শিখা ৫৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ ফোন ৩৪-৩৯১২ ৩৪-৮৭৯১

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রকাশিত হয়েছে! (ছোটদের বিজ্ঞান সাহিত্য)
দেবদাস দাশগুপ্তের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

আজব কল (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত) ৪.

আকাশ ও পৃথিবী (২য় সং)
(রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

পরাভূত প্রকৃতি (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত) ৩.

চাঁদের দেশ ৩.

সদ্য প্রকাশিত! অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রশস্ত হলঘর ৬.

আমাদের প্রকাশিত বি টি/বি এড্. পাঠক্রমের
কয়েকটি অপরিহার্য পুস্তক—

প্রশ্নোত্তরে বি-এড্ সহায়িকা
(১ম হইতে ৬ষ্ঠ পত্র
অধ্যাপক অশোক গুপ্ত

গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি
অধ্যাপক এস চট্টরাজ

A Hand Book Of Teaching English
Prof. ASOKE GUPTA

ভূগোল শিক্ষণ পদ্ধতি সহায়িকা
অধ্যাপক অরুণশঙ্কর পাল

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিক্রমা
অধ্যাপক অশোক গুপ্ত

বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি
অধ্যাপক গৌরমোহন রায়

ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি
চক্রবর্তী ও মজুমদার

শিক্ষায় ও বৃত্তিতে নির্দেশনা
অধ্যাপক দেবাশীষ পাল

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন
অধ্যাপক অশোক গুপ্ত

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস
বেদুইনের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

কারপদধ্বনি ১২.

প্রলয় সেনের অসামান্য উপন্যাস

কয়েদখানা ১২.

দেবেন্দ্র মৈত্রের

জোড়া ইস্পাতে রং ৮.

বড়গেজমিটারগেজ ৮.

সুভাষ সিংহের

মধ্যসমুদ্রে ৫.

লৌরেন চৌধুরীর

অরণ্যমনঅরণ্যক্ষুধা ৮.

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের

বিবশ শর্বরী ৩.

সুভাষ চক্রবর্তীর

তুলাদণ্ড ৫.

অবিশ্বাসী মন ৪.

রূপে রূপে ৩.

দিলীপ মৌলিকের

রাতের কান্নায় ভোর ৩-৫০

প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আলোর ঝিনুক ২-৫০

সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৫।৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৫ বর্ষ

অমৃত

ইণ্ডিয়ান প্রেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক
পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 1st August, 1975 শুক্রবার, ১৫ শ্রাবণ, ১৩৮২

সূচীপত্র

শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৭৫

দাম ২-০০ টাকা

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৯	সম্পাদকীয়	
১০	তরুণ লেখকদের প্রতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১	রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র	

যুগের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

প্রকাশিত হল চিরঞ্জীব সেনের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী

সিক্রেট সিগন্যাল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক অসাধারণ স্পাই কাহিনী। চমকপ্রদ তো নিশ্চয়ই বলতে কি এই স্পাই কাহিনী কল্পনাকেও অতিক্রম করেছে। সেই স্পাই ধরা দি সেঞ্চুরি কিন্তু আজও ধরা পড়েনি। —দাম ১০-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

অন্যায় খেলা ৫-০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রহস্য কাহিনী

সোনার পিতলমূর্তি ৭·

সন্তোষ ঘোষের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

গুড্-বাই ক্যালিফোর্ণিয়া ২০-০০

আব্দুল জব্বারের সাড়া জাগানো নতুন উপন্যাস

রাত পাখির ডাক ১২-০০

সদ্যপ্রকাশিত কবিতা সিংহের আধুনিক উপন্যাস

চারজন রাগী যুবতী ৬-০০

শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

দুজন একাকী ৫-০০

এ. সি. সরকারের রোমাঞ্চকর উপন্যাস

আনন্দ চুমকী ৮-০০

কপাল গুহ ঠাকুরতার নতুন উপন্যাস

জল শুধু জল ৮-০০

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

স্বপ্নের ধ্বনি ৮-০০

বাসুদেব বসুর নবতম উপন্যাস

রাজগৃহে রাজা নেই ৬·

কাঁদিছে মৃত্তিকা ৫·

নরেন্দ্র কৃষ্ণতীর্থের মনমাতানো উপন্যাস

স্বর্ণ মৃগয়া ৪-০০

বনে বনান্তরে ৭·

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

এই জীবন ৫-০০

সুবোধ ঘোষের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

পুনর্ণবা ৪-০০

সুশীলকুমার নাগের নতুন উপন্যাস

দ্রৌপদী প্রেম ৬-০০

নিশাচরের রহস্যোপন্যাস

রক্ত ঝরা সন্ধ্যায় ৫-০০

তিন তাসের খেলা ৫-০০

পরিচয় গুপ্তের এক্সক্লুসিভ কাহিনী

পাতালে লম্বুদা ৩-০০

রমেশ মজুমদারের নতুন গল্পগ্রন্থ

ফুলপরীর দেশে ৩-০০

অমরনাথ রায়ের নতুন হাস্যরস কাহিনী

বীরবলের সরস গল্প ৩-০০

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন, কলি-৯
ফোন : ৩৪-১৫৯২

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার
বিদ্যাসাগর ৬৲

শ্রীবীরেশ মজুমদার
শ্যামাপ্রসাদ ৫৲

ডঃ অমলেন্দু বসু
সাহিত্যালোক ১০৲

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-চর্যা ১০৲

ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী
রবীন্দ্রসংগীত ১২৲

অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
স্মৃতিভারে ৫৲

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
রেভাঃ লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ৬৲
(১৮৫১ সনে প্রকাশিত উপন্যাস)

হানা ক্যাথেরীন মুলেন্স রচিত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ৫৲
(১৮৫২ সনে রচিত বাংলা উপন্যাস)

শিবরাম চক্রবর্তী
আমি তখন ছেলে-গুস্থের নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ
চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে ৬৲
দিনগুলি মোর কোথায় গেল ৬৲
এই লেখকের প্রথম অপরাধীদের দ্বিতীয় খণ্ড বই **এতটুকু ভুল ৩৲**

ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য
এক দিগন্ত দিনান্তের ৬৲

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
গ্রন্থাগার বিদ্যা ৮৲

চিত্রিতা দেবী
ঔপনিষদ ৫৲
ইশ, কেন কঠ ও শ্বেতাশ্বতর—এই চারিটি উপনিষদের সরল বাংলানুবাদ

অমিতা রায়
চেনাশোনার বাইরে ৫৲

কণা সেনগুপ্তা
ডলারের দেশে ৪৲

ভট্টাচার্য
হিমালয়ের চিঠি (প্রথম খণ্ড) **৬৲** (দ্বিতীয় খণ্ড) **১২৲**

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার ৫৲

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চার্লি চ্যাপলিন ৩৲

॥ ছোটদের বই ॥

ষোলজন লেখকের গল্পসংকলন
বাজিকরের ঝাঁপি ৩৲

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
একদা যাহার বিজয় সেনানী ২৲

রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবাজী মহারাজ ১৷৷

চন্ডী লাহিড়ী রচিত ও চিত্রিত
মানুষ কি করে মানুষ হল ২৲

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
করে দেখ (দুই খণ্ডে) প্রতি খণ্ড **২৲**

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
পৌরাণিকী ১৷৷

(জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত ও পরিবেশিত)

জেনারেল বুকস্
৩-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১৫	'পথের দাবী'র প্রকাশন প্রসঙ্গ	শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২১	পাণিত্রাসে শরৎচন্দ্র স্মৃতিচারণ সাক্ষাৎকার	শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
৪১	কাশীনাথ (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬০	শরৎদা প্রসঙ্গে	শ্রীরাধারাণী দেবী
৬৬	শরৎচন্দ্র নিকটআত্মীয়ের চোখে	শ্রীনন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়

অজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকীতে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম!

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক—প্রমথবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৮ম সংস্করণ 12.00

ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড ৩য় সংস্করণ 7.00

ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড ২য় সংস্করণ 7.00

পাশ্চাত্য দর্শন—১০ম সংস্করণ 12.00

নীতিবিজ্ঞান (Ethics)—
৮ম সংস্করণ 12.00

মনোবিদ্যা (Psychology)—
৭ম সংস্করণ 22.00

Hand Book of Social Philosophy—
2nd edition 16.00

পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
৫ম সংস্করণ 12.00

পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বড়সাইজ)

ধর্মদর্শন Philosophy of Religion) 22.00

সমাজ-মনোবিজ্ঞান 10.00

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক অতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ 14.00

ভারতের শিক্ষা সমস্যা—৩য় সং 15.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৩য় সংস্করণ 22.00

শিক্ষক শিক্ষণ (B.Ed., Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস গুলদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিদর্শন 16.00

শিক্ষণ পাঠের অর্থবীতি ও পৌরবিজ্ঞান 14.00

শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস 15.00

অধ্যাপক গুলদার ও রায় প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস 16.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ পাঠের মনোবিজ্ঞান 25.00

অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব 16.00

BP ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ: কলেজ রো: কলি-৯
ফোন ৩৪-৭২০৪

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

শেক্সপীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। আক্ষরিক অনুবাদ। ৩৭টি নাটক, ৪টি দীর্ঘ কবিতা এবং ১৫৪টি সনেট। চারটি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহক-মূল্য বাট টাকা। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন। সুদৃশ্য জ্যাকেট এবং মজবুত বাঁধাই। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

মপাসাঁ রচনাবলী

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। দুই খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাহকমূল্য চল্লিশ টাকা। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১ম) শেখর সেনগুপ্ত (২য়) সুনীলকুমার ঘোষ (৩য়)।

গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই তিন খণ্ডের পরিবর্তে মপাসাঁ চার খণ্ডে সমাপ্ত হবে বে-জন্য দশ টাকা মূল্য বৃদ্ধি হলো। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

কৌটিল্য গুপ্ত'র সর্বাধুনিক উপন্যাস

পাথরের শিহরণ ১০

বিদগ্ধ বাংলা সাহিত্য সমাজে কৌটিল্য গুপ্ত আজ তুমুল বিতর্কিত। তাঁর 'ব্লেয়ারস্ ক্যাবারে' উপন্যাসটি ধনিক শ্রেণীর যেমন মুখোস খুলে দিয়েছে, 'বারোভ্যাসী' তেমনি সরকারী আমলাদের উদ্ঘাটিত করেছে। 'পাথরের শিহরণ' লেখকের আর একটি ইনটেলেকচুয়াল লেখা। এই উপন্যাসে লেখক হোয়াইট হর্স-এর চেপে হোয়াইট লেবেল-এ চুমুক দিতে দিতে দরন্ত বেগে ছুটেছেন।

অবধূত-এর **ভোরের গোধূলি ১৫,**

আমার চোখে দেখা ১০,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস — প্রখ্যাত লেখকদের সঙ্কলন

অভিনেত্রী ৬, **অন্তরঙ্গ শরৎচন্দ্র ৬,**

তরুণ অমিয়কুমার সেন — সুনীল চক্রবর্তীর

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ১০, **আমি মন্ত্রী হব ১০,**

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

Crompton Greaves'

ingenuity makes WALLITE something more than a decorative lighting fitting... a plug point for electric gadgets!

Wallite would add to the appearance of your dining room, bathroom or kitchen. Now, note that switch/socket device for electric appliances. See how easy it makes it to use your hair-drier, shaver or kitchen mixer? Handy, isn't it?

The features you can't see right away:

- The non-yellowing diffuser for glare-free illumination
- The stove-enamelled reflector for proper light distribution
- The polyester-filled choke for long, dependable service.
- The separate earthing terminal for safety against shock
- Suitable for 600mm/20w and 1200mm/40w tubes.

Now, consider. Doesn't your home deserve one? Or the home of somebody you owe a gift?

Crompton Greaves lighting –
double-tested for performance

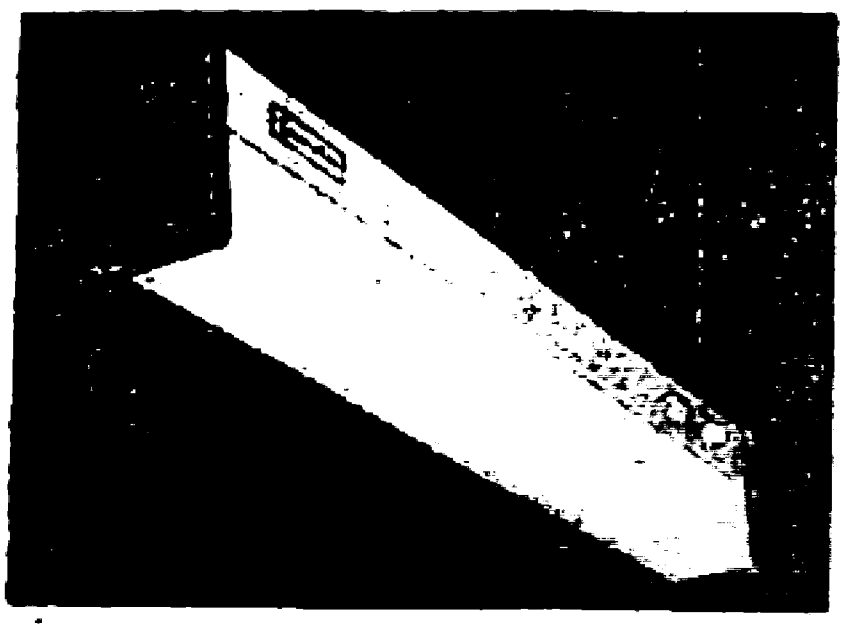

Crompton Greaves Lighting Division

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৭১	শরৎচন্দ্রের স্মৃতিজ্যোৎস্না	শ্রীদিলীপকুমার রায়
৭৭	শরৎসাহিত্যে নারী	শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ
৮৩	ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র (নাটক)	শ্রীমন্মথ রায়
১০৯	শরৎকাহিনী : মঞ্চে ও পর্দায়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
১১৫	শরৎচন্দ্র : সংক্ষিপ্ত জীবনী	শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
	অলংকরণ :	শ্রীধ্রুব রায়
	প্রচ্ছদ :	শ্রীতুষার সান্যাল

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল
হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৬৫, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫ এবং ৫০ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস : ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

॥ অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন। ॥

: এবার পূজোয় প্রকাশিত হচ্ছে :
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত
উৎসব
সেপ্টেম্বর মাসে বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। ছোট ভাই-বোনেরা এখনি ১ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হও। গ্রাহক হলে ৬ টাকায় পাবে। সমস্ত নামী লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রচুর ছবিসহ এবং মনোরম রঙিন প্রচ্ছদে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।
উৎসবে যা থাকছে : অ্যাডভেঞ্চার গল্প/হাসির গল্প/মজার/ গল্প/পুরাণের গল্প/ভূতের গল্প/রহস্য গল্প/সায়েন্স ফিক্সান / অনুবাদ / খেলাধুলো / নাটক/ছড়া/কবিতা প্রভৃতি।

: প্রকাশিত হয়েই আলোড়ন তুলেছে :
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত
জলছবি
আংশিক লেখক-সূচী :
সত্যজিৎ রায় ॥ জরাসন্ধ ॥নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ আশা দেবী ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ চিরঞ্জীব ॥ বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ আব্দুল জব্বার ॥ চিরঞ্জীব সেন ॥ সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শচীন বিশ্বাস ॥ হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি। ছোট দের উপহার-উপযোগী মনের মতন বই। সুন্দর রঙিন প্রচ্ছদে মোড়ানো এবং ভিতরে ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। দাম ১২-০০

এবার পূজোয় প্রকাশিত হচ্ছে ॥ যে বই আলোড়ন তুলবে ॥ আগেই গ্রাহক হয়ে রাখুন
দেশ বিদেশের ভৌতিক গল্প
সম্পাদনায় শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫ টাকা, ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ১৫ টাকায় পাবেন। অপূর্ব প্রচ্ছদে মোড়ানো হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে

শেক্সপীয়ার রচনাবলী • টলস্টয় রচনাবলী • মোপাসাঁ রচনাবলী • গিরিশ রচনাবলী
৪ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫ টাকা ॥ ৫ খণ্ডে—প্রতি ১০ টাকা ॥ ৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১২ টাকা ॥ ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১৫ টাকা ॥ প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহকমূল্য ৫ টাকা। গ্রাহক হবার ও মনিঅর্ডার পাঠানোর মূল কেন্দ্র : জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিঃ-৯

যখন বৃষ্টি নামল

চলুন শান্তিনিকেতন

বর্ষা যখন তার মেঘময় বেণী এলায়, তখন শান্তিনিকেতন অপরূপ। খোয়াই জুড়ে বৃষ্টির মাতন, কোপাই নদীতে ভরা জোয়ার, শালবীথিতে ঝড়ের দোলা এবং আম্রকুঞ্জে মাধবীবিতানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গান আর গান। এই সময় শান্তিনিকেতন মোহময়ী, কেয়ার গন্ধে মদির; বর্ষা উপভোগ করতে হলে এই সময়েই যেতে হয় শান্তিনিকেতন।

তার সঙ্গে দেখতে পাবেন রবীন্দ্রসদনে গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি, নোবেল পুরস্কারের মেডেল, কবিপত্নীর বালুচরী শাড়ি, রমাতলের অবনীন্দ্র-নন্দলালের ছবি,

রামকিঙ্করের ভাস্কর্য, কালোমাটির বাসা শ্যামলী এবং বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ ও বর্ষামঙ্গল উৎসব।

চলুন শান্তিনিকেতনে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার। বর্ষা কেমন আকাশ কালো করে ধেয়ে আসে, দেখতে পাবেন ট্যুরিস্ট লজে বা ট্যুরিস্ট কটেজে বসে।

বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ ইস্ট

কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২৩-৮২৭৫

গ্রাম : TRAVELTIPS

পর্যটন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/Ta 333/75

সম্পাদকীয়

শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের প্রীতি-অভিনন্দন বাণী প্রতিধ্বনি করে আজ শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা অর্পণ করি : "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাঁর অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি।" শরৎচন্দ্র শিল্পীর অপরিসীম উদারতায় তাঁর ঋণ স্বীকার করে গেছেন সেই বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীড়িতদের প্রতি সংসারে যারা শুধু ঠিকে গেলে না কিছুই, মানুষ যাদের চোখের জলেরও কখনো হিসাব নেয় না। শরৎচন্দ্রই বাংলা কথা-সাহিত্যকে দিয়েছেন তার লোকায়ত উপকরণ, সবলীল ভাষা আর অসম্মান মানবিকতা। গোটা ভারতীয় সাহিত্য তাঁর কাছে এ জন্য ঋণী। তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই উদযাপিত হওয়া উচিত। আমরা তাঁর প্রতি জানাই সকৃতজ্ঞ প্রণতি।

তরুণ লেখকদের প্রতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

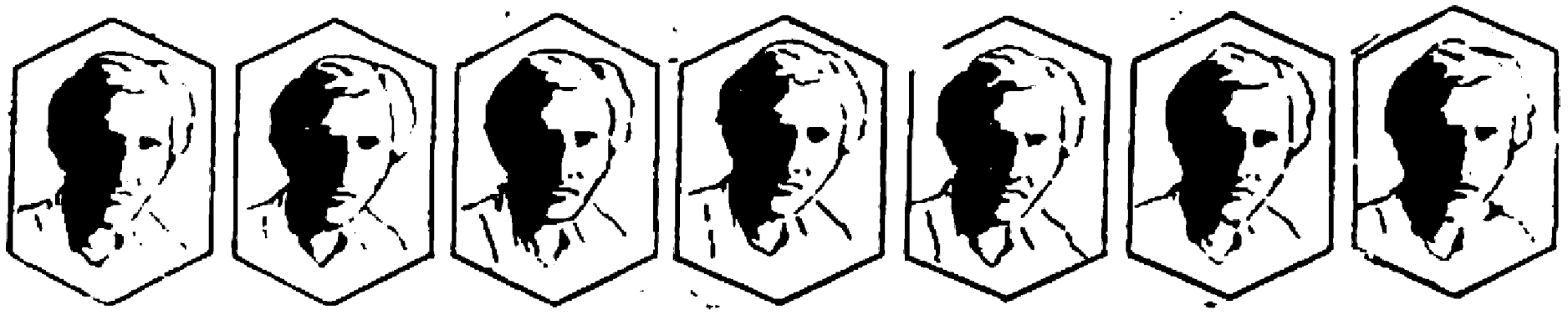

তোমার খাতাখানা বড় মন দিয়া পড়িবার অবকাশ পাইয়াছি। পড়িতে পড়িতে কি মনে হইয়াছে জানো? একটা কী ক্রিনিসের লোকান অগ্রহায়ণ এলো-মেলো হইয়া পড়িয়া থাকিলে যে জিনিসের যে জায়গায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয়—ঠিক তেমনি। ঠিক এই অবস্থায় একদিন বাঁড়ির খোকাকে পাইয়াছিলাম।

তোমার অনেক প্রশংসার মালমশলা মজুত আছে দিদি, কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। আমার মনে হয় তুমি ও তোমাকেও যদি হাতে ধরিয়া বহুত কিছুও শিখাইতে পারিতাম তবু ইতিপূর্বে আমি যে আশীর্বাদ তোমাকে করিয়াছিলাম তাহা শাখায় শাখায় ফুলে-ফলে ফুটিয়া উঠিতে বেশি দেরী হইত না। দিদির মত একখানা বই লোকের চোখের উপর তুলিতে অতি অল্প সময়ই লাগিত। কিন্তু যখন হইবার নয় তখন দুঃখ করিয়া কি করিবে, মনে ভাবি এমনতর করা শুধু একটুখানি লেখানোর অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কে তাহার খবর রাখে! শুধু যে সব আবর্জনা, বাজে কেবল চুবি করা ছাড়া আর কোন শক্তিই ধরে না তারই বেশ কড়ি কড়ি লোগো দিয়া বাংলা সাহিত্যকে দূষিত এবং ভারাক্রান্ত করিতেছে। যারা সংসারে সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, নিজের প্রাণ দিয়া যারা স্নেহ প্রেমের স্বরূপ অনুভব করিয়াছে, তারা অমনি পড়িয়া থাকে। দূরের আগুনে পুড়িয়া যাদের অনুভূতি শুদ্ধ ও সৎ হইতে পারে নাই—তাদের উপরেই আজকাল সাহিত্য সৃষ্টির ভার পড়িয়াছে বলিয়াই বাংলা সাহিত্য আজকাল এমন করিয়া নীচের দিকে চলিয়াছে।

লীলা কেবল হৃদয় অনুভব করিলেই একটা ক্রিনিস ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত ক্রিনিসই কিছু-না-কিছু শিখিতে হয়, এই শেখাটা কেবল নিজে নিজেই সব সময়ে হয় না।...

যাই হোক, তোমাকে মোটামুটি একটা উপদেশ দিই। রচনায় 'অধ্যায়' ভাগ করিতে হয়, এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশি ক্রিনিসটা লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে মাঝারেও দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়। অনেক জিনিস তাহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা গ্রন্থকার বলিবে এবং কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষা-সাপেক্ষ, এবং বুদ্ধি-সাপেক্ষও বটে।

এখন হইতে সত্যকার শিক্ষা আরম্ভ হোক। অধ্যায় ভাগ করিয়া আমার বইয়ের ধরনে লিখিতে শুরু কর এবং দুটো অধ্যায় করিয়া লিখিয়া আমাকে পাঠাও। আমি কাটিয়া-কুটিয়া (আমার সামান্য শক্তির মত) তোমাকে ফিরিয়া পাঠাইব। এবং তাহারই পাশে পাশে কেন কাটিলাম তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া দিব।...

তোমার খাতাখানা ২ দিন পরে ফেরাইয়া পাঠাইব। 'কালো' গল্পটাকে অধ্যায় ভাগ করিয়া আমার 'পরিণীতা'র ধরণে অন্তত একবার পাঠাইতে পারো না? দিদি, প্রথমে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট করিতে হয়, অসহিষ্ণু হইলে হয় না। এ জিনিস এত বড় এত পরিশ্রমের বলিয়াই ইহার এত মূল্য। অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় বটে, কিন্তু কোন পরিশ্রমই কোনদিন সত্য সত্যই নষ্ট হয় না—আর একভাবে ফিরিয়া আসে।

---

* লীলারাধী অনুরোধ করায় লেখা এই

দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN BENGAL

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর সৃষ্টি প্রেমের আসনে,
মৃত্যু তার মৃত্যু নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'।

১২।১।৩৮
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল অনেকটা গুরু-শিষ্যের মত। রবীন্দ্রনাথের রচনা শরৎচন্দ্র
সাধনায় তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শরৎচন্দ্র নিজেই একথা অনেকবার বলেছেন, রবীন্দ্রনা
াথের বাণী থেকে তিনি কিভাবে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা
একাধিকবার গেছেন, রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের কলিকাতার বাড়িতে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতই
াধনায় উদ্দীপিত লেখক। তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এবং সাহিত্যের ভেতর তার অন্ত
কিন্তু তা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখেও তাঁরা কোন কোন সময়
র বিমত পোষণ করেছেন। 'পথের দাবী' উপন্যাসখানি বাজেয়াপ্ত হবার পরও এরকম একটি
আমরা তাঁদের দুটি চিঠি প্রকাশ করছি যাতে এই মতান্তরের প্রমাণ পাওয়া যাবে, যদিও শরৎচন্দ্র
বির প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁকে বাণী দিয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে ভা ভালবাসতেন, শরৎচ
তিনি লিখেছিলেন এবং যা উপরে উদ্ধৃত হল তা থেকেই সুস্পষ্ট।]

পথের দাবী পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ৩১ আগস্ট, ১৯২৬ খৃঃ (ভাদ্র ১৩৩৩)।

ঐ বছরই ইংরাজ সরকার বইটি রাজদ্রোহাত্মক অপরাধে বাজেয়াপ্ত করে। রাজদ্রোহমুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৫৪।

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করার বার্তা শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পথের দাবী পড়ে এবং তাঁর মতামত চান। শরৎচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল রবীন্দ্রনাথ যদি সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তাহলে হয়তো বইখানি পুনর্বার প্রকাশিত হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে লেখেন—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসকদের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলা লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা সিদ্ধ না হতে পারে—কারণ, লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে দুরাত্মা মনে করেন, তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরে উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করে থাকি সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম—একমাত্র ইংরেজ গবর্মেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বন্ধুবধতা আর কোন গবর্মেণ্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোর নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ যাচ্ছেতাই দেখাতে চাই, তবে সেই পরুষের বিড়ম্বনাতে—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজদ্বারে আছে পরের জোর তার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অন্তরঙ্গ থাকা উচিত চারিত্রিক জীবন। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু ভূমিকা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ-রাজের কাছে নয়, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার বাধাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার শাসন এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের ভূমিনয়ের ও রাজনের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহ দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে-কোন দেশেই রাজশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে সেখানে এমনিই হবে—রাজ-বিদ্বেষীর আত্মরক্ষা নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি রাগের মাথায় বিদ্বেষের কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার এই লেখক গল্পচ্ছলে যে-কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার বাণীর বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ-রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, তাহলে এই বোঝা যেত যে, সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শত্রুকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিজ বিলাপ জুড়ে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি ২৭শে মাঘ, ১৩৩০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ উক্ত শরৎচন্দ্র লিখলেও বন্ধুদের পরামর্শে তা পাঠান হয়নি। বর্তমান প্রসঙ্গে চিঠিখানির মূল্য অপরিসীম।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাওড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবার কথা। কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই-একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে দুঃখ আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন, ইংরেজ-রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্যে গণ্য করবার চেষ্টা করতাম, তাহলে লেখক হয়ে আমার লজ্জা ও অপরাধ

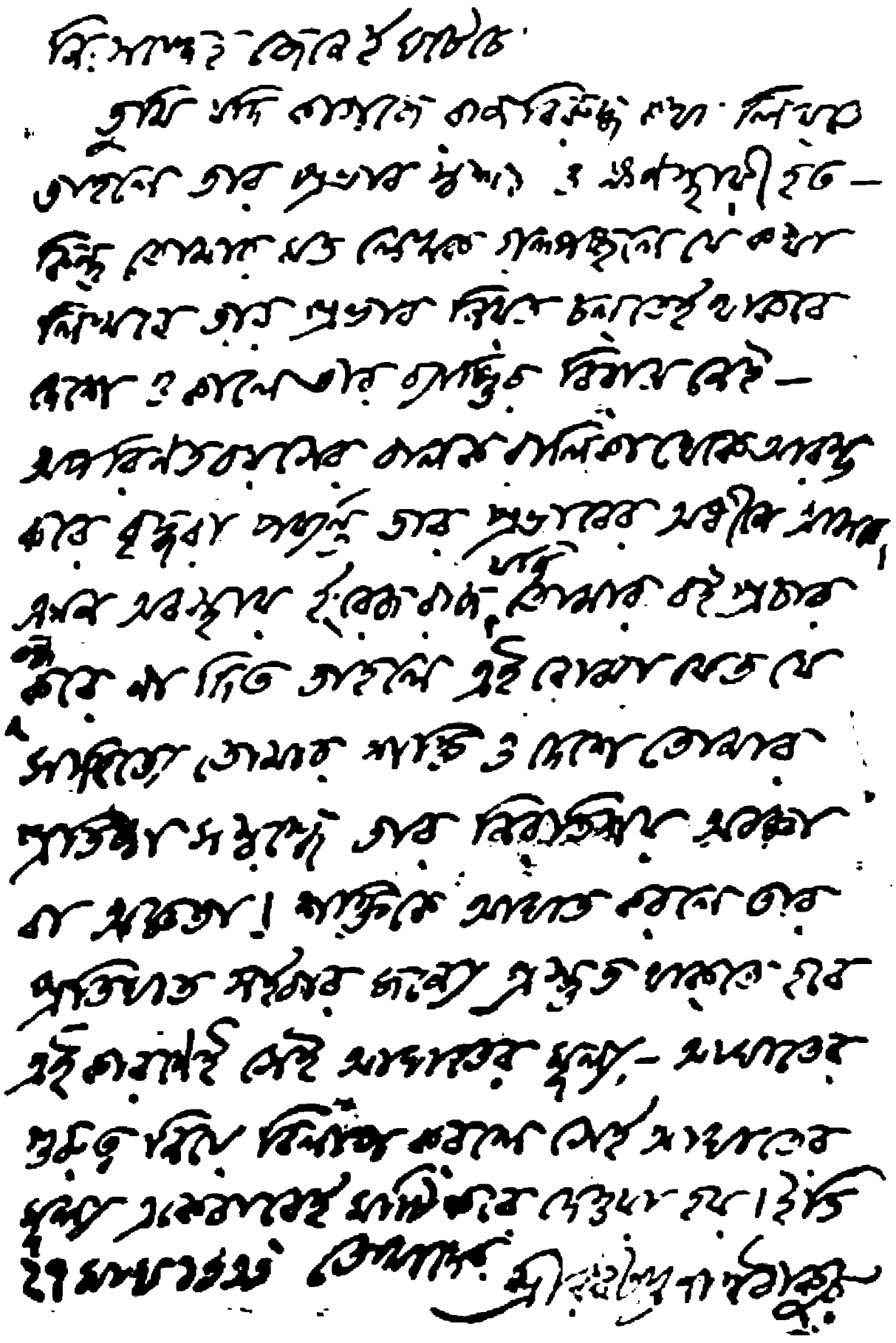

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর সংকলন

শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ

॥ ত্রয়োদশ সম্ভারে সম্পূর্ণ ॥

প্রতি সম্ভারের মূল্য ঃ আঠারো টাকা

—ঃ প্রতি সম্ভারের সূচীপত্র ঃ—

প্রথম সম্ভার

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব), বড়দিদি, দত্তা, চন্দ্রনাথ, গ্রন্থ-পরিচয়।

দ্বিতীয় সম্ভার

শ্রীকান্ত (২য় পর্ব), পল্লী-সমাজ বিরাজ-বৌ, নববিধান, গ্রন্থ-পরিচয়।

তৃতীয় সম্ভার

শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব), অরক্ষণীয়া দেবদাস, কাশীনাথ, জাগরণ (অসম্পূর্ণ), গ্রন্থ-পরিচয়।

চতুর্থ সম্ভার

শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব), বামুনের মেয়ে, নিষ্কৃতি, বিজয়া (নাটক), অপ্রকাশিত রচনাবলী, গ্রন্থ-পরিচয়।

পঞ্চম সম্ভার

দেনা পাওনা, পরিণীতা দর্পচূর্ণ বোঝা, বাল্য-স্মৃতি, পরেশ, হরিচরণ, আগামীকাল (অসম্পূর্ণ) গ্রন্থ-পরিচয়।

ষষ্ঠ সম্ভার

বিপ্রদাস, রমা (নাটক), রামের সুমতি, আলো ও ছায়া, মন্দির, অপ্রকাশিত রচনাবলী, গ্রন্থ-পরিচয়।

সপ্তম সম্ভার

গৃহদাহ, বিন্দুর ছেলে, অনুপমার প্রেম, অপ্রকাশিত রচনাবলী, গ্রন্থ-পরিচয়।

অষ্টম সম্ভার

শুভদা, পণ্ডিত-মশাই, মেজদিদি পথনির্দেশ, আঁধারে আলো বিবিধ রচনাবলী, অপ্রকাশিত রচনাবলী, গ্রন্থ-পরিচয়।

নবম সম্ভার

শেষ প্রশ্ন, স্বামী, একাদশী বৈরাগী, নারীর মূল্য (নিবন্ধ) অপ্রকাশিত রচনাবলী।

দশম সম্ভার

ষোড়শী (নাটক), বৈকুণ্ঠের উইল, অনুরাধা, হরিলক্ষ্মী, সতী, মামলার ফল, বিলাসী, বাল্যকালের গল্প ঃ (ক) ছেলে-ধরা, (খ) লালু, (গ) কলকাতার নতুনদা, বিভিন্ন রচনাবলী, পত্র-সংকলন, গ্রন্থ-পরিচয়।

একাদশ সম্ভার

চরিত্রহীন, অভাগীর স্বর্গ, বাল্য-কালের গল্প ঃ লালু, বিভিন্ন রচনাবলী, পত্র-সংকলন, গ্রন্থ-পরিচয়।

দ্বাদশ সম্ভার

শেষের পরিচয়, ছবি, বাল্যকালের গল্প ঃ (ক) বছর পঞ্চাশ পূর্বে একটা দিনের কাহিনী, (খ) লালু, বিভিন্ন রচনাবলী, পত্র-সংকলন, গ্রন্থ-পরিচয়।

ত্রয়োদশ সম্ভার

পথের দাবী, মহেশ, বারোয়ারী (উপন্যাস), ভালমন্দ, ছেলেবেলার গল্প ঃ দেওঘরের স্মৃতি, তরুণের বিদ্রোহ (নিবন্ধ), অপ্রকাশিত রচনাবলী, পত্র-সংকলন, গ্রন্থ-পরিচয়।

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জো স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২। ফোন ঃ ৩৪-১৭৮২

হই-ই ছিল। কিন্তু জানতঃ তা আমি করিনি, করলে politician -দের propaganda হত, কিন্তু বই হত না। তার কারণ বাংলা ভাষায় এ-ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সম্মান সামনা অভ্যর্থনাতে ভাসতে সর্বদাই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা উপরের জন কয়ে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি দণ্ডেই অভ্যস্ত, তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা ঘেন্না করবেন— এদুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দুদিন অপেক্ষারও তাঁরা কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার যেটুকু আছে। কিন্তু এ বাকী। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙালীদের হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি নিখার অভাব না দিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজদ্রোহে শাস্তিভোগ করতে হয় ত তাতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দম্ভ আছে, এবং মনে করি তারও সময়ের প্রতিবন্ধ হওয়া আবশ্যক। নইলে পাপের জোরেরই প্রকারান্তরে নাম বলে স্বীকার করা হয়। আজনেই প্রতিবন্ধ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এই বই আবার ছাপা হবে এ-সম্ভবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি-ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু অবজ্ঞেন যদি অন্যায় হয়, তখন দায় বন্ধ না হয়ে তিন বছর হল কেন—এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজদ্বারীর জেলের মধ্যে খুব ছনা মাখন পায় না বলে কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে বেদনা করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authority যা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ভাল্লা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের কার্যকলাপের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবকই এই কারণে। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের অন্যায় এবং ত্রাস ও প্রতীচ্যের অন্যায় তুলনীয় নয়। ইংরেজ গভর্নমেন্টের মত দায়িত্বজ্ঞান নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু ও অন্যায় ক্ষমার নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজ রাজপুরুষ এ-কাজ যখন করেছেন তখন Justification

থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justification ও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে ঘা-টাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করা নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাইরেও অভিজ্ঞতা ও আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এ-বই প্রচারে দেশের সত্যকার কল্যাণ নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোত। মনে হয় ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন দ্বন্দ্ব আমার থাকতো, আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়েছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্ধেক সমুদ্র যে কত পেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এ-পত্রে ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মধ্যে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে বেদনাহত করবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে। ইতি—২রা ফাল্গুন, ১৩০০।

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

— সাহিত্যিকে। থেকে ১০ অক্টোবর, ১৯২৭ খৃঃ শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন : '...একটা কথা তোমাকে জানাই, কাউকে বোলো না। 'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল, তখন রবি-বাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে, পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্নমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য তুই আমার সঙ্গীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়, তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—'পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ইংরাজ রাজশক্তির মত সাহসিক এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্নমেণ্টের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই ছাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেণ্টকে যা-তা লিখবার জন্য সাহসের বিড়ম্বনা।'

ভাবতে পারো কিনা অপরাধে কেউ কাউকে এতবড় কটূক্তি করতে পারে? এ-চিঠি তিনি ছাপবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনি এই জন্য যে কবির এতবড় সার্টিফিকেট এদেশি স্টেটস-ম্যান প্রভৃতি ইংরাজী কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতি-নীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন জায়গায় একটু-আধটু তীক্ষ্ণতার ঝাঁজ এসে গেছে।'

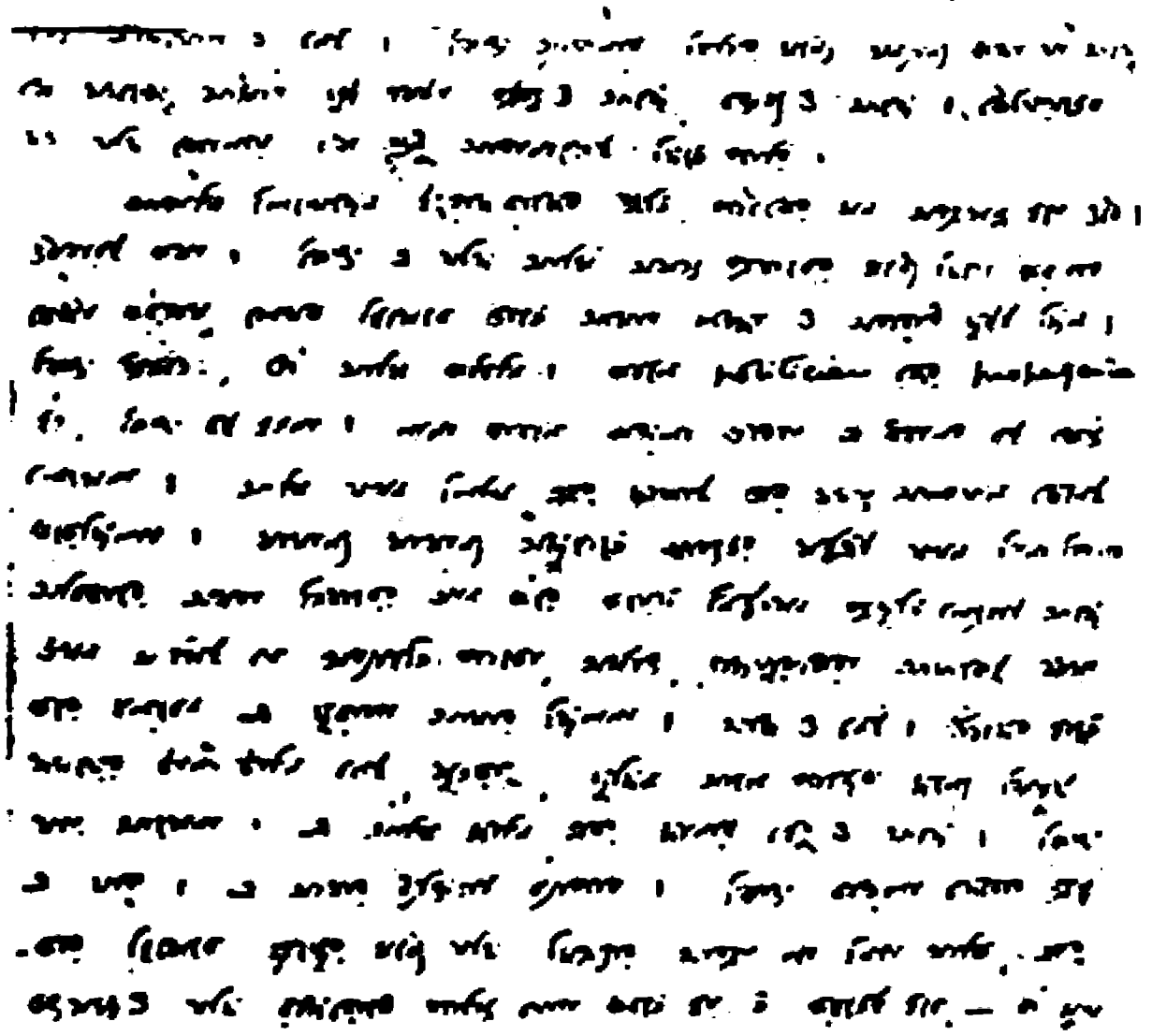

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত শরৎচন্দ্রের চিঠি, যা পাঠানো হয়নি।

পথের দাবী'র প্রকাশণ প্রসঙ্গ

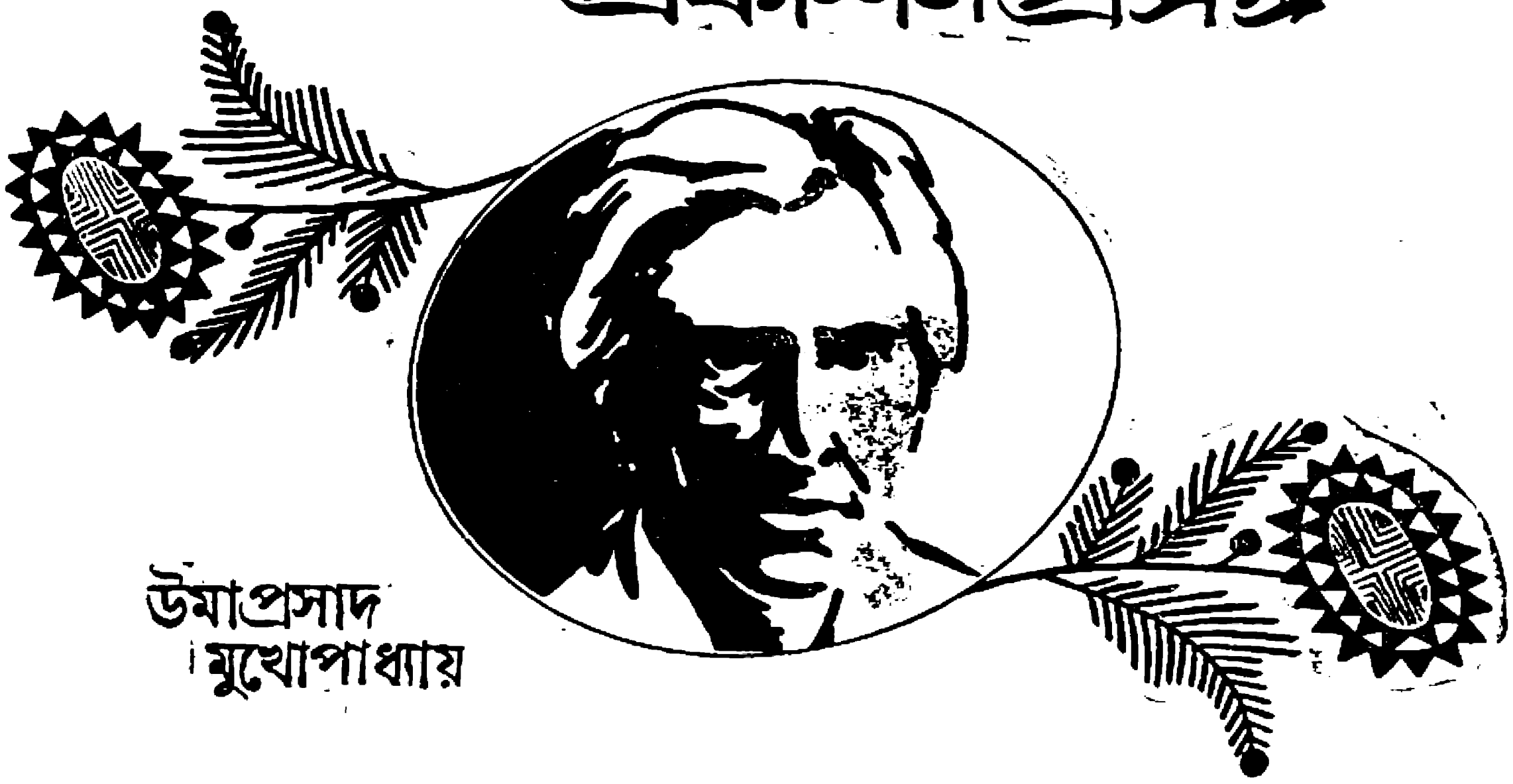

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১)

সেসব দিনের কথা এখন স্বপ্নের মতন মনে হয়। আজকের ঘটনা ত' নয়। পঞ্চাশ বছরেরও ওপর কেটে গেল। সে-সময়ে কি কখনো ভাবতে পেরেছি, নিজের চোখেই দেখে যাব, ইংরেজরা সত্যিই এদেশ থেকে তাদের রাজত্ব গুটিয়ে ফিরে গেছে, আমাদের দেশ আমাদেরই হাতে এসেছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে! আশাতীত হলেও তাই-ই কিন্তু একান্ত কামনা ছিল,—কী উপায়ে পরাধীনতার গ্লানি ও বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়,—এই ছিল তখন বিনিদ্র আশা, ধ্যানের জ্ঞান।

বন্দিনী জননীর লৌহ-শৃঙ্খল মোচনের ভক্তসন্তানদের সে-যুগে সে কী সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা! কেউ বা একেবারে মরিয়া সাহস নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধের রক্ত প্রবাহ করে, প্রবল পরাক্রম বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও বীরদর্পে মাথা তুলে রুখে দাঁড়ায়, হাসিমুখে বিদেশী শাসকের হাতে নির্মম নির্যাতন সয়, হেলায় আত্মজীবন উৎসর্গ করে, আবার অনেকে মুখোমুখি পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা সহ্য করে।

তখনকার সেই পরাধীন ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত অইনকানুন স্বাধীন সাহিত্য সাধনারও অন্তরায় ছিল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী' গ্রন্থের প্রচার নিষেধ ও বাজেয়াপ্ত তারই চরম প্রমাণ নিঃসন্দেহ। বইখানির প্রকাশনার ইতিহাস লিখি।

(২)

আমার বড়দাদা ও মেজদাদা—উমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর উৎসাহে ও প্রযত্নে আমাদের বাড়ি থেকে ১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পিতৃদেব তখন বর্তমান। হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে আসীন। এ প্রচেষ্টায় তাঁরও সক্রিয় সহানুভূতি থাকে। প্রথম দিকে যুগ্ম-সম্পাদক থাকেন,—ডাক্তার নীলরতন সেন ও বিনয়চন্দ্র মজুমদার। পরে একা বিজয়বাবুই সম্পাদক থাকেন। আমিও আমার কর্মস্থান নিয়ে এ-কাজে মেতে উঠি। সাহিত্য-পরিবেশ প্রকাশনেরও অপূর্ব এক আকর্ষণ ও আনন্দ থাকে। আমরা তখন ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র, তখন সেখানে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক ছিলেন কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী। পরে তিনি বাংলায় এম-এ ডিগ্রী নেন এবং সাউথ সুবরবান কলেজে পরে অধ্যক্ষ ও কলেজ পরিচালক হন। অধ্যক্ষ হন তিনিও 'বঙ্গবাণী' পরিচালনার কাজে যোগ দেন ও প্রভূত সাহায্য করেন। পত্রিকা প্রকাশের বছর দুই পর পিতৃদেবের তিরোধান হয়।

তখনকার প্রখ্যাত প্রায় সব লেখক-লেখিকার রচনা ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনাও বাদ যায় না। কিন্তু নানান কারণে শরৎচন্দ্রের লেখা পাওয়া কিছু সময় যায়। শরৎচন্দ্র তখন থাকেন শিবপুরে। তাঁর প্রতিবেশী অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার-এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ছিল। তাঁরই মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের লেখা পাবার চেষ্টা চলে। দাদারা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লেখা দেবার জন্য অনুরোধ জানান। অবশেষে, ১৩২৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে মহেশ গল্পটি 'বঙ্গবাণী' ও অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'প্রবাসী পত্রিকায়' একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এবং ঐ বছরেই বঙ্গবাণীর মাঘ সংখ্যায় অভাবনীয় সম্পদ—পথের দাবী প্রকাশ। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জানাশোনা হওয়ায় ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে এক স্নেহসিক্ত অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখে দেবার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করা হয়। কিন্তু তখন অন্য যে-সব পত্রিকায় তাঁর লেখা বের হয়, তাই নিয়মিতভাবে তিনি দিতে পারেন না,—আবার এই এক নতুন পত্রিকায় জন্যে ধারাবাহিক লেখা,—কোনমতেই তাঁর আগ্রহ জাগানো যায় না।

বঙ্গবাণীতে বড়দাদা একদিন শিবপুরে যাচ্ছেন তাঁর কাছে আবার লেখার অনুরোধ জানাতে। শরৎচন্দ্রের সেই এক কথা—নতুন উপন্যাস লেখা এর কাছে উচিত নয়।

ঘরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের লেখবার টেবিল। প্রশস্ত কাগজ ঘড়াপড়ে। হঠাৎ বড়দাদার দৃষ্টি পড়ে সেই সাদা-কাগজের ওপর শরৎচন্দ্রের—মুক্তোর মত অক্ষরে—হাতে-লেখা কয়েকটি

পল। ভাকাস্মর মতে ডাস্টিয়েভস্কির এই-ই শ্রেষ্ঠ নভেল।

পুলকিত হয়ে বড়দাদা বলেন, এই হো! একটা লেখা পড়ে শুনছে দেখছি!

শরৎচন্দ্র নির্বিকারভাবে জানান, ও একটা শুরু করেছিলাম,—পোলিটিক্যাল লক্ষ্যযুক্ত উপন্যাসটা লেখবার ইচ্ছা, কিন্তু এদেশে কেউ ছাপবার সাহস পাবে না,—তাই আর লিখিনি,—পড়ে আছে।

বড়দাদার আগ্রহ উদ্দীপ্ত হয়। জোর করে বলেন, এইটেই আবার আরম্ভ করুন, —হা' লিখতে চান লিখুন দেখি,—ভারতবর্ষীতে ছাপা হবে।

শরৎচন্দ্র হাসেন। বলেন, ক্ষেপেছ? হলদে বাড়ির কাগজ! তাতে ছাপতে পারব ঐ উপন্যাস?

বড়দাদা বলেন, নিশ্চয়ই পারবে। লেখা দিয়ে দেখুন আপনি।

(৩)

শুরু হয় 'ভারতবর্ষী'তে পথের দাবী ছাপানো ধারাবাহিকভাবে। পাঁচের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১৩২৯ সনের বৈশাখ থেকে। পাঠক মহলে বিপুল সাড়া। প্রতি মাসে শরৎচন্দ্রের ব ভারতের আনাগোনা চলতে থাকে। ভার হন কুমারবাবু, মাঝে মাঝে দ দেওয়া,—আমিও। সমরেন্দ্র লেখা চলো ভাগলের পর ভাগলে চলে। 'পাপ এলে হাতে যেন স্বর্গ-পাওয়া। ফুলস্কেপ কাগজ। লাইন-টানা প্রতি উপরে এক কোণে 'এমবস' করে ছাপা বোট-সমেত ভারের নীল রঙের ে তাতেই গল্প লেখা—শরৎ। এ-সবই চন্দ্রের অভিলাষ পূরণে পশ্চাবর্তী থেকে এস্টিক কাগজ জোগাড় করে। দেওয়া। একবার একটা ছাপা ওয়া ফাউনটেনপেন, তাও সূক্ষ্ম নিব- বিলাত থেকে আনিয়ে দেওয়া হয়। সাজ-সরঞ্জামে শরৎচন্দ্রের শৌখিনতা উৎকৃষ্ট কাগজ, শ্রেষ্ঠ কলম, সুশাসন, শান্ত পরিবেশ,—এ সমাবেশ না হলে লেখায় তাঁর মন ব লেখা হ'ত না। পাতার উপর পর মুক্তোর মালা গাঁথা।

পাওয়ার ফাঁক থাকই। একবার পা
মাস লেখা বার হয়নি।

৫

খোলীর পাতা কেটে পাখির
একটা সম্পূর্ণ ফাইল তৈরি করি
কিশোর জন্যে শরৎচন্দ্র অবার
নি পড়ে দেখেন। সামান্য কোথাও
পরিবর্তন করেন। সেই অনুযায়ী
াক্ত আবার হয়।

শ জৈষ্ঠ ১৩৩৩। সেই বাঁধানো
নিয়ে সামতাবেড় যাই।
র হাতে সেটি দিয়ে বলি, দিনে
র কিছু নিজের হাতে লিখো।'
নেই জানি, এই প্রস্তাবের সঙ্গে
সরকারের নিষেধাজ্ঞা সুনিশ্চিত।
। বাঁধাতেই শরৎচন্দ্র বলেন
ছাড়া কি বলা? আমি লিখব, আর
ট বাজেয়াপ্ত করবে, —এই তো?
লেন সত্যকার সাহিত্যসাধনার
?

তবুও তাঁর প্রকাণ্ড মোটা ফাউন্টেন পেনটি হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন।

বলেন, নাঃ কিছুই লিখতে পারছি না।

তারপর, ধীরে ধীরে বন্ধ হল। সেদি প্রথম পাতায় লেখেন—মাঝখানে অমর নাম। তার পাশে তাঁর নিজের নামটি। নীচে তাঁর ছবি-কুণ্ডলী আঁকেন। তারিখ, সনও লেখেন এবং মাথা নিচু করে থাকেন।

পাতার মাথার উপর বাঁকা করে লিখে দেন :

'কিছুই লিখতে পারলাম না। অমর—২১শে জৈষ্ঠ ১৩৩৩।

পরের দিবার দ্বিতীয় ভাগ আমি কি সম্পূর্ণ করা না পারি আমার শেষের কেউ যেন পারে,—এই কামনা করি ; শ'

খাতার শেষ পাতায় লেখেন :

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।'

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের

অপ্রকাশিত রচনাবলী নারীর মূল্য

দাম : ৮-৫০ দাম : ২

হরিণক্ষী নিষ্কৃতি মেজাদদি পল্লীসমাজ

দাম : ২ ২ কিশোর সং ২ কিশোর সং ৩

ঘড়ীবাবু কিশোর সং ২-৫০ বৈবুণ্ঠের উইল কিশোর সং ২-২৫

মণ্ডল-এর

মানচিত্র এক যে ছিল

২৪শ মুদ্রণ ৮ ছিন্ন মাসে ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ৮

এপার বাংলা ওপার বাংলা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

৩৪শ মুদ্রণ ১৬ ২৪শ মুদ্রণ ৮

জরাসন্ধ-র বিমল মিত্রর নিমাই ভট্টাচার্যের

পাড়ি এর নাম সংসার পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট

নতুন খণ্ড ৬ দাম : ১০ দাম : ৮

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চারুবা সেনের

প্রণয় পাশা উপনিবেশ তিন তরঙ্গ

দাম : ৬ দাম : ৮-৫০ দাম : ৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনফুলের বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নিশিপদ্ম ৪-০০ প্রথম গরল ৮-৫০ তাঞ্জাম ৪-৫০

বিনয় ঘোষের সৈয়দ মুজতবা আলী

কলকাতা সহরের ইতিবৃত্ত শ্রেষ্ঠ গল্প

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, আনুমানিক মূল্য ৪০ দাম : ৭

রাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিঃ ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

[illegible] প্রথম পৃষ্ঠার অংশ

[illegible]

[১]

[illegible]

অমৃত

অকুণ্ঠচিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

৬

জ্যৈষ্ঠ পালায় তিন মাস কেটে যায়। প্রেসে বই ছাপানোর কাজও শেষ। বৈঠকখানায় পাইতে—ঠাকুরের কাছেই আমাদের সুপরিচিত কম্পোজিটর মোঃ ইসমাইলের বাসস্থান। তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা থাকে প্রেস থেকে ফর্মাগুলি পেলেই যেন তাড়াতাড়ি সব বই একই সঙ্গে বেঁধে দেন। বই-এর প্রকাশ হলেই যে বাজেয়াপ্তের হুকুম জারি হবে,—অতএব সুপসজ্জার প্রয়োজন নেই। সাদা কাগজ দিয়ে মোড়া পিজবোর্ডের মলাট—মাথার উপর শুধু লেখা কপি—পথের দাবী নীচের দিকে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দাম তিন টাকা। ছাপানো হয়—তিন হাজার কপি। বই-এর প্রকাশ ভাদ্র ১৩৩৩।

অপরাহ্নে বিশ্বস্ত লোকের ভার দেওয়া কম্পোজারের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি প্রুফগুলি নিয়ে কলকাতার দু-তিনটি বিভিন্ন পাড়ার বাড়িতে বইগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হবে,—কলকাতার বাইরেও কয়েকটি জেলায় কিছু বই পাঠানো হবে,—যাতে পুলিশ সন্ধান পেলেও সব বই ধরতে না পারে। পরিচিত বই-এর দোকানেও জানিয়ে দেওয়া হয়,—দাম টাকা জমা দিলে তাঁরাও ইচ্ছামত বই নিয়ে যেতে পারেন। সেইমত তাঁরা নিয়ে যান। নিমিষে কয়খানের মধ্যেই সব বই বিলী হয়ে যায়।

আশুবাবুর মত দেশের পথের দাবী ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন জনে জনের বুকে জ্বলে উঠে অন্ধকারে ঘনঘটা হয়।

পরম নিশ্চিন্ত ও গভীর আনন্দ বোধ করি। ছাপা বই নিঃশেষ। শু কপি বই আর সুন্দর করে বাঁধিয়ে একটা মলাটের পাতে লেখকের হাতে শরৎচন্দ্রের নাম লিখে তাঁকে দিই, অপরখানিতে আমার নাম লিখে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে সই করিয়ে আমার নিজের কাছে রক্ষিত রাখি।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩। আমার দিন পথের দাবী বই আকারে বার হয়েছে। শরৎচন্দ্র সেই রাত্রি ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে থাকেন। দুজনে সারা রাত জেগে কাটাই। কাছে বসে প্রাণ খুলে করেন, তাঁর মুখে কতো গল্প শুনি। কেমন ভাবে মুহূর্তের মধ্যে কোটি মানুষ মাতে।

ভোর হতেই তাঁর হাতে এসে নিই আগে নিজ হাতে লেখা 'পথের দাবী'র সম্পূর্ণ

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম -- ১৪'০০
২। গুল বাগিচা--- ৩৫০ ৩। কাব্য আমপারা-- ৪'০০
৪। পুবের হাওয়া---- ৯ ০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি ২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ. সূর্যসেন ষ্ট্রীট ফোন-৩৫ ০৬৩৩ কলিকাতা-৯

১ম সংস্করণ পথের দাবীর কপিতে শরৎচন্দ্রের সংশোধন যা পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়নি।

পথের দাবী

৭০

হাতের টিনের বোতল ৭ ছোট বড় পুঁটুলি খুলিয়া তাহাকে সব করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি, তাঁহার অভাব সম্বন্ধে হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইনিয়া সকলেই উত্তর ব্রহ্ম বর্মা-অয়েল-কোম্পানীর তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উচ্চশৃঙ্খল বেতুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাব্-এজেন্ট সরাসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু [illegible]। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। [illegible] সংসারের বিরাগ [illegible]। কেবল আড়ম্বর সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা কি গোল, দীপ্ত কি [illegible] এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই

পাণ্ডুলিপি। তিনি আশ্চর্য হন। অমাবস্যার মুখের পানে স্নেহবিগলিত নয়নে তাকান। বলেন, এসব তুমি এতদিন ধরে গুছিয়ে রেখেছ—এমন বলো কবে? দাও, আমি তোমায় লিখে দিই।

তখনি লিখে দেন ও ফাইলের পুনঃ প্রথম পাতায় তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর :

"বিনু, আমার হাতের লেখা বই এইখানি ছাড়া আর নেই। এ যেন তোমারই কাছে থাকে। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

দাদা

ভাদ্র ১৩০০"

৭

নিশ্চিন্ত নিষ্পন্দ চিত্তে সরকারী হুকুমনামার অপেক্ষায় থাকি। কাজ ত হচ্ছে! এখন গভর্নমেন্ট যে শাস্তি দিতে চায় দিক। কিন্তু আশ্চর্য! ও তরফ থেকে কোন সাড়া-শব্দের প্রয়াস নেই। দিব্যদৃষ্টে লোকমুখে শোনা যায় বই বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রস্তুত; লেখক প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগও আনা হবে কিনা সরকারী মহলে তারই পরামর্শ চলে।

এদিকে বই-এর কপি পাবার জন্য চারিদিক থেকে অনুরোধ-উপরোধ-ধরাধরি কিন্তু বই আর তখন কোথায়? শুনি দু-একজন ব্যবসায়ী এই সুযোগে তাদের কাছে ছেপে রাখা বই একশ টাকা দামে এক এক কপি বিক্রী করেছেন। এক বন্ধু নিয়ে এসে দেখান, গোপন ছাপাখানা থেকে নিখোঁজ কাগজে-ছাপানো ছাপায়-ভুলে-ভরা পথের দাবী বই। বিপ্লবীদের মধ্যে তাই-ই বিতরণ চলেছে।

পূজোর ছুটি আসে। মধুপুরে চলে যাই। সরকারী নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে কারো কারো মনে ধারণা হয়, বই তাহলে বাজেয়াপ্ত করলো না। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রস্তাব নিয়ে এক পাবলিশার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। আগাম প্রাপ্য টাকা দিতেও প্রস্তুত। শরৎচন্দ্র খবরটা জানিয়ে আমার মতামতের জন্য চিঠি লেখেন। লেখেন, "এক্ষেত্রে টাকা টাই সব নয়। টাকার প্রতি আমার অহেতুক লোভও নাই। শুধু সংসারী লোক বলিয়াই প্রয়োজন। কিন্তু এমন কিছু যদি জানিয়া থাকো যে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবেই; তাহা হইলে যাহাতঃ প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া [illegible] কিছু পাইতেও পারি, কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই। সে পাওয়া আমার সহিবে না।"

চিঠি পেয়েই তাঁকে জানাই, বই বাজেয়াপ্ত হবেই সন্দেহ নেই।

নতুন নাটক

রাধারমণ ঘোষের নাটক

মুচকি মঙ্গল কাব্য

এবং

সূর্য সেই স্বপ্ন আছে

দুটি পুরস্কারপ্রাপ্ত - নারীবর্জিত বিখ্যাত একাঙ্ক একত্র। মূল্য : ৫-০০

শৈলেশ গুহনিয়োগীর নাটক

জীবনরঙ্গ

একটি জমজমাট কাহিনীমূলক পূর্ণাঙ্গ দুটি নারী ॥ দুটি সেট। মূল্য : ৫-৫০

সরোজ রায় এবং সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

তিনটি জনপ্রিয় একাঙ্ক

রাধারমণ ঘোষের—শতাব্দীর পদাবলী
প্রবীর দত্তর—স্কিৎসে
অমল রায়ের—বজ্রাঘাত
একত্রে তিনটি বিখ্যাত উপভোগ্য একাঙ্ক সংকলন। মূল্য : ৫-৫০

রাধারমণ ঘোষের নাটক

যদি আমি কিন্তু আমি

প্রোগ্রেসিভ নতুন পূর্ণাঙ্গ নাটক। একটি নারী। একটি সেট। মূল্য : ৫-০০

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটক

সূর্য এনে দাও

একটি সেট। একটি নারী। মূল্য : ৪-৫০

মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
একটি জনপ্রিয় পূর্ণাঙ্গ নাটক

মহাক্ষুধা

নিটোল কাহিনী। দুটি নারী। মূল্য : ৫-০০

রাধারমণ ঘোষের
বহু বিতর্কিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

হারাধনের দশটি ছেলে

নতুন আঙ্গিকের পূর্ণাঙ্গ। একটি নারী। মূল্য : ৫-০০

সমর বসুর জনপ্রিয় একাঙ্ক নাটক

ডাইনোসেরাস

নারীবর্জিত পুরস্কারপ্রাপ্ত।
মূল্য : ৩-০০

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির
৩৯/৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

তিনি তখনি লেখেন, বেল এখন সমস্ত বন্ধ হইল। লোকেরা আমাকে খেয়ে ফেলেছিল বই বই বলে। এখন জবাব দিতে পারবো।

অবশেষে কলকাতা থেকে বড়দার চিঠিতে খবর আসে,—১২ই জানুয়ারী ১৯২৭ সালে লেখা,—পথের দাবী প্রোসক্রাইব হয়েছে আর কিছু হতে কিনা সংবাদ পাইনি। কাল বোধ হয় গ্রেপ্তার হবে। আজ বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। বাড়িতে কোন বই নেই বলায়, তাঁরা জানান, অন্ততঃ একখানা কপি কোন-মতে জোগাড় করে তাঁদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে,—নইলে প্রকাশকের বাড়ি থেকে এক-বার নমুনা হাতে দেবো চলে কি করে!—অগত্যা ছোটবোনেরা বাড়ি থেকে এক কপি বই এনে তাঁদের হাতে দেওয়া হয়।

এইভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

শরৎচন্দ্রের দেহাবসান হয়,—২রা মাঘ ১৩৪৪—১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ সালে।

৮

মহাকালের রথচক্র ঘুরে চলে। জগতে রাজনৈতিক বিরাট পরিবর্তন আসে. নিষ্ঠুর বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়। বিপুল বিক্রম বৃটিশ সিংহের বিশ্বব্যাপী শক্তির হ্রাস দেখা দেয়। ভারতে স্বায়ত্তশাসনের কিস্তিমাতটা বহাল করতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হন। উপলক্ষ করেন ভারতের উপর তাঁদের প্রভুত্ব করার দিন অবসানপ্রায়।

বাংলায় তখন ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীসভা। একদিন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র জানান, প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় (সেকালের নাট্য-জগতে বিশেষ খাতনামা) পথের দাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা সরকার মহলে করতে পারেন, যদি তাঁকে পথের দাবী নাটকরূপে পরিণত করে অভিনয় করবার স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়। নাটকে রূপান্তরিত করবেন—শচীন্দ্র সেনগুপ্ত।

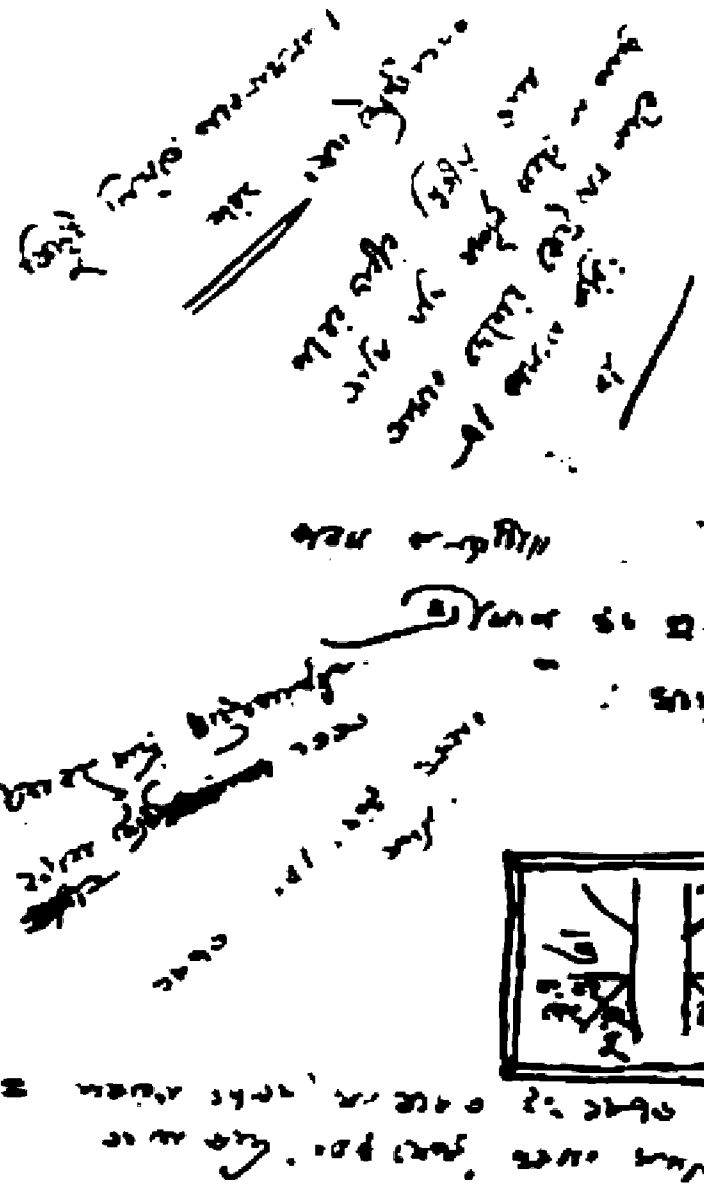

স্বহস্তে লিখিত পথের দাবীর প্রেস কপিতে শরৎচন্দ্রের জন্মকুণ্ডলী ও প্রতিকৃতি

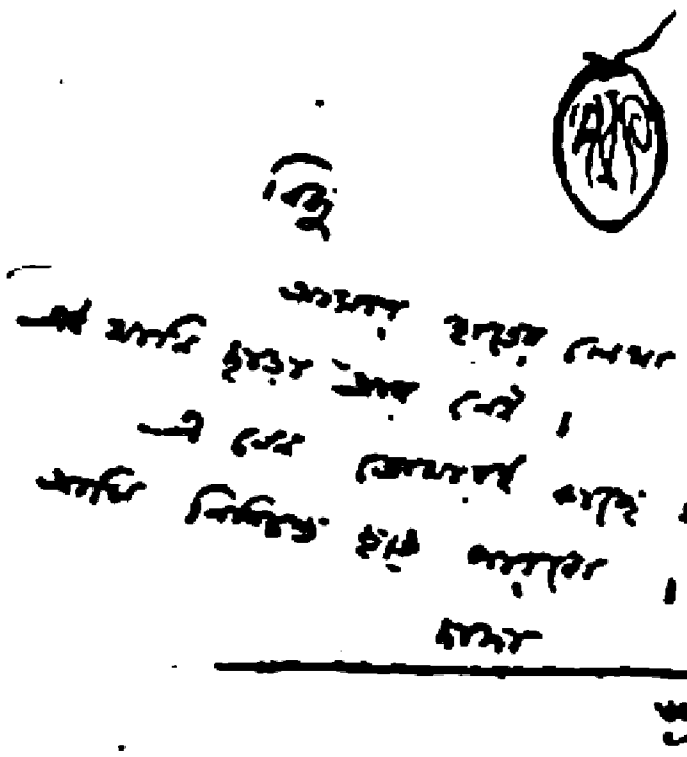

পথের দাবীর পাণ্ডুলিপি রক্ষণের জন্যে উমাপ্রসাদকে শরৎচন্দ্রের অনুরোধ

ব্যবস্থাও সেইমত হয়। পথের দাবীর উপর এতকাল যাবৎ বলবৎ নিষেধাজ্ঞা গভর্ণমেণ্ট তুলে নেন।

বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি—বৈশাখ ১৩৪৬ সনে। ছাপা হয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে।

বিশ্বযুদ্ধের অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সরকারী অনেক ক্ষেত্রে তখন কণ্ট্রোল—নিয়ন্ত্রণ প্রথা। পথের দাবীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্যে গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতির আবেদন করি,—২৬শে আগষ্ট তারিখে অনুমোদন পত্রও পাই। অমি স্বাধীন ভারতে পথের দাবীর প্রথম প্রকাশ যথাসম্ভব সুসজ্জাতেই করা যাক্। গ্রন্থের নন্দলাল বসুকে অনুরোধ জানাই, তিনি যদি বই-এর প্রচ্ছদপট এঁকে দেন।

সানন্দে তিনি সম্মত হন। ভারতীর ছবি এঁকে পাঠিয়ে দেন। প্রচ্ছদপটে ছবির সঙ্গে কীভাবে বই-এর নাম লিখলে ভাল দেখাবে তারও নির্দেশ দেন। শিল্পী গোপাল ঘোষ সেই অক্ষরগুলি লিখে দেন। নন্দলালবাবু ভারতীর অপর একখানি স্বতন্ত্র রেখাচিত্রও পাঠান। বই-এর ভিতর তাও ছাপা হয়। এখানও বই ছাপানো, —শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। প্রকাশ কাল—আশ্বিন, ১৩৫৪।

নন্দলালবাবু সেই রেখাঙ্কণ এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হোল।

এইভাবেই শৃঙ্খলমুক্তে পথের দাবীর কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হয়ে ওঠে সাহিত্যের মুক্ত অঙ্গনে। দুঃখ থাকে শুধু,—শরৎচন্দ্র নিজের চোখে দেখে গেলেন না,—তাঁর একান্ত কামা স্বদেশের স্বাধীনতা তাঁরই পথের দাবীর দেশব্যাপী অভ্যর্থিত পুনরে।

24,0 64

পাণিত্রাসে শরৎচন্দ্র
স্মৃতিচারণ : সাক্ষাৎকার

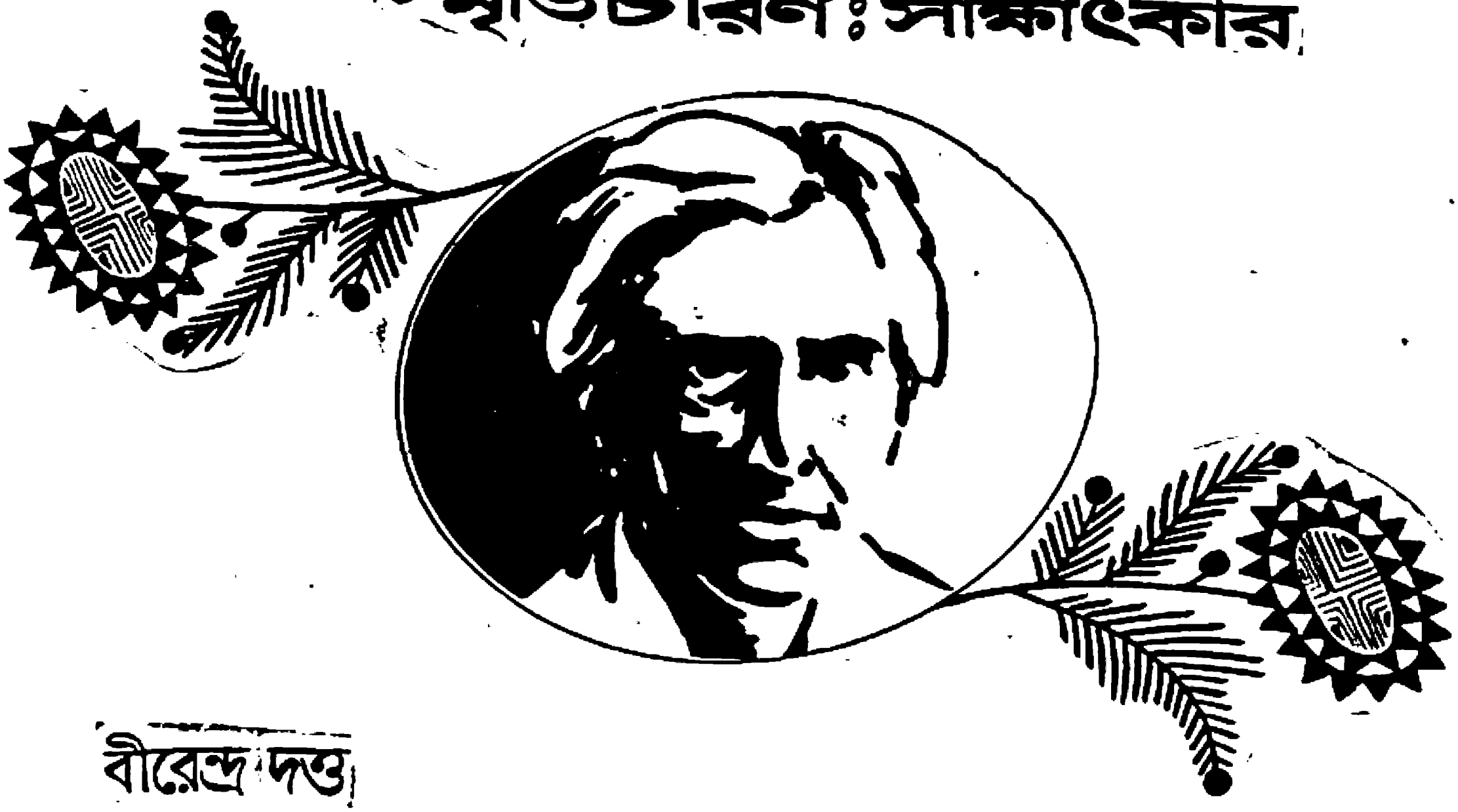

বীরেন্দ্র দত্ত

পাণিত্রাস-সামতাবেড় গ্রাম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল শেষ বয়সের আশ্রয়। বাস্তু শরৎচন্দ্রের এক কুটুম্বিতার সূত্রেই এই গ্রামটি শিল্পী শরৎচন্দ্রকে টেনে নিয়েছিল কাছে। বাস্তু মানুষটি ছিলেন আমুদে ভবঘুরে এলোমেলো ধরণের। স্বভাবে ডানপিটে, ভয়ঙ্কর জেদী। আবার হাসি-ঠাট্টায়, মেজাজে একেবারে যেন প্রত্যেকের নিজের মানুষটি। কিন্তু শিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ, নির্জনতার জগতের যেন বা আজন্ম-প্রবাসী।

পাণিত্রাস সামতাবেড় অঞ্চল শিল্পী মানুষটির কাছে শান্তির আশ্রয় হিসেবেই ধরা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যা চেয়েছিলেন, তা কি পেয়েছিলেন? না পাননি। পাণিত্রাস-সামতাবেড় গ্রাম তাঁকে শান্তি দেয়নি। আর দেয়নি বলেই বোধহয় আমরা বাস্তু ও শিল্পী দুজনের কাছ থেকেই এমন মনোরম কিছু পেয়েছি যা না পেলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতেও পারতাম না।

শরৎচন্দ্রের বোন অনিলা দেবী তখন গোবিন্দপুর গ্রামের মুখুজ্যে বাড়ির গৃহ-বধূ। সেই সূত্রে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতেন এখানে। তখন সামতাবেড় নামে কোন গ্রাম ছিল না। এখন যে অংশটা সামতাবেড়, সেটা একই জমিদারের দখলে পাণিত্রাস, গোবিন্দপুর, বড়বাড় গ্রাম তিনটির মধ্যে—পাণিত্রাস মৌজারই একটি অংশ। শরৎচন্দ্র আসার পর, অর্থাৎ স্থায়ী-ভাবে বসবাস করার পর ওই বিশেষ অংশের স্বতন্ত্র নাম হয় সামতাবেড়। শরৎচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী পারুলদেবী বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চিঠি লেখেন ১১ই ভাদ্র ১৩২৭ সালে, এবং যে চিঠি অদ্যও অপ্রকাশিত, তাতে তিনি চিঠির ওপরে ঠিকানায় শুধু সামতাবেড় না লিখে পাণি-ত্রাস-সামতাবেড়ই লিখেছেন।

আসন্ন শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ স্মরণে আমার নিজস্ব গ্রাম এবং যে গ্রামে কথা-শিল্পী তাঁর শেষ জীবনের উনত্রিশটি দিনরাত্রি কাটিয়ে গেছেন, সেই পাণিত্রাস-সামতাবেড় গ্রামে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলাম। উদ্দেশ্য রক্ত-মাংসের বাস্তু শরৎ-চন্দ্রকে এই গ্রামের অতীতদিনের পটভূমিতে ধরা এবং সেই সঙ্গে শিল্পী শরৎচন্দ্রকে মেলানো। এই চিন্তা আমাকে রোমাঞ্চিত করল। অন্য অনেকের মত ওই গ্রামে স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে আমার যাঁর শ্রীযুক্ত শুভেন্দুবিহারী দত্তর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নানা সূত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িককালের সেইসব গ্রামের অধি-বাসীদের অনেকেই এখন লোকান্তরিত। কিন্তু যাঁরা এখনো জীবিত, যাঁদের কাছে তাঁদের নাড়ির টান পেয়ে আরও বেশী উৎসুক হয়ে উঠলাম। তাঁদের প্রায় সকলেই সত্তর থেকে আশির মধ্যে এসে গেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমি চিনি, বাবার সম্পর্কে কাকাবাবু বলেই ডাকি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁদের কথা কোনদিন ভাবতে হবে অনুমান করিনি।

যাহোক, বয়সের হিসেব থেকে স্পষ্টই বুঝলাম, জীবিতদের সকলেই শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে ছিলেন বেশ-সতেরো থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের মধ্যে। তাই অনেক আশা নিয়ে বেশ কিছুদিন ঘুরলাম পাণিত্রাস সামতাবেড়ে এই সব প্রবীণ মানুষগুলির মধ্যে। শরৎচন্দ্র যে মাটি, মানুষগুলিকে ভালবাসতেন, যে প্রকৃতির মধ্যে বসে নির্জনতার নৈঃশব্দের স্বাদ গ্রহণ করতেন, লেখার উপযোগী মন রচনা করতেন, সেই সব স্মৃতি-বিজড়িত পরিবেশে নিজের মত করে ঘুরলাম। তাঁদের সঙ্গে নানাভাবে আলোচনা করে খানিকটা যেন নতুন করে জানতে পেরেছি বাস্তু শরৎচন্দ্রকে, সেই সঙ্গে শিল্পীকেও। আমার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত কেউ এভাবে করে নেননি শরৎ-চন্দ্রকে। একে একে যাঁদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি, তাঁরা হলেন, সর্বশ্রী সারেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, প্রফুল্ল ঘোষাল, অমূল্য ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের অকৃত্রিম স্নেহধন্য এবং সম্পর্কে ভাগ্নেদের নন্দদুলাল

শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্রের বাসভবন

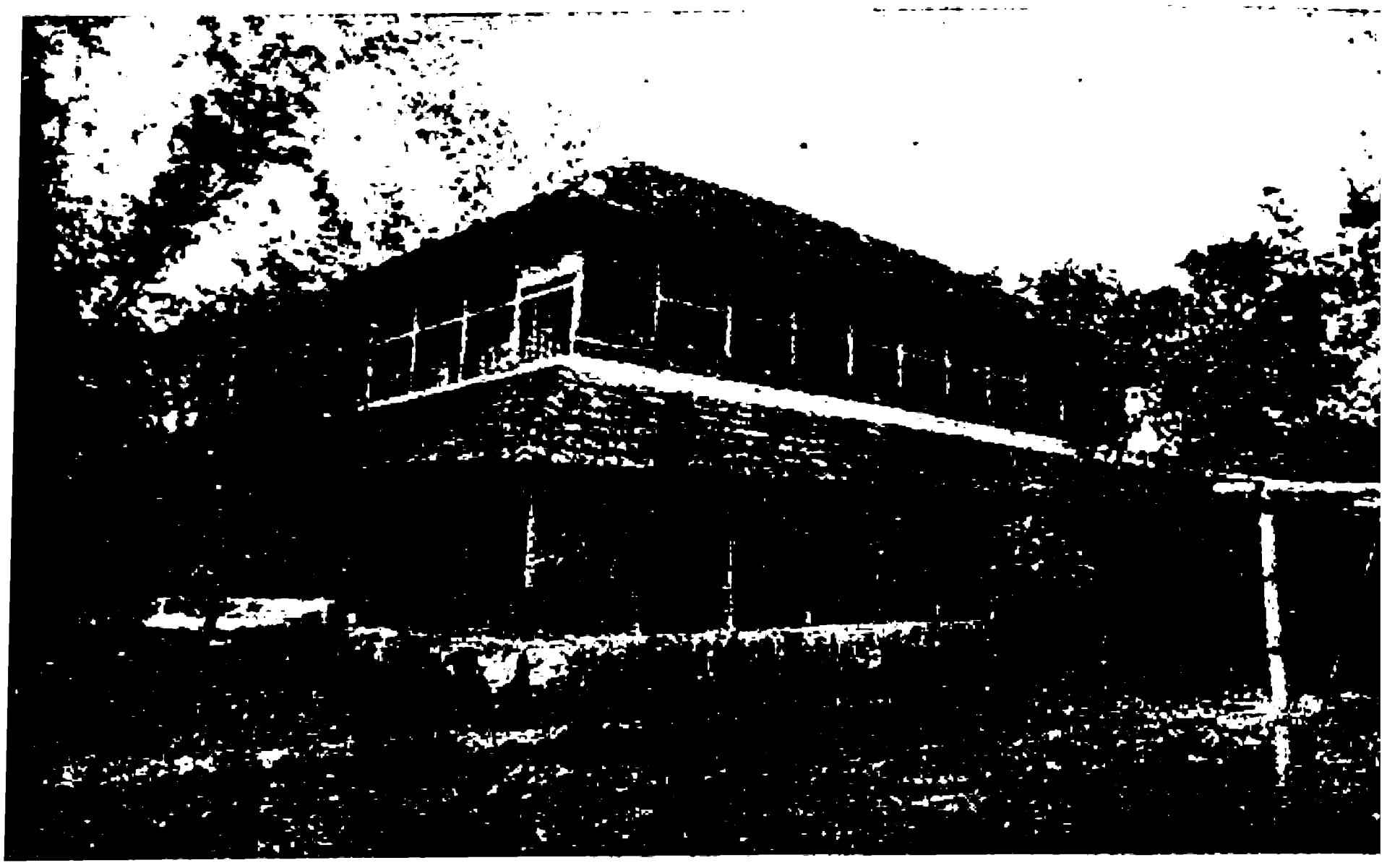

...ধ্যায়, ব্রজবল্লভ মুখোপাধ্যায়, ...মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল হাজরা, ...পাঁর আঁত প্রিয় হয়ে পড়েন। তাছাড়া ...ন এই ছয়জনই ছিলেন কিন্তু এখন ...তাঁর বা তাঁদের নামসূত্রে স্থায়ী ...কম এমন মানুষ সম্পর্কেও লেখা ...নি। এঁদের মধ্যে আছেন শরৎচন্দ্রের ...কন্যা ভাগ্নী অর্থাৎ তাঁদের ...ষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পারুলতা বন্দ্যো-...ধ্যায়, সরশ্রী নবকুমার, সতীশ বোষ্টম, ...ংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমলবিহারী দত্ত।

শান্তিনিকেতন-শ্যামবাটীতে শরৎচন্দ্রকে প্রথম ...ন স্মৃতির কথা জিজ্ঞেস করলাম ...শীর এক ঘনিষ্ঠ পরিচিত মানুষ ...ক্তা বয়সের সঙ্কোচ ঝেড়ে ...র সঙ্গে অতীতের স্মৃতিচারণ করে ...লন তিনি যখন শরৎলোকে দেখি, তখন ...ন শান্তিনিকেতনে হাই ইংলিশ স্কুলের (এখন ...হাই স্কুল) ছাত্র। ওই স্কুলে একদিন ...ন করায় সকলেই দেখলাম ওঁকে। পরণে ...লম্বা সৌম্যকান্তি ধবধবে ...শার্ক, কপালে বড় এক সিঁদুরের টিপ। ...ন সবেমাত্র বেগুনবেড়িয়া থেকে হাওড়ার বাজে-...শেকুরে আস্তানা নিয়েছেন। স্কুলে অসংখ্য ...ন্যা তাঁর স্নেহধন্য পল্লীসমাজকে স্কুলের ...ঠাদর্শক হিসেবে নেবার ব্যাপারে সর্বা...। তখন শরৎকুমার মিত্র ছিলেন স্কুলের ...ন শিক্ষক। তিনি বাড়ি চলেন। কিন্তু ...স্কুলের পাঠ্য সূচি পরিচালনা কর্তৃপক্ষ ...নস্তাত ...

...রেখা, লম্বা চেহারার মানুষ। ধবধবে ...ধবধবে রং-এর পাঞ্জাবী আর সাদা ধুতি ...পরণে, চোখে চশমা, তীক্ষ্ণ নাক।' বিপ্লবীর ...সম্পর্কে ভাগিনেয় বয়সটি বছরের শ্রীনন্দ-দুলাল মুখোপাধ্যায় বললেন, 'আমার ...জ্যাঠাইমা মানে অনিলা দেবীর কাছে এবং ...বহু লোকের সূত্রে শুনেছি, রামমোহন ...এখানে বারদুয়েক এসেছেন অজ্ঞাতবাসে ...তখন এখানে তাঁর বসবাস করার কোন ...প্রসঙ্গই ছিল না। কাঁধ বেড়ে ফিতে দিয়ে ...ঝোলানো একটি হারমোনিয়াম মামার ...বেলের কাছে, হাতে বাঁশের আড়বাঁশি, ...তার পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে। সম্ভবতঃ ...ওই মেয়েটিই পরে শ্রীকান্ত উপন্যাসে ...রাজলক্ষ্মী হয়।'

গ্রামের আর কারোর কাছে এই গৃহে শরৎচন্দ্রকে প্রথম দেখার এমন বিচিত্র সংবাদ পাইনি। যে মানুষ শিকড় হয়েছেন শ্রীকান্ত হয়েছেন সব্যসাচী, বা নানা সূত্রে সাধু-সন্ন্যাসী ধরণের, ব্যক্তিগত জীবনে সেই মানুষটি যে এমন বিচিত্র বোহেমিয়ান ছিলেন খেয়ালী বাউলের মত সংসারত্যাগী মন নিয়েই ঘুরে বেড়াতেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়!

এক এক করে প্রত্যেকটি প্রবীণ মানুষের কাছে একদিন প্রথম বাড়ি করার ...ঘটনা এবং সেই সূত্রে একঘরে করার কথা ...জানতে চাইলাম। আমার বাবা বলেছেন, ...বাড়ি তিনবার হল মনে পড়ছে না, তবে ...একটি ঘটনা, স্পষ্টভাবে, মনে আমার এক ...কাকা প্রায়ই ভাই 'অপরিচিতা'র মত ...শরৎচন্দ্রের বাড়ি করার সময় সমস্ত কিছু দেখাশোনার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। দেখাশোনা করত নকুলপতি ও তার ...সমবয়সী বন্ধু বয়স্ক সুধাংশু বন্দ্যোপা... হাসতে হাসতে বললেন, 'জানি না শরৎবাবুর বাড়ি তৈরী হয়ে গেলেও গৃহপ্রবেশ করেননি। অনেকদিন ... পড়েছিল। আমার মনে তখনকার ঘ... বলবেধে ওই বাড়িতে, কত যে নি... করেছি। বোধ হয় গ্রামের বয়স্ক মাত... দের সঙ্গে কলহের কথা ভেবেই ... ঢোকেননি।' নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় জা... মামাবাবুর ভগ্নীপতি মানে আমার জ... মশাই ছ বিঘে জমি দেন আর ওখা... কিছু জমি নিয়ে শরৎবাবু বাড়িটি ক...

পারুলদিদা সেবীকে জিজ্ঞেস ক... 'শরৎবাবুর হিরণ্ময়ী দেবীকে ... করার ব্যাপার কিছু মনে পড়ছে?' বয়... বিপ্লব হিল্লে মতেই হয়। মামীমা ... ঘাটালের মেয়ে। তবে এটুকু জানি, মা... মামার সঙ্গে বিয়ের হওয়ার আগে ৮ বি... বিধবা ছিলেন। মামীমার বাবার ... সম্পর্কের সূত্রেই বিয়ে করে তাঁর ... কথা-দেওয়া দায়ের পালন করেন। ... মজা আমাকে বলেছেন।'

বস্তুত, শান্তিনিকেতন-শ্যামবাটীতে ... কেউ শরৎচন্দ্রের এই বিয়ের ব্যাপারে ... একঘরে করারও চেষ্টা করে। ... ওরফে বহরমপুরে অমায়িকে কাটিয়েছেন ... চন্দ্র। শুধু তাই নয়, এই অমায়িক ... তিনি অবশ্য অভিযানে গ্রামে ... গ্রামের অন্যান্য প্রবীণ মানুষদের ... এড়িয়ে যেতেন। তবে অন্যদের ...

প্রকাশিত হলো চিরঞ্জীব সেন-এর

মলোটফ ককটেল ৮৲

মার্কিনী ষড়যন্ত্র ৬৲

মাটি আর নেই ॥ প্রফুল্ল রায় ১২৲

এক বিন্দু সুখ (২য় মুঃ) ॥ ঐ ৭-৫০

সনাক্তকরণ ॥ প্রলয় সেন ৯৲

হিমালয়ের মানুষ ॥ সুনীল চৌধুরী ৮৲

দেওবনের দিগন্তে (২য় মুঃ) ঐ ১০৲

জানু ভানু কৃশানু ॥ কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৲

(২য় মুঃ)

রক্তাক্ত খাইবার (২য় মুঃ) ॥ ঐ ১

হায়নার হাসি ॥ ঐ ১১৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি ১০৲

(২য় মুঃ)

দেহপট ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বায়োস্কোপিক ॥ রঞ্জন মজুমদার ১২৲

ঝলসানো বরাভয় ॥ শেখর সেনগুপ্ত ৯৲

নীল ডুংরি ॥ অজাতশত্রু ২০৲

সঙ্গী তিনজন ॥ ঐ ৯৲

দাবার ছক ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৮৲

বাতাসে বিষ ॥ কপিল চৌধুরী ৭৲

আরক্ত রাত্রি ॥ নিশাচর ৬৲

আসন্ন প্রকাশ শম্ভু মহারাজ-এর

সোনা সুরা ও সাকী ৭৲

সাহিত্য প্রকাশ ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত আসবাবপত্র

...র বাড়ি দুটি খেয়ে যান। বেলা হয়ে ...' কামাখ্যাবাবু এবার অন্নার দিকে ...তাকালেন, ভাবলেন, মাসী তো, যদি আবার শ্রীরুদ্রসমাজে বলে দেয়, ভাত ...য়ে! মজাটা হলে শরৎদার বাড়ি গা, ...খেতে দোষ নেই, টাকাপয়সার সংস্রব ...ও আপত্তি নেই, দোষ ভাত খেতে।' ...দা কামাখ্যাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ...পড়লেন, 'ওরে লক্ষ্মণ, মন্নার বাড়িতে ...দিয়ে আয় তো, মামা এবেলা বাড়ি ...বেন না, এখানেই খাবেন। কামাখ্যাবাবু ...কঠিন হয়ে বললেন, বেলা শরৎ, আমার ...সে আহ্নিক হয়নি, তার ওপর বাড়িতে ...রপণিলা আছেন, আমায় পেছো হবতে ...ছে।' দাদা সংগে সংগে বললেন, 'ওরে ...ল, দাদার বাড়ি খবর দিতে যাবি তো, ...স্মার মাবার নারায়ণের পুজোটা করে ...য় আসবিতো'। কামাখ্যাবাবু উঠে ...ড়িয়েছেন। কাঁপতে কাঁপতে দাদার হাত ...বললেন, বাবা আমি গরীব, এখানে ...আমার একঘরে করে দেবেন।' শরৎদার ...সেকি হাসি। বললেন, 'ভয় নেই ...লোক খেতে হবে না। আপনি বসুন' ...বসা। কামাখ্যাবাবু পালাতে পথ ...ন না। তাঁর চা, জল সব পড়ে রইল। ...র্যন্তও জেওয়া হল না।'

শরৎবাবুর আর একটি হিউমারের কথা ...ন সুরেন কাকা। 'একদিন বিকেলে ...ওখানে বসে কথা বলছি। এমন সময় ...ি ভিখু ঘোষাল বেশ সাজগোজ করে ওঁর বাড়ির দিকেই আসছেন। দাদা বাঁকুড়ার ঘোষাল আর ভিখু ঘোষালের ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ভিখুদা শরৎবাবুর সামনে সব সময়েই বড় বড় গাঁজির কথা বলে যেতো, রাজা উজীর মারতো। যেকোন ব্যাপারে দশবারো হাজার টাকার কম কথাই বলতো না। ভিখুদাকে আসতে দেখে শরৎদা বললেন, সুরেন, বসো, ভিখুকে কেমন জব্দ করি দেখো। ভিখুকে বললেন, এই যে এসো ভিখু। আজ কত হাজার রত্নাকরের ভেতর পাওয়া গেল, নাকি ট্রাঙ্কের তলা থেকেই কয়েক হাজার বেরিয়েছে।' ভিখু তো অবাক! বলল, মশায় আপনি বড় বেরসিক লোক, এইসব ছেলেছোকরাদের কাছে আমায় এমন করে অপদস্থ করছেন! ওরা কি বোঝে বলুন তো?' দাদা বললেন, 'না হে। তোমরা যে বল, আজ স্ত্রীর ট্রাঙ্কের তলায় ৪।৫ হাজার টাকা ছিল, নিয়ে এই একে-ওকে ধার দিলাম। আজ রান্নাঘরের আনাজের চুপড়িতে ২।৩ হাজার টাকা ছিল, তা এই এক আত্মীয়ের জমি কেনার জন্যে দিতে হল। কি ভাই তো বল?' শুনে তো ভিখুদার মুখে লাল। না দাঁড়িয়ে সংগে সংগে পলায়ন। শরৎদার তখন সেকি হাসি। বললেন, জান সুরেন, এদের অহংকারে মাটিতে পা-ই পড়ে না! তবু যদি না ওদের হাঁড়ির খবর জানতুম! পরের কাছ থেকে মানি অর্ডারে পাওয়া কি হলধর? ওরা কি বোঝে না, ছেলেরা এই গ্রামে থাকে, সব খবর ওদের জানা! এদের না ঠকলে হয় না, জান সুরেন!'

সারেঙকাকা শরৎবাবুর এক ...খাওয়ার গল্প করলেন। 'সেবার মা ...ফণী চাটুজ্জের বাড়ি দুর্গো...নিমন্ত্রিত ছিলেন আমাদের সংগে ...ধরে সাধারণত কোথাও যান না, নিজের বোনের দেওর পাঁচকড়ি মুখ...নিমন্ত্রিত, তাই উনিও গেছেন। লোকের কাছে চেয়েচিন্তে পুজো, ...র খাওয়া-দাওয়া। আমি বসানি শরৎদার সংগে। পাতায় অতি কট শুকনো ভাত আর একটুখানি ...চড় ছাড়া তরকারি বলতে কিছুই পাঁচকড়িবাবু একটা ডাঁটাচচ্চড়ির ডাটা দিতেই শরৎদা বললেন, কি হে পাঁ শেষ পর্যন্ত তুমিও বসে পাঁচকড়িবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে বললেন, কি করব শরৎ, উপরোধ পারলুম না।' 'তা বেশ করেছ, এখন বাড়ি চলো।' দাদা উঠে বাইরে ফণীর হাতে প্রণামীস্বরূপ ৫ দিলেন। ফিরে আমাকে বললেন, তুমি আর বোসো না, বুঝতেই তো সবো এবার বাড়ি যাওয়া যাক।' ফণী এসে একটুকরো তরকারি মায়ের প্রসা দিয়ে গেল। আমরা সবাই দাদার দাদা কিন্তু নিমন্ত্রণের ভদ্রতার ধ...টি যাননি। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে হাসি।

CENTRAL LIBRARY

• নতুন

হিমু-ক্রিমে এর

• নতুনত্ব

কিসে ?

নামে তো বটেই

খেয়ে দেখুন
বুঝবেন কত
মোলায়েম,
কত মধুর
আস্বাদে ভরা
আর দামে বাজারের
সমশ্রেণীর আইসক্রীমের
তুলনায় অনেক কম।

ডিরেক্টরেট অফ ডেয়ারী ডেভলপমেন্ট,
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রস্তুত।

সদ্য প্রকাশিত

নাট্য-নির্দেশনার ব্যবহারিক বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এ জাতীয় গ্রন্থ এই প্রথম

নাটক পরিচালনা

প্রকাশ বন্দ্যো (অগ্নিদূত)

অপেশাদার, পেশাদার, নাট্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নাট্য-পরিচালক, শিল্পী, কর্মী, সমালোচক এবং নাট্যমোদীদের একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

নাটক পরিচালনা

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রকাশ। একটা নাটক কিভাবে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ভালভাবে প্রযোজনা করতে হয় তা জানুন।

নাটক পরিচালনা

বৈঠকি ভাষায় লেখা প্রত্যেক নাট্য পিপাসু মানুষের অনেক নতুন চিন্তাভাবনার খোরাক যোগাবে।

মূল্য ১৫-০০ ॥ সডাক (রেজিঃ) ১৭-০০
অগ্রিম ৫-০০ পাঠাতে হবে।

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির
৩৪/৩এ কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২

শরৎচন্দ্র ও তাঁহার মামুল

বড়লোকদের, অহংকারী মানুষদের যেমন শরৎচন্দ্র দেখতে পারতেন না, তেমনি গ্রামের গরীব, নীচুজাতের মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। সমান দরদী মন ছিল মূক পশুপাখিদের প্রতিও। এই ব্যাপারে নিজের কথা উঠতে সুরেনকাকা বললেন, 'সেই স্কুলে প্রথম শরৎদাকে দেখার পর তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় একটা বিরোধের সূত্র ধরে। শরৎবাবুর ছিল ফুলগাছ করার সখ। বিরাট বাগান করে-ছিলেন বাড়ির সামনে। এখনো সে বাগান তোমরা দেখেছ বাঁধেন। ওই বাগানে প্রথমে কোন বেড়া দেননি। তা গ্রামে যা হয়, একবার আমাদের একটা গরু তাঁর বাগানে ঢুকে খেতে উনি সেই গরুকে ধরে রাখেন। আমার সঙ্গে পরিচয় নেই, উনি নতুন এসেছেন। গিয়ে বললাম, 'আমরা গরীব মানুষ, গরুকে চরে খেতে দিয়েছি, ওদের খাবার জোগাড় করতে পারি না বলে। গরু চরতে দোষ কোথায় বলুন?' উনি বললেন, 'আমার বাগানে এত ফুলগাছ, সব নষ্ট করে দিচ্ছে যে!' বললাম, 'আপনি তো বেড়া দিতে পারেন!' আমার কথা শুনে শরৎবাবুর কি মনে হল, আমায় ডাকলেন। কাছে ডেকে বললেন, "দেখ আমি আগে যেখানে থাকতাম, সেখানে জমিদার তাঁর সখের বাগান কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশের এক চাষীর এক বলদ হঠাৎ কি করে যেন সেই বাগানে ঢুকে পড়ে। মালী যখন তাড়া করে তাকে, বলদটা বেড়া ডিঙোতে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে তারে লেগে তার পেটটা চিরে যায় ভয়ানকভাবে। চোখের সামনে আমি দেখেছি এ দৃশ্য। তারপর থেকে কোনদিন আমি বেড়া দিইনি।' বলেই বি জ্ঞানন্দে। মুখে বিবাদের পশুর জন্য যে কি বেদনা ত তা ভোলা যায় না। জান, সেই থেকেই উনি আমার দাদা, আমি ভাই হয়ে যাই।'

সুরেনকাকার কথায় মনে সেই বলদের কথা মনে প্রবাসী লেখকের তাঁর সঙ্গে একাত্মতার এমন নজির শরৎবাবুর মানুষের প্রতি দ বললেন। বললেন, 'বাঁধের কুটিরে' থাকতো, আর রাস্তা করত একবুড়ো। শরৎদা গেলে প্রতিদিনই নিজের থে যাবার পথে পয়সা দিতেন। তিন-চার মাস অন্তরে থেকে যায়। আমরা রান্নাঘ, অনাজা কষ্টে থাকছে। শরৎদা দাঁড়ালেন। বললেন, 'এর কি না?' মশার কি কোন জাত কথায় আমি, বিকু হাজরা চক্রবর্তী মিলে মড়া শ্মশানে কাঠ পাওয়া গেল না। শ শ্মশানের পড়ে থাকা কাঠ পোড়াও।' শরৎদা নিজে স সমস্ত কাজ করে আমাদের বাড়ি ফেরেন। গ্রামের কেউ ই করতে পারেনি এই পোড়ানোর জন্যে। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিল শরৎদার। আর ও কর্তব্যবোধ।'

গ্রামের নীচুজাতের মানুষদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে শরৎচন্দ্র যে সেই সময়ে কি আপ্রাণ প্রয়াস করে গেছেন, তার আর একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিলেন সুরেনকাকা। বললেন, 'আমরা একবার ঠিক করলাম ক্লাবের তরফ থেকে সর্বজনীন দুর্গাপূজো করব। গ্রামে তখন খুব কম দুর্গাপূজো হত। আমাদের ইচ্ছে ছিল শরৎদাকে পূজোর প্রধান করব। শরৎদাকে বললাম, দাদা রাজি। কিন্তু সংগে সংগে বললেন, সুরেন, আমি তোমাদের ১০০ টাকা দেব, কিন্তু তাহার দরুণ আর সব ছোটজাতের ছেলে-মেয়েরা নতুন কাপড় পরে অঞ্জলি দিতে যাবে ওদের অঞ্জলি দিতে দেবে তো? নাহলে আমি কিছুতে থাকবো না চাঁদাও দেব না।' আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, তখন খুবই গোঁড়ামি ছিল। কি করে আমার মা-বোনের সংগে ওদের পূজো দিতে দেব? অমত জানিয়ে ফিরে এসে ক্লাবের বন্ধুদের বললাম। তারাও রাজি নয়। পূজো হল না। তবে এ ব্যাপার নিয়ে শরৎদা কিছু আমাকে বলেননি। আমিও আর এ প্রসংগ তুলিনি। বছরকাবার পরে শরৎদা নিজে থেকেই বললেন, সুরেন, দুলে-কাহারদের দূরে সরিয়ে রেখে উঁচুজাতের লোকেরা আর বোশদিন একাধিপত্য চালাতে পারবে না। এই যে কথাটা বললাম, আমার কথাটা ফলে কিনা দেখে নিও।'

বস্তুতঃ অদ্ভুত মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র। যা নিজের জীবনে বিশ্বাস করতেন সেই বিশ্বাসকে সঞ্চিত করে রেখেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসেও। শিল্পের সংগে বাস্তব এমন একাত্মতা কমই মেলে। এর প্রমাণ

শরৎচন্দ্রের ভাগ্নী পারুলদেবী বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও বারের স্মৃতিচারণেও পাই। বলা বলেছেন, 'একবার শিবের গাজনের সময় গোবিন্দপুরের জমিদার মোহিনী ঘোষাল বললেন, শিবপূজো হোক, কিন্তু তাহার দরুণ বাগ্দীরা যেন তাতে জল না ঢালে। তাঁর নায়েব মানে ম্যানেজার এক কাঠি বড়, ভীষণভাবে নীচু জাতের ওপর ভিতরে ভিতরে অত্যাচার চালালেন, চাপ সৃষ্টি করলেন। আমি একদিন গেছি, দেখি শরৎবাবু ভীষণ রুষ্ট। সহ্য করতে পারছেন না এই অত্যাচার। তিনি বললেন, 'পুলিন, খুব তোমাকেই বলছি, দেখো, এর কি ব্যবস্থা করি।' সেদিন সকালের কথা। সেদিন রাতে তখন দশটা, হাওড়ার এস পি ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার বাড়ি এসে হাজির। আমার মা আমাকে ঘুম থেকে তুললেন, ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় আমাকে চিনতেন, বিশ্বাস করতেন। সলো নিয়ে গেলেন গোবিন্দপুরে। আমার কাছ থেকে সব খবর নিলেন, শরৎবাবু বলে এসেছেন ওঁকে জমিদারের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে। আসলে শরৎবাবু ভিতরে ভিতরে এমন ব্যবস্থা করেন যা কেউ টের পায় না। কাহল ঘুলেরের জল সেদিন যে রাতে হয়েছিল, এবং শরৎবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।'

শরৎবাবুর প্রিয় পঞ্চানন বহুর কাছেও কিছু ঘটনা শুনেছিলাম। হরি বলল, 'বাবু, শরৎবাবু যে আমাদের কি চক্ষে দেখতেন তা বলে শেষ করতে পারবো না।' একটানা বলতে বলতে

উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি
সুশীলকুমার ভট্টাচার্য ১১-০০

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৮-০০

শ্রীচৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি
পরিতোষ দাস ১০-০০

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়
সুকুমার মুখোপাধ্যায় ১০-০০

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী
সন্তোষকুমার কুণ্ডু ৬-০০

পরমারাধ্যা শ্রীমা
মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ৩-০০

মানব-সমাজ
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১০-০০

পাগল হরনাথ
ডঃ কার্তিকচন্দ্র রায় ১৬-০০

রাজা রামমোহন
ঋষি দাস ১২-০০

রবীন্দ্রনাথ (কবি ও কবিকর্ম)
মনোরঞ্জন জানা ১৬-০০

কাশ্মীর-অমরনাথ
মন্মথ রায় ৭-০০

আমিঃ তুমিঃ অন্যান্য
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৮-০০

সাগর-বেলা
বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত ৮-০০

শ্রীমতি ক্রাডক
অনেকে বিশ্বজন ৮-০০

অভিশপ্ত দশক
অশোককুমার ভট্টাচার্য ৬-০০

অশোক পুস্তকালয়,
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

একটা ঘটনা বললেন, 'একবার আমাদের এখানে খুব কলেরা হচ্ছে। একসঙ্গে ১৫।১৬টা মড়া পড়ে। বাবু সব ওষুধপত্তর দিলেন, দিনরাত আমাদের মধ্যে পড়ে আছেন। মড়া পোড়ানো হবে, বাবু কিন্তুতেন না। আমাদের জাতের মড়া, এমন অসুখ কিছুকে গ্রাহ্যি নেই তাঁর। অন্য আমাদের বাড়ি খেতে দিলেন। এমনকি এক একদিন নিজের মুখও সব আমাদের ভাগ করে দিয়েছেন আমাদের কাজ করার জন্যে। বলতেন, মুচির মড়া, কাহারের মড়া আবার কিরে? সব মড়াই সমান।'

এই আমাদের শরৎচন্দ্র। নীচু জাত বলে তিনি মানতেন না। যারা বঞ্চিত, অবহেলিত, দুর্বল, নিপীড়িত, তাদের জন্যই তিনি যেন শেষ বয়সটা উৎসর্গ করেছিলেন। পাণিত্রাস-সানতাবেড় গ্রাম তাই জাগ্রত করে তুলেছিল তাঁকে। তিনি বাস্তবিকের চিকিৎসা করতেন, নিজেই রোগীর কাছে থাকতেন সব সময়। হরি পাখিরা বলল, শরৎবাবু ছিলেন দেবতা লোক। আমাদের এখানে কারোর অসুখ করলে তিনি শুধু ওষুধ দিতেন না, পথ্যির জন্য টাকা দিতেন, দিন তিনবার করে খোঁজ-খবর নিয়ে যেতেন। এমন প্রাণ ছিল তাঁর বাবুর।

বাস্তবিকই জাত মানতেন না। আমার মামা-মা শুরুতেই বললেন, একবার পঞ্চু গাঙ্গুলীর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এসে ফেরার পথে আমাদের বাড়ি এসেছেন। বাবা হুকো নিয়েই মেজাজ করে তামাক খেয়ে বাড়ি ফেরেন। জাতের কথা উঠলেই শরৎ-বাবু রেগে যেতেন।' একটু থেমে মামা আবার বললেন, 'আর একদিনও তামাক খেতে এসে আমাদের হুকো না থাকায়, পাশের বাড়ি বিপিন বেরার কাছ থেকে হুকো এনে দিলে তাতেই আরাম করে তামাক সেজে খান।'

গ্রামের মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে গেলে

কলঙ্কীর ঐতিহ্যমণ্ডিত
লক্ষ্মীবিলাস তৈল

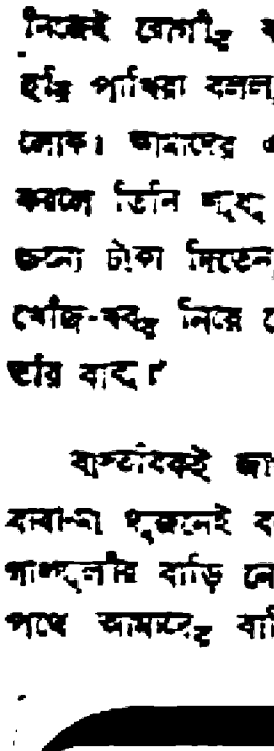

মুখোজ্জ্বলকারী রুচির চাহিদা মত এবং প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার মত প্যাকিংও পাওয়া যাচ্ছে। কেশ তৈলে এরূপ প্যাকিং এই প্রথম।

এম.এল.বসুএণ্ড কোংপ্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৯৬

পাঁচুলালের সর্বাঙ্গে লেখা চিঠির অংশ

...বে তো অবাক! এতগুলি লোক বসে ফিরে গেলেন, উনি তেমনই

...কাকাও একদিন এক অভিজ্ঞতার ...লন, 'একদিন দুপুরে বাড়ি গিয়ে দেখি উনি চেয়ার টেবিলে ...ার একটা কভার পাতা শেষ হলেই ...ান্ডে সাজিয়ে রাখছেন। আমি ...বেলাম না। পিছনে একটু সময় ...রে দাঁড়িয়ে আছি আর ঘামছি। ...ণর পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখেই বলেন, 'আরে সুরেন, তুমি ...। ডাকনি কেন?' 'দাদা আপনি ডাকা উচিত নয়।' 'তাতে কি? দুপুরটা যখন নির্জন থাকে তখনি উপন্যাস লেখার মেজাজ আসে কিছুটা লিখে ফেললাম।' আমি লিখছেন এই অবস্থায় আপনাকে দেখে আমি সাহিত্যিকের সাধুবেশ ...না।' আমার কথায় অকৃত্রিম মুখে ভাব। শরদিন্দু সলজ্জ হয়ে সলজ্জে 'না না, কি বল সুরেন, এভাবে থাকই লিখে থাকেন। তবে কি জান ...র তৃতীয় প্রহর বা এই দুপুরটাই সা পছন্দ করি।' এরপর আর এক-খার কথা না বলে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ...প্প মেতে গেলেন আমার সঙ্গে।

প্রফুল্লকাকাকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, শরৎবাবুর লিখতে বসার ব্যাপারে কোন স্মৃতি আছে কিনা তাঁর। বললেন, দুপুরের দিকে লিখতেন বলতে হবে আমি তা দেখেছি। লিখতেন মাদুর পেতে যখন লিখতে বসতেন, অভ্যাস ছিল বাঁকের ওপর বালিশ রেখে উপুড় হয়ে লেখা। লিখতে বসলে একেবারে তন্ময়।' এই প্রসঙ্গেই বললেন, 'একদিন দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা, ওরকম টুকরো টুকরো ফিলপ কাগজে লেখেন কেন?' 'কেন বলতো?' যে কোন একটা স্লিপ হারিয়ে যেতে পারে তো? তাছাড়া পর পর না সাজালে গোলমাল হয়ে যেতে পারে।' হাসলেন শরৎদা। বললেন, দেখ প্রফুল্ল, এই রকম মোটা এই স্লিপ কাগজের দাম অনেক। একটা জায়গায় যদি একটু ভুল হয়ে যায় তো সেই গোটা কাগজটাই বদলাতে হয়, পরিশ্রম নষ্ট তাছাড়াও। কিন্তু ছোট স্লিপে যদি ভুল জায়গায় বসাতে হয় তবে সেই ভুল স্লিপটা বদলালেই হল, গোটা কাগজটা আর নষ্ট হয় না।'

লেখার ব্যাপারে মনের দিক থেকে শরৎ চন্দ্র ছিলেন সাধক শিল্পী। লিখতে বসার সময় তিনি একা নিঃসঙ্গ ধ্যানী তন্ময়। তখন দেখলে বোঝাই যায় না এই মানুষটিই গ্রামের নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে এখানে ওখানে ঘুরছেন

সদ্য প্রকাশিত দুখানি বই

রহস্যময় লাহুলের, সেই সিংহের প্রচণ্ড সাদা ঠান্ডা কেশর ধরে লাফ দিয়েছিলেন, তার পিঠে চেপে বসেছিলেন এক দুর্ধর্ষ বাঙালী তরুণ। এই কাহিনী নিছক অভিযান নয়, রীতিমতো সাহিত্যের এ্যাডভেঞ্চার। ছোটরা পড়বে, বড়রা পড়বে, পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে আসবে। অনেক ফোটো দিয়ে কাহিনীর মেজাজও জমাট রাখা হয়েছে। তরুণ পর্বত অভিযাত্রীর এই আখ্যান ধারাবাহিক বেরিয়েছিল 'আনন্দমেলায়'।

শিশির ঘোষের

লাহুল সিংহের সন্ধানে ৬·

বাইরে অলৌকিক শক্তি থাক বা না থাক, আসে যায় না। মনে একটা কিছু আছে, যুবক-যুবতীদের মনে। অলৌকিকের সঙ্গে কামনা-বাসনার চরম সংঘর্ষে মানুষ কোথায় যেতে, কোথায় হারে, এই উপন্যাস তাই নিয়ে লেখা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

গোপনে নির্জনে ৮·০০

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছ থেকে তাদের সুখে-
ছেন। সে মনুষ সাধা
মানুষ সেখার মধ্যে
হিত।

ন নারীদের চোখের
হয়, লিখেছেন দুই-
সমস্যা শ্রদ্ধা ছিল নারী
ন দয়া ছিল নীচু স্তরের
ামের মা একটা ঘটনা,
ই। আমার মা আর বড়

পিসিমা প্রায় প্রতিদিনই ছোটর দিকে
নারায়ণের ধারে শরৎচন্দ্রের বাড়ির দিকে
বেড়াতে যেতেন। একদিন দুজনে বাড়ির
ফিরছেন, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। ওঁর
বাড়ির লাগোয়া শক্ত মুর্তিতে দাঁড়িয়ে
আছে। 'তোমরা যে যাও' পিসিমা বললেন,
'আমি পুলিসের বোন, এ বৌদি।' শরৎবাবু
আস্তে আস্তে আছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন।
'তোমরা কি ফিরছ?' 'হ্যাঁ' এই রাস্তায়
যাবে না রাস্তা বোধ হয় খারাপ।' একথা

মানেও আমরা তখন
যে কখন পিছু পিছু
এক জায়গায় থেমে
বড় খাল। রাতের ছো
বড় হয়ে গেছে, মাঝি
গেছে। 'খুব সাবধান
দাঁড়িয়ে রইলেন। য
ওপরে কষ্ট না করে
পাঠিয়ে তারা এলেন।
গেছি বেড়াতে, ফেরার

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে

টিনোপাল®

সিন্থেটিক ও রেয়ন্স কাপড়ের জন্যে
টিনোপাল-এস

সুতীর কাপড়ের জন্যে
টিনোপাল

®টিনোপাল সুইজারল্যাণ্ডের সীবা গাইগী লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
ব্লুবেল গাইগী লিঃ পোঃ অঃ বক্স ১১৯৫০, বোম্বাই ৪০০ ০২০

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

ান দিয়ে আসব কিন। শরৎবাবু কোথায় লেন বেরিয়ে এলেন, বললেন, যাও মা, ার যেতে পারবে।' আমরা সেই খালের ধনে এসে অবাক। একটা মজবুত বাঁশ-ঠ-মাটির পুল করে দিয়েছেন তিনি এক নেই। আমরা পার হচ্ছি তিনি পিছনে সেই ন্ত মূর্তিতে দাঁড়িয়ে হাসছেন।'

কোন খ্যাতির মোহ নয় কোন অর্থের রোকার নয়। কোন দান করে উপকার করে তার ভূমিকায় আসার আকাঙ্ক্ষা নয়, ল্পী শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে এই রকম জস্ফূর্ত নিঃস্বার্থ মনের মানুষই লেন। তার আর অনেক প্রমাণ পেলাম মের নানাজনের কাছে। বাবা বললেন, য়েদের ভয়ঙ্কর প্রশ্ন করতেন শরৎবাবু। ন পড়ে একদিন পাণিত্রাস স্কুলের ঘরে মিটির সভা হচ্ছে। শরৎবাবু সেখানে বসে। াৎ খবর এল, কলকাতা থেকে কয়েকজন ন্রমহিলা এসেছেন ওঁর সঙ্গে দেখা তে। অথচ তখনি সভা ছেড়ে ওঠা যায় , গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা চলছে। ৎবাবু বললেন, 'মেয়েরা আমার সঙ্গে খা করতে এসেছেন। ওঁরা বাইরে ড়িয়ে থাকবেন, এটা ঠিক নয়। আমি ং উঠি।' বলে মত নিয়ে তিনি সভা ল বেরিয়ে গেলেন।

আরও একটি ঘটনা বললেন সুরেন-কাকা। 'সেবার শরৎবাবুর উৎসাহে গার্লস লের সেই কাঁচা বাড়িতেই মেয়েদের য় সরস্বতী পুজোর খিচুড়ি আর ভাজা-জি পাওয়ানোর ব্যবস্থা হল। শরৎ-মাকে আর ধীরেনকে দুপাশে নিয়ে খেতে লেন। শরৎদা খান কম কিন্তু স্কুলের য়েদের হাতে রান্না তিনি খেতে ভালোবাসেন। র এই দিনই ঘটনাটা ঘটল। স্কুলের স্নেহ-ক্ষা শিক্ষিকার ফিট হল হঠাৎ। শরৎদাকে লে সঙ্গে ডাকা হল চিকিৎসার জন্যে। দা ব্রমেশ ডাক্তার তার মনদাকে সঙ্গে নিয়ে লে সঙ্গে এলেন। কিন্তু মেয়েদের ফিটের সুখে জ্ঞান থাকে না: পোষাক অসংবৃত য়ে যায়। এ অবস্থায় মেয়েদের সঙ্গে বাব-রে যদি কিছু খারাপ দেখায়, এটা গ্রাম। াকে বললেন, সুরেন, তুমি মেয়েটাকে একটু মেয়োটিকে ধর, আমার খারাপ লাগছে। শরৎদার সে কি অস্বস্তি! তারপর তো অসহ্য শান্ত হল কিন্তু পরবর্তী সেই ভয়ঙ্করী অস্বস্তির চেহারা আমি এখনো ভুলতে পারিনি।'

হরি পাখিরা জোর দিয়ে বলল যাবু, আমরা দেখেছি কোন ভিখিরি কোনদিন বাবুর কাছ থেকে কিছু না নিয়ে কিরে যেত না। হয়ত প্রথমে বললেন, যা কিছু নেই, সেই ভিখিরিটি নিয়ে চলে যেতে বললেন এই হবে ওকে ডেকে নিয়ে আয় তো। আমার ডেকে পয়সা দিতেন।' বলতে বলতে পঞ্চাশের পেছনের বুড়ো হরি পাখিরা থেমে কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। এক সময় বলল, 'জানেন বাবু, একবার আমি গিয়ে বাবুর সামনে হাত দাঁড়ালাম। ভয় করতুম, কোন কথা বলছিনে। বাবু হঠাৎ আমাকে দেখে বড়মাকে বললেন 'দেখ তো হরে কি চাইছে।' আমি বললুম, বাবু সবলাকে কাপড় দেন আমি কি একটা পাবনি?' বাবু হাসলেন, বড়মাকে বললেন, 'আমার একটা পাঞ্জাবী ওকে দাও তো। বাবুর সেই জামাটা অনেকদিন অবধি পরেছি।'

তখনকার দিনে গ্রামের অভাবী ব্রাহ্মণ আর নীচু জাতের এমন কেউ ছিল না যারা শরৎচন্দ্রের কাছে কোন না কোনভাবে সাহায্য পায়নি। গ্রামের সঙ্গে এইভাবেই জড়িয়ে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর বাস্তবহৃদয় যেমন তেমনি শিল্পীহৃদয় দুই-ই পাণিত্রাস-সমতাবেরের শেষ জীবনের দিনগুলিকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ফসল ফলিয়েছে।

কিন্তু গ্রামের মানুষ সমাজ যেমন তাঁকে বহির্জীবনে ব্যস্ত রেখেছিল তেমনি আবার অন্যদিকে তাঁর সংসারও তাঁকে ভরংকরভাবে টানত। সংসারের সমস্ত দিকে তাঁর নজর ছিল তীক্ষ্ণ। ১১ই ভাদ্র ১৩৩৭ সালে লেখা ভগ্নী পান্নালতার কাছে যে চিঠিটি লেখা হয়েছে তাতে ভগ্নীপতির অসুস্থতার জন্য ভয়ংকর দুর্ভাবনার কথা যেমন আছে, তেমনি বোন অনিলাদেবী কলকাতায় থাকায় সংসার-

পুলিনবিহারী দত্ত

শ্রীরূপগোস্বামী-কৃত
উজ্জ্বলনীলমণি
ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৫-০০
বঙ্কিম-অভিধান
আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৫-০০
রবীন্দ্র-সাহিত্যের
নবরাগ
সুকুমার মুখোপাধ্যায় ১০-০০
শাক্তদর্শন ও
শাক্তকবি
ডঃ দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১০-০০
কাব্যমঞ্জুষা (সমগ্র)
মোহিতলাল মজুমদার ১৫-০০
লোকসাহিত্যে ঈশপ
ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত ৮-০০
বঙ্গের রত্নমালা
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১০-০০
মেঘদূত
মল্লিনাথ কৃত ও পূর্ণ চন্দ্রবর্তী
টীকা ৬-০০
চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৮-০০
HISTORY OF VERNACULAR EDUCATION IN BENGAL
Dr. N. L. Basak 40.00
সংস্কৃতির ধর্ম
রঞ্জনরঞ্জন বসু ১০-০০
সমষ্টি উন্নয়ন ও
সমবায়ন
গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ১০-০০
বিদ্যাপতি-সমীক্ষা
ডঃ নরেন চক্রবর্তী ১০-০০
অপ্রকাশিত অজন্তা
নারায়ণ সান্যাল ১৫-০০
শ্রীরূপ ও পদাবলী-
সাহিত্য
ডঃ শুকদেব সিংহ ১৫-০০
ময়মনসিংহ-গীতিকা
(সম্পূর্ণ)
সুখময় মুখোপাধ্যায় ২৫-০০
ভারতী বুক স্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

শরৎচন্দ্রের কৃত্য সাপন হজরা

পুলিশে ধরবে এমন খবর এলো। মামা সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবাকে বললেন, মুখুজ্জে মশাই, আমি লুকিয়ে থাকছি। যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। কবে ছাড়বে জানি না। পারুর বিয়ের সব টাকা রইল, তুমি তাকে দেখে ওর একটা বিয়ে দিও।'

[ছিল আর নলাদিঘির ঘটনাটি খবরও আছে. প্রসঙ্গত পানুবালা দেবী জানালেন, মামা খুব সাহসিক মানুষ ছিলেন। আমাকে ডুংরি স্কুলে ভরতি করে রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে শিলপাথরে যখন বাড়ি ভাড়া করে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন ঠিক তখন থেকেই পালকি-সামত্তাবেড় থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখেন, আমাকে মানুষ করতে শুরু করেন। তখন আমার বয়স কতই বা—পাঁচ-ছয় হবে। লোকজন এসে বড় হলে আমিই তাদের চা জলখাবার করে দিতাম। মামাই আমার জোড়াপড়ার খরচ দেন, আমার হাতা পুতু পড়ুন থেকে আরম্ভ করে বিয়ে দেন। সম্প্রদান নিজেই করেন।' বলতে বলতে একটু থামলেন। আমি তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে দেখতে পেলাম এক অসাধারণকে ছাপিয়ে পরিবারের স্নেহশীল মানুষ হিসেবে, যিনি ভোর পাঁচটায় চা-টা জলখাবার তৈরি করে, তাদের খাওয়ানোর পর নিজে খেতেন। কোনদিন কখন দেখিনি—কোন সময় তখন অসময়ে বাড়ি এসে আর আমার মাকে মুড়ির সঙ্গে ছাড়া। বহু সাহিত্যিক পাকে বসে হাতে দাঁড়িয়ে থেকে নিচু মানের কাছ থেকে, নামী ভক্তী গলায় শুনে, বলেছেন, 'মামা, তুই চলে যাচ্ছিস আমার ডাকবে কেবা?' বলতে বলতে গলা ধরে আসে। আর মামা মোরে কলকাতা চলে যাওয়া হচ্ছে, মামা কী ভীষণ কেঁদেছিলেন। সেদিন বলেছিলেন 'মুখুজ্জে মশাই, আপনি চলে গেলে, আমার টিকিটা কেটে ফেলবে। আমার আর কেউ নেই।'

আবার পানুবালা দেবী অন্যমনস্ক। বড় মামার স্মৃতি তাঁকে ঘিরে ধরেছে। 'আমাকে পরে দুই মামাই পাঠাতেন। বিয়ের আগে একবার সন্তাসবাবুর সম্বন্ধে বলে মামাকে

বাস্তবিক অর্থে কথাশিল্পীর যাযাবর জীবনের যে হৃদয়সংবাদ, তা তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাও নিঃসন্দেহে। পানুবালা দেবী আরও বললেন, 'বড়মামা আমাকে চরকা কিনে দেন। সুতো কাটতে বলেন আমাকে। সেই সুতো থেকে দুটো তোয়ালে হয়। মামা যত্ন করে তা তুলে রাখেন। আমার বিয়ের সময় খুব সুন্দর সাজিয়ে তত্ত্ব দেবার সময় সেই দুটি তোয়ালে দিতে ভোলেন নি। এমনি তাঁর স্নেহ, এমনি তাঁর সাংসারিক দায়িত্ববোধ।'

সুরেনকাকা বললেন, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্কের কথা। 'শরৎবাবু যেখানেই যেতেন হিরণ্ময়ী দেবীকে না জানিয়ে কোথাও যেতেন না। একবার গ্রামের কেশব মোক্তার ঘোষালের বাড়ি শোনেন যে আমি আর শরৎদা নাকি গাজন স্কুলের পিছনে ওদের জংলার পুকুর থেকে প্রায় আধ মণ মাছ ধরে ভাগাভাগি করে নিয়েছি। শরৎদাকে সে কথা জানালাম। শরৎদা তো হেসে কেটে পড়লেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। হাতে হারিকেন নিয়ে বললেন ভৃত্য বামনী বড়াকে। স্ত্রীকে বাস্ত কণ্ঠে বললেন, ওগো শুনছ, এখনি আমি কেশবের বাড়ি যাচ্ছি।' বৌদি বুদ্ধিমতী, বারণ করলেন না, শুধু বললেন, 'এই রাত আবার ভদ্রলোকের বাড়ি কাড়া করতে যাওয়া কেন!' দাদা বললেন, 'না সুরেন তো সঙ্গে আছে।' বলেই চলে এলেন কেশব ঘোষালের বাড়ি। কেশববাবু, শরৎদাকে দেখে আর কোন কথা নয়, কোথায় বসতে দেবে তাতেই ব্যতিব্যস্ত। শরৎদা বললেন, কেশববাবু, আপনি সুরেন সম্পর্কে যা বলেছেন সব মিথ্যে।' কেশববাবু বললেন আপনি একেছেন আমার বাড়ি, আমার আর কোন অভিযোগ নাই, পানি চাই দাদা। আমি নিজে আমার অংশটা স্কুলকেই দিয়ে দিলাম।' তারপর শরৎদাকে খাওয়ানোর সে কি চেষ্টা। শরৎদা শুধু বললেন, 'আজকে সিগারেট আছে, কিছু মনে করবেন না।'

এই লেখক শরৎচন্দ্র। গ্রামের কেউ কেউ হয়তো তখন তাঁর বিরোধীও ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বকে কোনদিন অস্বীকার করতে পারেননি। কাজে তাঁকে একবার দেখে ধন্য হয়ে যেতেন।

কৃষ্ণ গোপাল হালদার জানাল, 'বাবু, শরৎবাবুর মতো মানুষ এ তল্লাটে ছিলেন। খুব ভালবাসতেন আমাকে, তবে বেগে গেলে কাউকে তোয়াক্কা করতেন না। একবার ছোটবাবু (প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় শরৎবাবুর ছোট ভাই) কি ব্যাপারে চেক নিয়ে অন্যায় করেছিলেন, উঃ, সেকি বকুনি ছোটভাইকে। তবে ছোটভাই, মেজভাইকে ভালও বাসতেন খুব। মেজভাইকে তো খুব মানা করতেন, সাধু মানুষ ছিলেন তো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বড়মার (শরৎবাবুর স্ত্রী) সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতেন?' গোপাল হালদার হাসতে হাসতে বলল, সে তুলনা হয়না। তাঁকে তো খুব ভালবাসতেন যেমন, ভয়ও করতেন খুব। একবার বড়মা আর ছোটভাই প্রকাশবাবুকে লুকিয়ে গোবিন্দপুরের শ্যাম ডাক্তারকে কাঠ

কয়েকটি ভাবসমৃদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের এক নতুন অভাশ্চর্য সংযোজন

লেখক : সমীর কান্ত গুপ্ত

পারীজাতক : পাঁচ টাকা

ফরাসী ছোট গল্প সঙ্কলন। এডমন্ড রোস্তা, জোলা, মোপাসাঁ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের লেখক লুই গাঁত্রা ও কোলেৎ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের সকল দিকপালদের স্বকীয় রচনাশৈলী ভাষার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মূল ফরাসী থেকে বাংলায় অনুবাদ।

মনের মণি মুকুর : সাড়ে-তিন টাকা

পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, মূর্তিশিল্পী, কর্মবীর বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভিন্ন মনীষীদের জীবন ও মনের গভীর অন্তরালের অধ্যায়ের যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি এসে পড়ে তাই নিপুণ আলোকসম্পাতে এই গ্রন্থে।

আলবার পদাবলী : দশ টাকা

বাংলা সাহিত্যে যেমন বিদ্যাপতি কড়ীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী, ফরাসীতে তেমনি আলবার দের 'প্রবন্ধ' বা পদ্যমালা। মূল ফরাসি থেকে বাংলায় অনুবাদ।

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-১২, ফোন ৩৪-২০৭৬
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়ার সরণী কলিঃ-১৬, ফোন ৪৭-০০৫৭

৩২টি শক্ত উজ্জ্বল দাঁত
এবং মজবুত হাড়ও।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম প্রয়োজন তার চেয়ে দ্বিগুণ ক্যালসিয়াম-এর দরকার হয় শিশুদের দাঁত ও হাড়ের জন্য। সুস্বাদু রাসবেরির স্বাদযুক্ত ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ আপনার বাচ্চাকে খাওয়ান।

মাত্র ৪-৬টি ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়ি রোজ খেলে আপনার বাচ্চার দাঁত আরো শক্ত সুন্দর এবং হাড় আরো মজবুত হবে। তাছাড়া ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়িতে পাওয়া যায় ভাইটামিন সি, ডি ও বি১২। স্যাণ্ডোজ-এর উপর নির্ভর করুন—দ্বিগুণ ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ গ্যারান্টি।

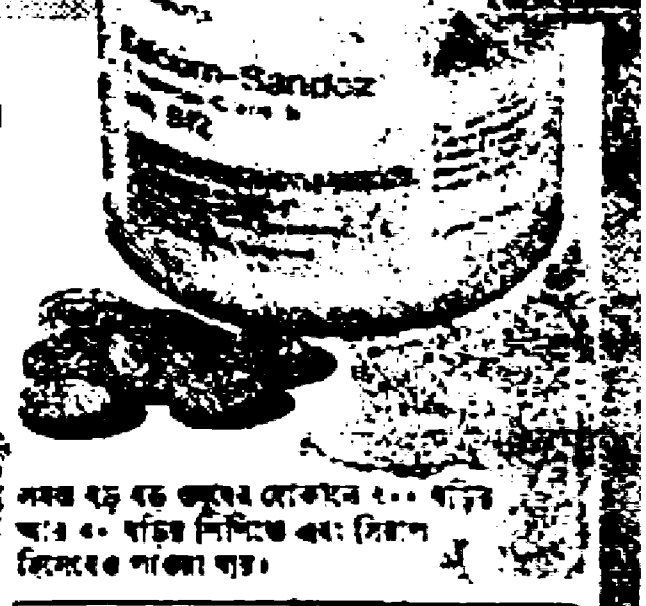

লন্ডন বড় বড় অফিসের রোকড়ের ২০০ বছর আর ৫০ বছর লিপিতে এবং সিরাপ হিসেবেও পাওয়া যায়।

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ®
প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য

SANDOZ

শরীর গঠনে ক্যালসিয়াম

বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা ৩ বছরেই যে সব শিশুরা নিয়মিত ক্যালসিয়াম খেয়েছে তারা, যারা খায়নি তাদের চেয়ে অনেক বেড়ে উঠেছে।

আর কেরোসিন নিয়ে আসতে বলেন। খুব চুপচাপ। রাত তখনো খুব অন্ধকার হয়ে আছে। তখন দুপুর। আমি দিয়ে এলুম। বাবু বললেন, গোপাল খবরদার তোর বউমা আর ছোটবাবু যেন কোনোভাবেই এ খবর না জানতে পারে! আমি বাবু তা আর কোনদিন বলিনি। বাবুর খুন হবার খবরটা কেন দেবতা!' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম 'গোপাল, তোমার মনে পড়ে শরৎচন্দ্র যখন মারা গেলেন?' 'বাবুতো কলকাতায় মারা যান। বাবু মারা যাবার আগে সেই যখন কলকাতায় যান, তত ফুলগাছ আর ফল কেনেন। সেই সব গাছ তো বাবুর গ্রামের বাড়ির বাগানে লাগিয়েছি।' বললাম, 'মৃত্যুর আগে তোমাকে কিছু দিয়ে যান কি?' গোপাল জানাল, 'বাবু বলেছেন, গোপাল আমি না থাকলে তোর মইনে ছোটবাবু (প্রকাশ) আর বড়মা দেবে। শরৎবাবু একটা খাতা আমার কিম্বা বলেছিলেন এই খাতাটা তোর কাছে রেখে দে, এতে সব লেখা আছে সেইমতো পাবি। তোর কোন দুঃখ থাকবে নি।' বাবু, সেই খাতা ছোটবাবু নিয়ে আর নেননি। আর কি হবে, বাবু চলে গেলেন তো অমরও দিন শেষ হল।'

মেজভাই স্বামী বেদানন্দ (প্রভাস) শরৎবাবু পুলুকেও বেশী ভালবাসতেন। এই প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া কোর্টের সেরেস্তার একটি ঘটনা বললেন আমাকে। 'প্রভাস আগে কাজ করত ইস্টার্ন রেলে ক্লার্কের, পরে মঠে গিয়ে সন্ন্যাসধর্ম নেয়। কিছুকাল সারা ভারত ঘোরে। মধুপুর, বৃন্দাবনে অনেকদিন কাটিয়ে আসে। একদিন সকালে আমরা সবে আছি, চা এলো। মেজভাই প্রভাসও বসে আছে। চা মুখে দিয়ে প্রভাস বলল, 'ইস চা-টা তো খুবই খারাপ, কেমন কালো লাগছে!' ব্যাস, আর যায় কোথা! প্রভাস বলেছে চা খারাপ, তা হলে খারাপই, শরৎবাবুর তৎক্ষণে প্রায় চাটাই খাওয়া শেষ। উনি উঠে দাঁড়ালেন, চা দেখে বললেন, ওই তো চা এত কালো কেন! নিশ্চয়ই সুরেনের দেওয়া চিনি নয়, বা চা খারাপ। গোপালকে সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন, আবার চা করতে বললেন শরৎবাবু। কারোর বাধা শুনলেন না। শেষ পর্যন্ত উঠে গিয়ে নিজের তদারকিতে চা করলেন, স্ত্রীকে বার বার জিজ্ঞেস করলেন, চা এত খারাপ কেন। আবার নতুন করে চা এল। চা হয়তো সত্যি এত খারাপ ছিল না। কিন্তু ওই যে, মেজভাই বলেছে চা খারাপ, তা হলে খারাপই। বাস্তবিক শরৎবাবু মেজভাইকে অসীম শ্রদ্ধার চোখে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেখতেন।' তাঁর উপন্যাসের অনেক সাধু সন্ন্যাসীর চরিত্র একেছেন তিনি।

পান্নালতা দেবী, গোপাল সবশেষে বলল, 'শরৎবাবু ভাত ইত্যাদি বেশী খেতে পারতেন না, চা খেতেন যাকে বলে গামলা-লতা দেবী গ্রামার খাওয়া নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, সে সব মকলে খাওয়া। ঠিক একজন গেঁয়ো মানুষের খাওয়ার মত। আমড় ছেঁচকি, পাকা লঙ্কা, মৌরলা আর টুনা মাছ নারকেল কুটোনো, দুধের সঙ্গে চিড়ে দিয়ে পায়েস—এই সব। ধীরে শান্তিতে বসল, 'শরৎবাবুর তেমন জাঁকের বিড়াল ছিল না, তেমনি ছিল না খাওয়ার বিচার। আমাদের এখানে একটা ভাল খোড় চাইতেন মাঝে, বেশী কষে চালডালা, ছোলাডালা, অম্বলের বড়া চা খেতেন।'

খাওয়ার যেমন শখ ছিল, বিলাসী মানুষও ছিলেন তেমনি। ফুটবলের খেলা করা, ফুলগাছ লাগানো, করা খেলা—সব রকমের নেশা করার মনও ছিল তাঁর বিচিত্র। সেখানেও সেই বৈলাসিতা! পান্নালতা দেবী বললেন, 'মামার ভোল ফুকুরটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া কলেজে মরে যাবার পর খুব ভেঙে পড়েন। মনে পড়ে ফুকুরকে চেয়ারটেতে তিনটি আসনে মুড়ে যত্ন করে মাটির নীচে শুইয়ে করব দেন।' প্রফুল্লকাকা অমূল্য কাকা দুজনেই বললেন, 'শরৎবাবু দাবা খেলা দেখতে ভীষণ ভালবাসতেন। পদ গাঙ্গুলী, কেবার বরুকে ডেকে প্রতিদিন ও'র বাড়িতে এই খেলার ব্যবস্থা করে-ছিলেন।' সতীশকাকা বললেন, 'শরৎবাবুর ছিল ভাল গড়গড়া খাবার শখ।' একটা ঘটনা বললেন, শরৎবাবু প্রায়ই সতীশকাকার উলুবেড়িয়ার বাড়ীতে আসতেন। একদিন খাওয়া দাওয়া করে তামাক খেতে গিয়ে সতীশকাকার দেওয়া একটি গড়গড়া ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়। কিছুতেই আর ছাড়তে চান না। শেষ পর্যন্ত সতীশকাকা গড়গড়াটি নিয়ে উলুবেড়িয়া স্টেশন পর্যন্ত এসে সেটি ওঁর হাতে দিয়ে যান। শরৎ-বাবুর ঘরে যে গড়গড়াটি আছে ওটি তাঁকেই দেওয়া। ভৃত্য গোপাল হালদার বলল 'বাবুর তামাক খাওয়ার নেশা ছিল ভীষণ। প্রত্যেক দিন আড়াই সের তামাক খেতেন। সন্ধ্যের দিকে দিদির বাড়ি বেড়াতে যেতেন। ময়না, কাকাতুয়া মহুর, হরিয়াল পাখি পোষার ওঁর ভীষণ সখ ছিল। তিনটি গরু, তিনটি কুকুর, দুটি পাঠা তিনি পুষেছিলেন।' হাসতে হাসতে গোপাল বলল, 'বাবু পাঠা দুটোর নাম রেখেছিল বড় মিঞা, ছোট মিঞা। আমার মনে হয় বড় পুরুষ বাবু মারা পড়েছিলেন, তাদেরও যেন কি নাম রেখেছিলেন, ভুলে গেছি!' গোপাল জানাল, 'দুবেলা সকালে আর পড়গাছগুলোকে দাবা খেলার জন্যে প্রতিদিন পয়সা দিতেন। বাবুর অদ্ভুত সব সখ ছিল। বাবুর নাড়ির সামনে কি পেয়ারা হত, আর পাড়ার

অজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকীতে
আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম

—জ্ঞান নিকেতন

নর্মা মাকেনো রচিত 'বোমারুদ্ধকারী জোসেফাইন গুপ্তচর কাহিনী I was a spy' -এর কাহিনী অবলম্বনে ইন্দ্রভূষণ দাস অনূদিত

স্পাই মেয়ে মার্থা

মূল্য দশ টাকা

বাবজী রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক

সমাজ বিরোধী ৩·০০

স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত তিন অঙ্কের থিয়েটারের নাটক

পরিবেশক : জ্ঞান নিকেতন : ১৮/এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
নতুন বই
চিত্র-বিচিত্র
একাল-সেকালের বিচিত্র কথা
ও
রসমধুর কাহিনী সমারোহ।
দাম ঃ সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট. কলিঃ-১২

'রূপা'র বই
জীবনের ঝরাপাতা
সরলা দেবী চৌধুরানী
[১৮৭২ ঃ ১৯৪৫]
মুখবন্ধ ঃ নীহাররঞ্জন রায়

ঠাকুরবাড়ির গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও স্বকীয় স্বাধীন ভাবনার উন্মেষ সরলা দেবীর জীবনকে করেছিল স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। সঙ্গীতে সাহিত্যে কর্মে ধর্মে নিজেকে এমনভাবে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন, যাতে সারা ভারতের প্রজ্ঞাবান মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর প্রতি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, তিলক, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি মনীষীদের অন্তরের প্রীতি অভিসিঞ্চিত এই মহীয়সী নারী জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। ঋষি বঙ্কিমের উপন্যাস দেবী চৌধুরানীর বৈপ্লবিক ভাবমূর্তিটি যেন তখন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছিল সরলা দেবীর মধ্যে। এই আত্মকথা শুধুমাত্র একজন মহীয়সীর জীবন-বৃত্তান্তই নয় একটি উজ্জ্বল দীপের মহান কর্মযজ্ঞে নিরন্তর আলোক বিকীরণের কাহিনী। (দাম : ১৬.০০)

রূপা ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ঃ কলকাতা ৭০০ ০১২

দেখিয়েছিলুম সেদিন।" স্মৃতিতে সেই মজার কথা ধরে হরি পাখিরা মুখের স্মরণ নিষ্পাপ হাসি হাসছে। একবার মামা বলেছিলেন "হরি সমাজে আমাকে মারবে বলছে যে রে!" মারবে? চলুন তো মামা দেখি যে আপনার গায়ে হাত তোলে।" বলে সঙ্গে সঙ্গে লাঠি তুলে নিয়ে মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।" বলতে বলতে হঠাৎ হরি পাখিরা থেমে গেল। চোখ ছলছল করছে, মুখ বিষণ্ণ। বলল, কলকাতায় যাবার আগে মামা বলেছিলেন, হরি যদি বাঁচি তোকে সোনায় বাগান করে দেব। সেই সোনার বাগানের মালি হবি তুই। তা আর হয়নি। সেই দেবতা মানুষটাকে ভগবান কেড়ে নিল। এমন নিষ্ঠুর কাজ!"

এই হরি পাখিরা যেন সাত গ্রামের ধুলো-কাদা-কাহারদের প্রতীক হয়েছিল শরৎচন্দ্রের জীবনে। এদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন শিশুর মতই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা গ্রামের মানুষের সঙ্গে তেমন হত না। তবু কিছু কিছু প্রশ্ন যে সমাজের শিক্ষিত যুবকরা শরৎচন্দ্রকে করতেন। এই ব্যাপারে প্রফুল্লকাকা বলছিলেন, আমাদের ষোড়শী নাটক দেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন শরৎবাবু। তাও কার্ড দিয়ে নয়, হঠাৎ দেখে এই কথা বলাতে একটা খাসির কিছুটা মাংস ছিড়ে তাতেই দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখে দেন কলকাতার নাট্য সংস্থার কর্তৃপক্ষকে। নাটক দেখে প্রশ্ন করি, দাদা, নাটকের সাগরকে আনলেন কেন, কেমন বেমানান।" সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে আলমারী থেকে একটা মোটা ইংরিজি বই নিয়ে এলেন। খুলে একটা জায়গায় বললেন, দেখ, নাটকে এগুলো আমি-এর প্রচুর অংশ দাগ দেওয়া। মন পড়েছেন তিনি। কোথাও মেলোড্রামা হলে শরৎবাবু নিজের মত করে লিখে দিতেন। প্রফুল্লকাকা আরও বললেন, একদিন ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাসে দুজন যাত্রীদের দুজনের মধ্যে চরিত্রহীন নিয়ে তুমুল বিতর্ক। শরৎবাবুকে চেনেন না শরৎবাবুও নয়। শরৎদা কেমন মজা নাটকের সমালোচনা শুনেছিলেন, তাই বললেন হাসতে হাসতে।"

অমূল্যকাকা বললেন, জান শরৎবাবুর আঁকা অনেক চরিত্রই যে প্রেমের, শরৎদা তো প্রায় বলতেন। পল্লীসমাজের রমেশ ঘোষাল বলো, দীনু গাঙ্গুলী ধর্মদাস চাটুয্যে আচার্য—যাদের কথাই বল না কেন, সবাই এখানে ছিল। ওই যুগে ঘোষালের কাকাও হয়েছিল। রমেশ ঘোষালের ছিলেন মোহিনী ঘোষালের জ্যাঠা রমেশ ঘোষালের ভাইপো পুলিন যে হয়েছে রমেশ, রমা অবশ্য কল্পনায় রমা।" সুধাংশুকাকা বললেন, তখনকার ছেলেছোকরারা শরৎবাবুর সমাজ ইত্যাদি কয়েকটা বই নাটক অভিনয় করব ঠিক করি, কিন্তু যাবা যায় একদল। অভিনয় আর হল না।"

শরৎচন্দ্র ছিলেন বৈঠকী গল্পের আড্ডা দিতে বসলে হুঁস থাকত প্রফুল্লকাকা একটি ঘটনা জানালেন, "ও'রা তিনজন শরৎদার বাড়ি বসে

শততম শরৎ জন্মবর্ষে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম

প্রকাশিত হলো

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মানুষের মামুলী কেচ্ছা ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
নীললোহিতের আরও ৫-০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
নির্বাসনের দিন ৬-০০
অবধূতের
উত্তরকাণ্ডচরিত ৫-০০
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের
পার্টি গার্ল ৬-০০
বীরেন্দ্র দত্তের
শীতের বেলা ৫-০০
জলবিন্দু ২-৭৫

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
কুলাঙ্গার ১২-০০
জ্যোতির্ময় ৭-০০
চিত্তবহ্নিমান ৭-০০
সন্ধারাণ ৮-০০

শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায়ের
মাটি ছাড়া চাষ, পুকুর ছাড়া মাছ
(হাইড্রোপনিক্স) ৪-০০

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ ৫৭/সি কলেজ স্ট্রীট; কলিকাতা—১২

আজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের
জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের
সশ্রদ্ধ প্রণাম

রমেন দাস রচিত

ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্র ১০-০০

যাশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

হে ঈশ্বর,
তোমার যবনিকা ১০-০০

ভালবাসার মুখ ৫·০০ তরঙ্গহীন ৫·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ সরকার

ফেরারী অতীত ৭·০০ গৌরী গঙ্গা ৯·০০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮·০০ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৭·০০

সব ফুল কিনে নাও মন জানে না
চিরঞ্জীব সেন ৭·০০ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ৫·৫০

রাশিয়ানরুবির রহস্য লাষ্ট চ্যাপটার
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪·০০ নীললোহিতের চোখের সামনে ৫·০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঘরের পথ ৬·০০ সুখের আড়াল ৫·৫০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বনকরবী ৬·৫০ এক বোন পারুল ৬·০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮সি টেমার লেন, কলি-৯

ন এই রকম, হঠাৎ একদিন
লে গেছে, তার মনুভো
ছ যামিনী হাত বন্ধ করে
ন স্পেনাংয়েশ এসে করে
পর থনার সাধারণ কাস্ত।
যামিনী হাতির বাড়ির পাশ
বে। সেই রাস্তা বন্ধ।
া তাঁর বাড়ি গেছি গলস
কথা বলতে শরৎদা তখন
রান্দার পায়চারি করছেন,
চ। ভয় ভয় জিজ্ঞাসা
কি ব্যাপার অপনার, হঠাৎ
টা ঘটেছে? শরৎদা গম্ভীর
কন মোহন, যামিনী অমার
দিল। ওরা এমন ষড়যন্ত্র
বিরুদ্ধে।' বলেই কীরব
। কেন কোন ব্যাপারে হঠাৎ
দন। কাউকেই এ ব্যাপারে
তিনি যাবেন না। আমরা
লাম সেই জায়গায়। গিয়ে
মিনী রাস্তায় মাটি ফেলছে,
কিন্তু যামিনী আর
খের ঘরের রাস্তা বন্ধ

করছে?' যামিনী তো অবাক। বলল, দেখুন
কি বার, আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে
বাবুর ঘরের রাস্তা আমি বন্ধ করব।
আমার বাড়ির পাশ দিয়ে উনি যাবেন তো
তাই রাস্তাটা ঠিক করে দিচ্ছি, বাবুর
যাতে যেতে কোন কষ্ট না হয়।' আমরা
দুজনে অবাক। শরৎদাকে ফিরে এসে
বললাম সব। শরৎদা হাসলেন। বললেন,
'ও, তাই বলো।' বলেই শান্ত হয়ে গড়-
গড়ার আমাকে সাজতে বললেন ননীকে।
একটু পরে যামিনীও এসে সাধ্যমতো প্রথম
করে জানাল তার বাসনার কথা। দাদও
আমাদের সঙ্গে নিজে গিয়ে রাস্তা দেখে
এলেন।

যামিনীর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রসঙ্গেই কথা
উঠল। সুরেনকাকা বললেন, দাদাকে
দেশের মানুষ যে কি শ্রদ্ধা করত তা তাঁর
সঙ্গে বেশ কয়েকবার জলপথে গিয়ে বুঝেছি। একবার দেউলটি থেকে হাওড়া
স্টেশনে নেমেছি, ছয় ও সাত নম্বর প্ল্যাট-
ফর্মে সমস্ত আমরা দুজন কথা বলতে-
বলতে যাচ্ছি। হঠাৎ বড় বড় লোকেরা
ছোট বড় রাস্তা বন্ধ গাড়ি থেকে নেমে সাষ্টাঙ্গে দাদাকে

স্টেশনের মধ্যেই প্রণাম করে
করলে। শরৎদা কাউকে
কউকে আশীর্বাদ করে
দাদাকে তাঁর গাড়িতে
ডাকছেন। কে কড়ো হয়ে
পাবে। সে কি মূল্য ধূ
আমি এক দাঁড়িয়ে আছি।
বলে কখন গাড়িতে যেন উঠ
আমাকে বলছেন, 'সেদিন
করে উনি কুমুদশংকর বা কি
বার বাড়িতে যেন গিয়েছিলে

শরৎচন্দ্র যে মতের দিক
সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন কর
দাবীর অপরেক দেখলে তা
ইংরেজদের এদেশের মাটিতে
ও অত্যাচারকে অবৈধ বলে
পারতেন না তিনি। এ
থাকতে এক বন্ধুর সঙ্গে রা
বেরুনোর অভিজ্ঞতার কথা
সুরেনকাকা। 'শরৎদা আমা
জান সরেন, বর্মার সেই ক

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আপনার
পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়

ওঁরা কি তা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছেন?

এটি নিশ্চিত করার জন্যে ওঁদের রোজ ভিমগ্রান খেতে দিন। ভিমগ্রানে দিনভর
কার্যক্ষমতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ দুইই আছে।

ভিমগ্রান®
অপরিহার্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থযুক্ত বড়ি
১১টি ভিটামিন+৮টি খনিজ পদার্থ

SARABHAI CHEMICALS LTD.

মাত্র একটি ভিমগ্রান আপনাকে সারাদিন কার্য্যক্ষম রাখবে

বন্ধুটিকে আজও আমি ভুলতে পারিনি। সেই যুবক স্বাস্থ্যবান বন্ধুটির সঙ্গে একদিন বকেলে বেড়াতে বেরিয়েছি। বন্ধুটি ছিল গ্রেফতারি পার্টির লোক। সমুদ্রের ধার উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে আমরা দুজনে যাচ্ছি ওপাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া সাহেব আসছে। সামনে আসতেই বন্ধুটি করল কি এমন আচমকা ধাক্কা মারে যে সাহেব উঁচু বাঁধের গা বেয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। আমরা দুজনেই তখন দাঁড়িয়ে দেখছি। জ্ঞাতে বাটিল, উঠে এসেই একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে যা বলল, তার অর্থ হল, বুঝেছি তোমরা বাঙ্গালী ছোকরা। কিন্তু জান না আমি কে। আমি তোমাদের ১৫ দিন লক আপে রাখতে পারি এবং কেউ জানতে পারবি না কোথায় আছো তোমরা। বলেই বুটের শব্দ করতে করতে চলে গেল। পরে জেনেছি সাহেবটা ছিল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।' শরদা ঘটনাটি বলে জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'এরকম বাঙ্গালী স্পিরিট না থাকলে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না। লোকটা আমাদের দুজনের এমন সাহস দেখেই বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েছিল।'

পারুললতা দেবীর কাছে শুনলাম যেমন ওঁর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের কথা, তেমনি রবীন্দ্রনাথ প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাতের কিছু স্মৃতিও জানা গেল। পারুললতা দেবী জানালেন, 'বড়মামা ওঁকে এত স্নেহ করতেন যে ছোটমামা (প্রকাশ) একটু বাঁদ বকতেন চা দিতে দেরী হয়েছে বলে বা অন্য কোন কারণে, তবে বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামাকেই বকে সরিয়ে দিতেন। এই স্নেহের জোরেই আমি কতবার যে বড়মামার সঙ্গে বড় বড় লোকের কাছে যেতে পেরেছি। একবার 'দেবদাস' ছবি দেখতে যাই বড়মামার সঙ্গে। সে শোতে প্রমথেশ বড়ুয়া এসেছিলেন। সে সময়ে আমার ছেলে রবীনও ছিল সঙ্গে। ছবি দেখা শেষ হলে বড়মামা প্রমথেশ বড়ুয়াকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি যা বলতে চেয়েছি, ছবিতে ঠিক তাই করেছ তুমি।' বলার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত ও অভিভূত হওয়ায় বড়মামার চোখে সে কি জল!' এরপর পারুল দেবী বললেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। 'রংমহলে ছটার শোতে কি একটা থিয়েটার দেখতে গেছি, মনে নেই। রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন। বই শেষ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বড়মামার বইটার খুব প্রশংসা করলেন। বড়মামাকে তখন দেখে বুঝেছিলাম, উনি কবিকে কতো ভালবাসতেন কতো শ্রদ্ধা করতেন।'

'অরক্ষণীয়া' থিয়েটার, দেখার গল্প করলেন উলুবেড়িয়ার সতীশকাকা। সেবার অরক্ষণীয়া অভিনয় হয় অমর মল্লিকের চেষ্টায়, যোগেশ চৌধুরীর পরিচালনায়। বললেন, 'শরদা আর আমি একসঙ্গে অরক্ষণীয়া দেখে বাড়ি ফিরি। ট্রেনে শরদার নিজের বই-এর অভিনয়-ভাল কি মন্দ হয়েছে তা জানার সেকি উৎসাহ! আমি ঈশ্বর-বেড়িয়ায় নামি, উনি দেউলটি চলে যান। যতক্ষণ সঙ্গে ছিলাম, সেই নিয়েই আলোচনা।' সতীশকাকা আরও বললেন, 'শরদা যে শুধু নাটক-সিনেমার বই সম্পর্কে আমার মন্তব্য শুনতে চাইতেন তাই নয়, তিনি আমাকে বিশ্বাসও করতেন সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারে অনেক বেশী। আমি যা বলতাম, উনি সঙ্কল্প মতকে সরিয়ে আমারটাই বহাল রাখতেন। একবার মনে পড়ে, কি একটা ব্যাপারে বেশ কিছু মিষ্টির দরকার পড়ে তাঁর বাড়িতে। মিষ্টি কোথা থেকে আসবে? গ্রামের অনেক লোক নানা সূত্র জানাল। শরদা বললেন, না না, সতীশ বলে উলুবেড়ের ধাড়ার দোকানের মিষ্টি খুব ভাল, ওইটাই আনতে হবে, যাই খরচ হোক।' তাই আনা হল। একদিন আমি বললাম, 'দাদা, আসল ধাড়ার দোকান তো বন্ধ হয়ে গেছে, তবে তারই কারিগর নতুন ধাড়ার দোকানে কাজ করছে। এখানেও সেই মিষ্টি।' সঙ্গে সঙ্গে শরদার জবাব, 'তাহলে এবার ওখান থেকেই আনতে হবে যে! তুমি যখন বলেছ সতীশ, আর অন্য কথা নয়।' এরকম বিশ্বাস করতেন আমার কথা। দাদার একটা গুণ ছিল, যাকে বিশ্বাস করতেন তাকে শিশুর মতই বিশ্বাস করতেন, সে বিশ্বাস কেউ নড়াতে পারত না।

খাওয়ার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র ছিলেন স্বল্পাহারী, কিন্তু খেয়ালি। একটু বিলাসীও। তাঁর উপন্যাসের মেয়েরা যেভাবে পরিপাটি করে নায়কদের খাইয়েছে, তা তো তাই প্রমাণ করে। এ ব্যাপারে সুরেনকাকা বললেন, 'আমাদের দু ভায়ের তো মুদিখানা ছিল। শরদা প্রায়ই বলতেন, সুরেন তোমার দোকানে খাবার মত ভাল জিনিস এলেই আমার দিয়ে যাবে যা দামই হোক। কখনো কখনো নিজেই এসে বলে যেতেন কলকাতা থেকে সবচেয়ে ভাল জিনিসটা এনে দিতে। আর দোকানে পেমেন্টের ব্যাপারে এমন সময়জ্ঞান ও ভদ্রতাবোধ খুব কমই দেখেছি, কোনদিন একটি পয়সাও চাইতে হয়নি, দিতে দেরী করেন নি। আমাদের দোকানের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। বলতেন, সুরেন-ধীরেন শিক্ষিত ছেলে, দোকান করেছে। ওদের ওখান থেকে নিলে ওরাও তো কিছু পায়। আর ভালো জিনিস খেতে আমার কোন রকম ভাবতেও হয় না। এই বিশ্বাস তাঁর মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত ছিল।'

মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্র ছিলেন এই রকম। এক কথায় এক কালের মানুষ। রুচি ছিল পরিচ্ছন্ন, মন ছিল সদা দীপ্ত, সদা হাস্যময়। বাবার কাছে শুনেছি একবার আমাদের বাড়ি এসেছেন দিকেন্দ্র। পরণে সেই গেরুয়া খদ্দর, মেজাজ দিয়ে তামাক খেলেন। গ্রামের নানা লোকের খবর, সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে খুব ভদ্রভাবেই দুঃখের সঙ্গে কিছু কথা বললেন। তারপর যখন উঠছেন, তখন আমার ঠাকুরমা বললেন, 'শরৎবাবু, বসুন আপনার জন্যে চা হচ্ছে, জলখাবার খান।' বাবাও বিব্রত, বললেন 'তাই তো, শরৎবাবু বসুন খেয়ে যান।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'ওসবের কিছু দরকার নেই পুলিন এই তো আমার আসল ডিনার-টাই খেলাম।' বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'এইজন্যেই আপনার এরকম চেহারা হয়েছে। কেবল এই খেয়েই আছেন তো।' শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কি জান পুলিন স্বাস্থ্য শুধু শরীরের নয়, মনেরও আছে। তোমাকে খেয়ে যে সেজাজ হল আর কিছু কি এর কাছে লাগে, ওসব পেটুকদের জন্যে।'

এই হলেন শরৎচন্দ্র। খেয়ালী ভবঘুরে মানুষটি একেবারে নিজের মন, মেজাজের নির্দেশেই চলতেন। তিনি যে মেজাজী ছিলেন, আর একটা ঘটনা বাবা গল্প করলেন। তখন রেডিও এত মর্তাল হয়নি। গ্রামের লোকের কেনার ক্ষমতা থাক বা না থাক, রুচিও এতটা এদিকে এগোয়নি। শরৎচন্দ্র পাণিত্রাস-সামতাবেড়ে প্রথম কালে মাইক্রাফোন লাগিয়ে রেডিও শোনার যন্ত্র নিয়ে এলেন। গ্রামের অনেক লোক তা দেখতে যেত, শুনতেও। পরে ব্যাটারি দেওয়া রেডিও এনে শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ির সামনে একটি গাছের ডালে বাঁশের বেঁধে রাখেন। নিজে শুনতেন, গ্রামের লোকেরাও শোনাতেন। অদ্ভুত তাঁর মানসিকতা গ্রামের মানুষদের জন্য কি রহস্যময় প্রীতি ছিল তাঁর হৃদয়ে।

পাণিত্রাস-সামতাবেড় থেকে শুধু নয়, সারা পৃথিবী থেকেই শরৎচন্দ্র আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু আমি সেই সময়ের তাঁর পরিচিত পুরনো মানুষগুলির মধ্যে ঘুরে, কথা বলে দেখলাম, তিনি সর্বত্র আছেন; সমস্ত গ্রামবাসীর হৃদয়ের গভীরে তিনি আছেন। শরৎচন্দ্রের কথা ভাবতে ভাবতে বাঁধ ধরে হাঁটছি। একটু দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে এক কাঁটা-কুড়নী মেয়ের চোখে পড়ল। সেই সঙ্গে ডান-দিকে আমার স্কুলের শিক্ষক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িটাও নজরে এল। উনি বয়স বাড়ার ফলে পুরনো স্মৃতির বিষয়ে কিছুই বলতে পারলেন না শরৎচন্দ্র সম্পর্কে। তবু তাঁর সেই শরৎসান্নিধ্যের এক টুকরো অভিজ্ঞতার কথা—যা আমাদের স্কুলের ক্লাসে বলেছিলেন মনে পড়ল। বলে-ছিলেন, শরৎবাবু একদিন আমার বাড়ির সামনে বাঁশের মাচা করা উঁচু বসার জায়গায় আমার পাশে বসেছিলেন। বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। দু-একটা কথা বলার হঠাৎ দেখি শরৎবাবু নীরব। শরৎবাবুর দিকে তাকালাম। দেখি, উনি সামনে এক কাঁটা-কুড়নী মেয়ের এক এক করে কাঁটা-কুড়নো দেখ-

সেই একই লাল টিন,
সেই একই
বিখ্যাত কীটনাশক
বদলেছে শুধু
আমার নাম-
নতুন নাম হল
ফিনিট
সারা বাড়ীর উড়ন্ত আর বুকেহাঁটা
পোকামাকড়ের কবল থেকে আপনাকে
রেহাই দেয়—নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!
ফিনিট সারা বাড়ীর মাছি, মশা, আরশোলা,
ছারপোকা ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ নাশ করে—
নিরাপদ অথচ কার্যকরীভাবে!
নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট
ছড়িয়ে দিয়ে যাতক ফিনিট!
ফিনিট, ইনসেক্টিসাইডস্ অ্যাক্ট ১৯৬৮-র অন্তর্গত
রেজিস্টার্ড প্রথম কীটনাশকের নতুন নাম!
FINIT
HP
আমার নতুন নাম নতুন যুগের প্রতীক!

CENTRAL LIBRARY

কাশীনাথ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২)

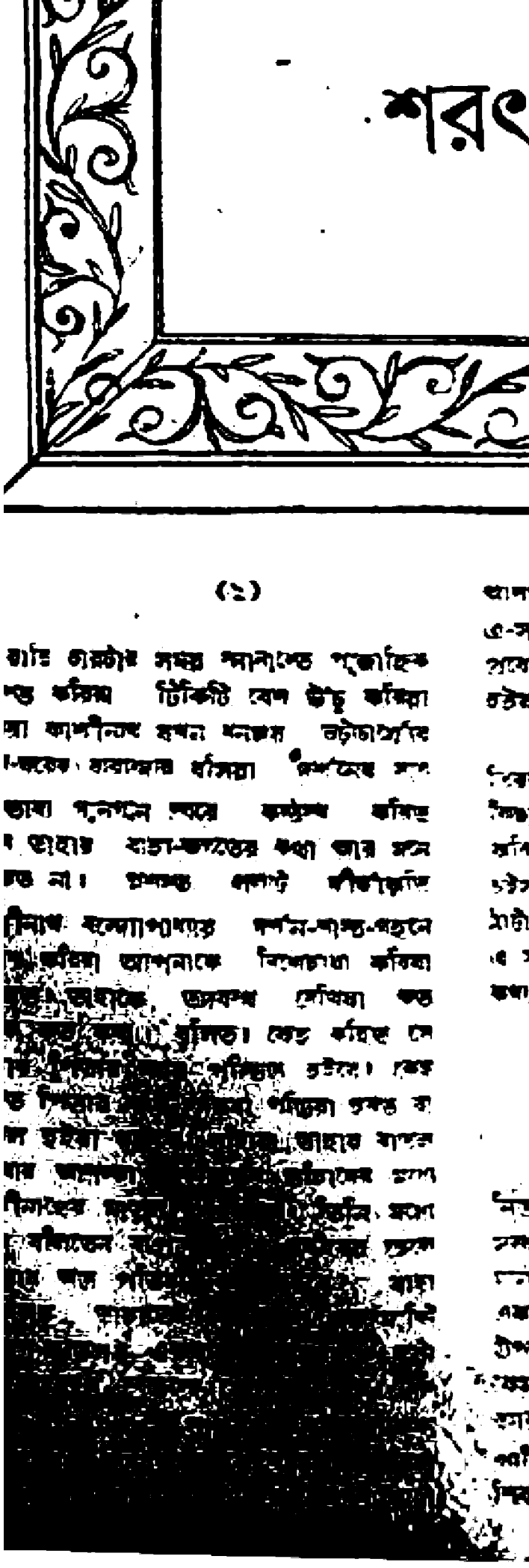

রাত্রি তাহার সন্ধ্যা স্নানান্তে পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া টিকিটি বেশ উঁচু করিয়া বাঁধিয়া কাশীনাথ যখন অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল তখন তাহার গলা শুনিতে পাইয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ তাহার বাঙ্গালোরের কথা আর মনে পড়িল না। তখনও একটি কীর্তনের [illegible] নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] আপনাকে নিঃসঙ্কোচে করিয়া [illegible] তাহাকে, তদবস্থ দেখিয়া [illegible] বুঝিত। কেহ করিবে সে [illegible] করিতেন হইবে। কেহ [illegible] পড়িয়া তখন [illegible] হইয়া [illegible] তাহার মাতার [illegible] তাহাদের [illegible] নিজের [illegible] বলিতেন [illegible] তাহা [illegible]

থাকা আছে তখন তাহাও থাকিবে না। এ-সকল কথা কাশীনাথের এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিতে অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত।

বাহির হইয়া যাইবার অপেক্ষাতে তাহার বিলম্বকে করিতেন, সেজন্যে কাহারও কিছুই ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মাতৃভাষা তাহার করিতেন; যাহারা সাহিত্যের আলোচনা হইবার অধিক সময় তাহাদিগকে ছাত্রদিগকে শ্রেণী-নিবদ্ধ করিত; কিন্তু কাশীনাথ হত এ সকল আলোচনার কথা কখনো মনে এতটুকু স্থান দিতে পারিত না।

উপন্যাস

যাহা হউক সন্ধ্যা এখনো পাঁড়াইয়াছিল; সে নিত্য যাহা করিত নিত্য তাহাই করিত: সন্ধ্যার সময় কখনো মাঠে ঘাটে ঘোরা তাহার হইত; সন্ধ্যাই সময় কখনো ছুটী করিয়া এখানে পলাইয়া আসিয়া নিকটের উপর বসিয়া তাহাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তায় বসিয়া থাকিত; কখনো পাঠের [illegible] শিক্ষালিয়ে নিজের আসিয়া [illegible]

নেত্রে অনুভব করিতে থাকিত; অথচ না এ-সকল কিছুই করিত না খুব; ছাত্রদের চলিয়াযাওয়ার পর অন্যকার নিস্তব্ধ ঘোরে অন্ধকারের আসন পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

যেন কাহাকে তাহার কিছু নাই উদ্দেশ্য নাই কামনা নাই। সংসার হইতে আত্মীয়স্বজন সাহায্য অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল। এখন হইতেছে—এই ভয় সংসার সাধ মানুষকে এইরূপে করিয়া যাইতেছে। সে এখন কি করিবে আজ কি করিবে কাল কি করিবে এখন কি করা প্রয়োজন ও উচিত এ-সব কথা তাহার মনে আসা সম্ভব পাইত না। যেন তাহার একটি করিয়া দিবসের সাধ্য সাধন করিয়া সন্ধ্যা আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তাহার আর কোনো প্রয়োজন হইবে না—তাহা নিজেই করিয়া লইবে। সংসার যেন তাহার নিকটে সমস্তার তেমনটি সহজ নির্দিষ্ট সুসম্পূর্ণ সমাধানের করিয়া সমস্ত কর্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার সম্মুখে করিবে না। পাওয়া কখনও তাহার করা করিয়া করিয়া করিয়া এমন কখনও হয় নাই

CENTRAL LIBRARY

...মাবও চলিবে না: যাহা হোক একটা ...ু কর। কাশীনাথ জবাব দিল না: শুধু ...। মনে ভাবিল কি করিতেছি এবং কি ...াকে করিতে হইবে? এমনি করিয়া ...ীনাথের দিন কাটিতেছিল।

কাপড়ের দাম

অনেক

কমিয়া গিয়াছে

বেশী দাম দিবেন না

২৫% কমে

টেরিকটন শার্ট

২০% কমে

কাতান বেনারসী শাড়ী

• অন্যান্য দামের শাড়ী ও পোষাক প্রচুর অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

• বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে টেলারিং ডিপার্টমেন্ট খোলা হইল।

হরলালকা

• কলেজ ষ্ট্রীট :: শ্যামবাজার

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর

নিখুঁত সরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

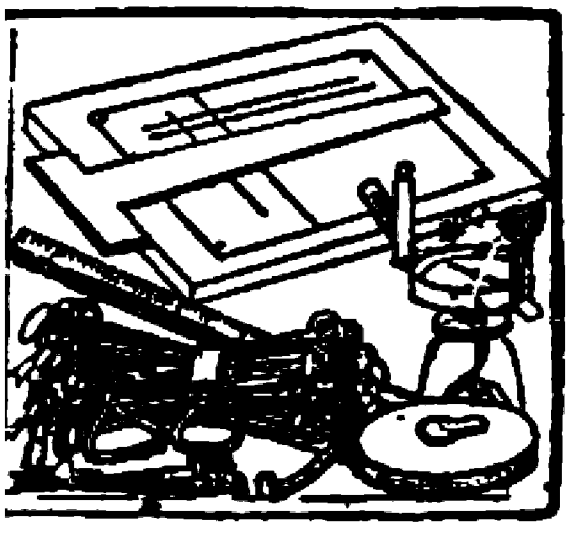

...ার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ ...াতা, লেজার, ক্যাশবই কালি ও

উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮ ৬৭-৯৯৮৫

গ্রাম ঃ ...ষ্টেশন, পোষ্ট বক্স—৩৮ ৫

পরিবেশক ঃ কলিকাতা প্রভাটস

(ষ্টেশনারী বিভাগ)

(২)

ও-গ্রামের জমিদারের নাম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথবাবু মহাকুলীন ও অতিশয় ধনবান। যখন দেখিলেন এক কুলের খাতিরে এত বড়লোক হইয়াও সর্বগুণ-গুণান্বিত পাত্র বহু অনুসন্ধান করিয়াও মিলিল না তখন তিনি কৌলীন্য-প্রথার উপর একেবারে চটিয়া গেলেন। গৃহিণীকে এ-কথা বলিলে তিনি বলিলেন আমার এক বই মেয়ে নেই আমার আর কুল নিয়ে কি হবে?

গ্রামেই গুরুদেবের বাটী; তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন হরি হরি—এও কি কখনও সম্ভব? তোমার অর্থের অভাব নাই কেন দরিদ্র কুলীনসন্তানকে কন্যা দান করিয়া জামাতা ও কন্যা নিজের বাটীতেই রাখিয়া দাও—ইহা দেখিতেও ভাল হইবে শুনিতেও ভাল হইবে। এত বড় বংশ এত বড় কুল ইহার মর্যাদা কি ছোট করিতে আছে! প্রিয়বাবু বাড়ীতে আসিয়া একথা জানাইলেন। গৃহিণী সাহ্লাদে মত দিয়া বলিলেন তাই কর: যে কটা দিন বাঁচি কন্যা কাছেই থাক।

তাহাই হইল। পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিয়া নিজের কাছেই রাখিবেন বলিয়া প্রিয়বাবু একদিবস মধুসূদন মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন শর্মা তখন যজমান-বাটীতে নিত্যপূজা করিতে যাইতেছিলেন। সহসা এতবড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পাঁড়লেন কোথায় বসিতে দিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না।

প্রিয়বাবু বুঝিলেন মধুসূদন কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; হাসিয়া বলিলেন মহাশয়ের নিকট কিছু প্রয়োজন আছে চলুন ভিতরে গিয়ে বসি।

আজ্ঞে হাঁ—চলুন: কিন্তু—তা—

না—তা কিছুই নয়—চলুন বসে সকল কথা বলচি।

তখন দুইজন চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। প্রিয়বাবু বলিলেন আপনার ভাগিনেয়টি কোথায়?

আর কোথায়! ভট্টাচার্য্যমশায়ের টোলে পড়চে।

একবার ডেকে পাঠান।

পাঠাচ্ছি: কোনও প্রয়োজন আছে কি?

বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না সে অকর্মণ্য ছোঁড়াটার সহিত এত বড় সম্ভ্রান্ত লোকের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে। ক্ষণ একটু ভীত হইয়া কহিলেন কিছু করেচে কি?

কি করবে?

হবে?

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন তাকে নিজের জামাতা করব মনে করেচি এবং সেই সূত্রে আপনি আমার বৈবাহিক। বলিয়া প্রিয়বাবু জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। যে-কথা মনে হওয়ায় তাঁহার হাসি পাইয়াছিল মধুসূদন তাহা জানিতে পারিলে বোধহয় আর কথাই কহিতেন না। ভট্টাচার্য্য বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন কাকে—কাশীনাথকে?

হাঁ।

কেন?

অত বড় কুলীনসন্তান আমি আর সন্ধান করে পেলাম না। আপনার এ বিবাহে অমত আছে কি?

অমত! এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা—কিন্তু সে যে পাগল।

পাগল? কই একথা ত কখন শুনি নাই?

তার পিতা পাগল ছিল।

কাশীনাথের পিতাকে প্রিয়বাবু বিলক্ষণ চিনিতেন এবং ইহাও জানিতেন তাঁহাকে অনেকেই পাগল বলিত। প্রিয়বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন ছেলেটির নাম কি?

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাকে ডেকে পাঠান—আমি একবার দেখব।

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। যে ডাকিতে গেল সে তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র। সে গিয়া ডাকিল কাশীদাদা! কাশীদাদা উত্তর দিল না। আবার ডাকিল কাশীদাদা!

এবার কাশীনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, কি?

তোমাকে বাবা ডাকচেন।

কেন?

তা জানিনে। ও-গাঁয়ের জমিদারবাবু এসেচেন তিনিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন:

কাশীনাথ ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিয়া বাটী আসিয়া সেখানে প্রিয়বাবু ও তাহার মাতুল মহাশয় বসিয়াছিলেন সেইখানে আসিয়া উপবেশন করিল।

প্রিয়বাবু তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কাশীনাথ। কোথায় ছিলে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে পড়ছিলাম।

ব্যাকরণ পড়েচ?

কাশীনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে পড়িয়াছে।

সাহিত্য পড়েচ?

সামান্যই পড়েচি।

এখন কি পড়চ?

সাঙ্খ্য-দর্শন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আচ্ছা যাও পড় গে।

কাশীনাথ চলিয়া গেল: তাহাকে কেন ডাকাইয়া আনা হইল কেন যাইতে বলা হইল তাহা সে কিছুই বুঝিল না। টোলে আসিয়া পুনরায় পুঁথি খুলিয়া বসিল। সে চলিয়া গেলে প্রিয়বাবু বলিলেন কি পাগলের না কিসের কথা বলছিলেন?

মধুসূদন কহিলেন না পাগল ঠিক নয় কিন্তু ঐ একরকম তাই কেউ সেটে ওকে পাগল বলে।

কি রকম?

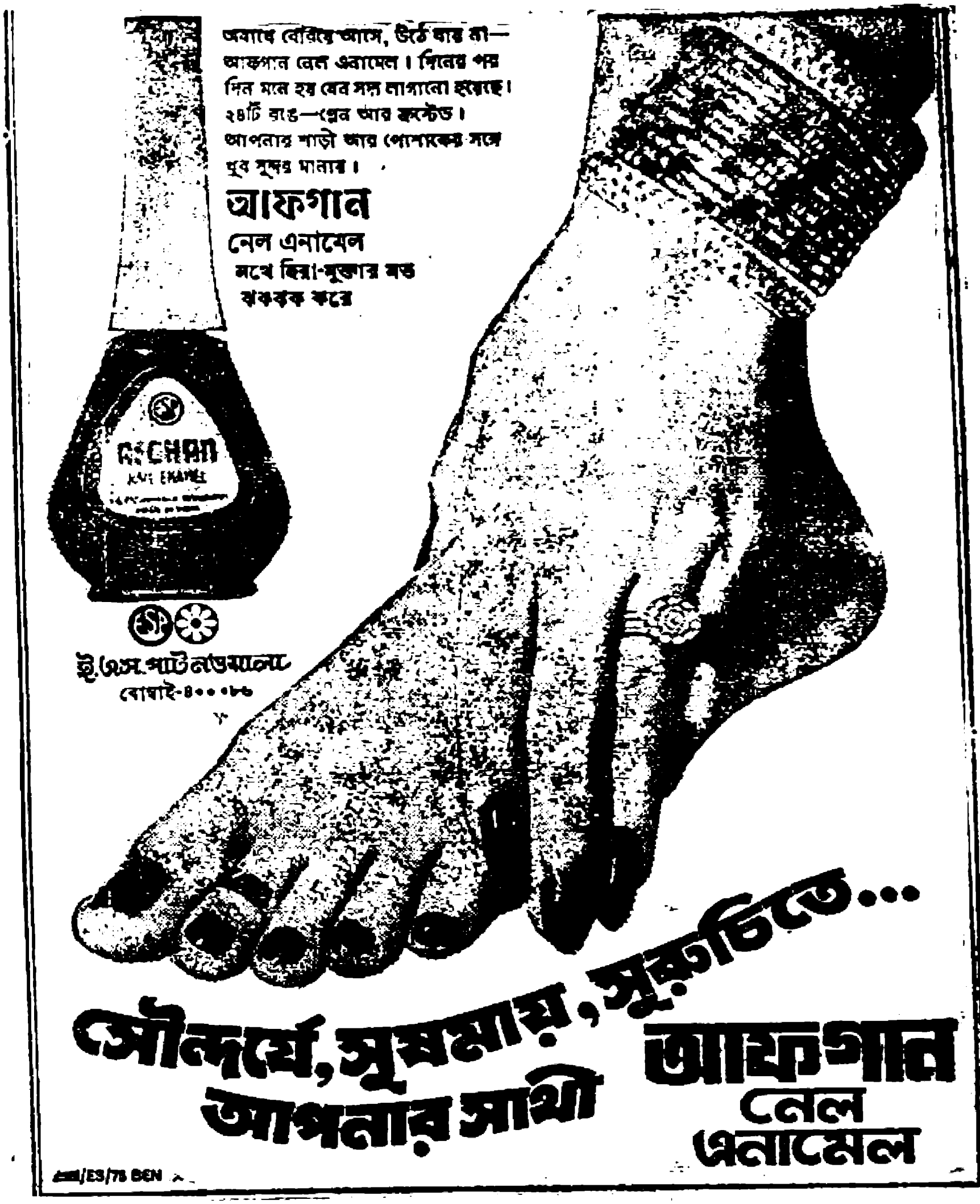

পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশক :

স্যান ট্রেডিং কর্পোরেশন

৩৬, শরৎ বোস রোড, কলিকাতা ৭০০০২০

সর্বদা পুঁথি নিয়ে বসে থাকে না হয় আপন-মনে ঘুরে বেড়ায়—কোনও কথায় বা কোনও কাজে থাকে না—এই রকম।

আর কিছু করে?

হয়ত কখনও বা একটা অন্ধকার ঘরের কোণে একা চুপ করে বসে থাকে।

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন আর কিছু?

এ হাসির অর্থ মধুসূদন ভট্টাচার্য যেন কতক বুঝিতে পারিলেন। অল্প অপ্রতিভ-ভাবে বলিলেন না আর কিছু নয়।

•ঘড়ি•
•জামা কাপড়•
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন্স কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪ ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

শুধু একটি
অমোঘ
গ্লাস

চটপট আর
নিশ্চিত আরাম
দেয়
SARABHAI CHEMICALS PRIVATE LIMITED

তবে বাটীর ভেতর একবার জিজ্ঞাসা করে আসুন। তাঁদের যদি মত হয় ত এই মাসের মধ্যে বিবাহ দিয়ে ফেলি।

ভিতরে আসিয়া মধুসূদন গৃহিণীকে একথা জানাইলে তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বিস্ময়ের মাত্রা কিঞ্চিৎ শমিত হইলে বলিলেন কাশীর সঙ্গে প্রিয়বাবুর মেয়ের বিয়ে? তুমি কি পাগল হলে না কি?

এতে পাগলের কথা আর কি আছে?

নাই কি?

কাশীনাথ কত বড় কুলীনের ছেলে মনে আছে কি?

গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন আমার হরির সঙ্গে হয় না?

দুইজনেই জানিতেন তাহা হয় না। কর্তাও দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন মত কি?

গৃহিণী বিরক্তভাবে বলিলেন মত আর কি—হয় হোক।

কর্তা বাহিরে আসিয়া কণ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণীর এতে আনন্দের সীমা নাই। উনিই কাশীর জননীস্থানীয়া—যখন কাশীনাথ দু' বছরের তখন আমার ভগিনীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি এরকম উনিই মানুষ করেছেন। তারপর যখন স্বর্গীয় বাঁড়ুয্যেমশায়ের পরলোক হয় তখনও ত এইখানেই আছে।

প্রিয়বাবু কহিলেন সমস্তই আমি জানি। তবে আজই সমস্ত স্থির করে ফেলুন।

কি স্থির করতে হবে? আপনার যেদিন সুবিধা হবে সেইদিনই আমি আশীর্বাদ করে আসব।

সে কথা নয়; কৌলীন্যের মর্যাদাটা?

সে-বিষয়ে আমি আর কি স্থির করব? মশায় যা অনুমতি করবেন তাই হবে। তবে আপনার ভাবী জামাতার মাতুলানী—তিনিই মাতৃস্থানীয়া—তাঁর মত একবার শোনা আবশ্যক।

অবশ্য, অবশ্য! তাই ত বলছিলাম।

পরে মাতুলানীর মত লইয়া প্রিয়-বাবুর স্ব-ইচ্ছায় স্থির হইয়া গেল যে, জননীস্থানীয়া ভট্টাচার্যগৃহিণী এক সহস্র টাকা না লইয়া কাশীনাথের কিছুতেই বিবাহ দিবেন না। তাহাই হইল; প্রিয়নাথ-বাবু ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

(৩)

পূর্বে যাহাই হোক যখন দেখিল সে নিশ্চিন্ত স্থায়ীরূপে পরজামাই হইয়া রহিয়াছে, তখন কাশীনাথের মনে আর দ্বিধা রহিল না। এখন সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আর যাইতে পারে না; যখন ইচ্ছা তখন বাহির দাঁড়াইতে পারে না; যাহার তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না; সব জিনিস হইতে তাহাকে যেন পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। সে যেখানে যাইতে চাহে, সেইখানেই হয়ত তাহার শ্বশুরের অমত হয়, না হয় শাশুড়ী ঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠেন, কি, আমার জামাই অমনকে মাটিতে মড়াইবে? জামাই অমনই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কেন এমন হইল কেন তাহাকে এমন করিয়া রাখা হইতেছে, এমন করিয়া করার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, কাশী-নাথ তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, আমি কি আর যে-সে লোক আছি যে, যা-তা করিব। কিন্তু ভিতরটা কাঁদিয়া বলে, স্বস্তি পাই না—স্বস্তি পাই না। সে কতকাল বনে বনেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উদ্যম-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্দিকে বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে সে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা নহে—সেখানে ঝড় ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু এ নির্মল সরোবর তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক এক সময়ে মনে হইত, যেন এক কটাহ উষ্ণ জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে; সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে খালি গা নাই, সে ধনঞ্জয় ভট্টা-চার্য্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বত্থ-বৃক্ষ নাই, চণ্ডীমণ্ডপের কোণ নাই—কিছুই নাই।

সে নব-জন্ম লাভ করিয়া পূর্বজন্মের সমস্ত বন্ধু ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিংবা তাহার দেহ আর মন যেন বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় মনটা যখন নদীর ধারের অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে, কি মঠের ভিতর কৃষকদিগের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে, দেহখানা তখন হয়ত চমৎ-কার বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া গাড়ী চড়িয়া বেড়াইয়া আসে। মনটা যখন কোমরে গামছা বাঁধিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে দেহটা হয়ত তখন জল-চৌকির উপর বসিয়া ভৃত্যহস্তে সুবাসিত-জলে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এইরূপে একটা কাশীনাথ সর্বদা দুইটা কাজ করিয়া বেড়ায় অথচ কোনটাই তাহার সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, সম্পূর্ণও হয় না।

কতদিন এইরূপে কাটিল। এক মাস দুই মাস করিয়া শ্বশুরালয়ে তাহার এক বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম কয়েক মাস তাহার মন্দ অতিবাহিত হয় নাই। আমোদ-উৎসাহে বিশেষ একটা নূতনত্বের মোহে সে নিজের অবস্থার দোষগুণ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার সময় পায় নাই; যখন পাইল, তখন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। অপর কেহ এ-কথা না বুঝিতে পারিলেও কমলা বুঝিল; তাহার চক্ষু স্বামীর অবস্থা ধরিয়া ফেলিল। একদিন সে বলিল, তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন?

কে বললে?

আমার চোখ বললে।

ভুল বলচে।

কমলা ধরিয়া বসিল, কি হয়েচে বলবে না?

কিছুই ত হয়নি।

হয়েচে।

হয়নি।

নিশ্চয় হয়েচে। আমার মন সব জানতে পারে।

কালীনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুমি বড় ঝিক্ক কর, আমি এখান থেকে যাই।

কালীনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া কমলা হাত ধরিল, কাতর হইয়া কহিল, যেও না—আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। কালীনাথ একবার বসিল, কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া চলিয়া গেল। কমলা আর বসিতে বলিল না, কিন্তু চলিয়া গেলে বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কালীনাথ বাহিরে আসিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার উপর কাহারও চক্ষু নাই। তখন ধীরে ধীরে ফটক পার হইয়া রাস্তা বাহিয়া চলিতে লাগিল। অনেকদূরে গিয়া দেখিতে পাইল একজন দরওয়ান তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। কালীনাথ থামিয়া ফিরিয়া কহিল তুই কোথায় যাচ্ছিস?

সে সেলাম করিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে যেতে হবে না—তুই ফিরে যা।

সন্ধ্যার সময় এক বেড়াতে?

আপনি কি জানেন?

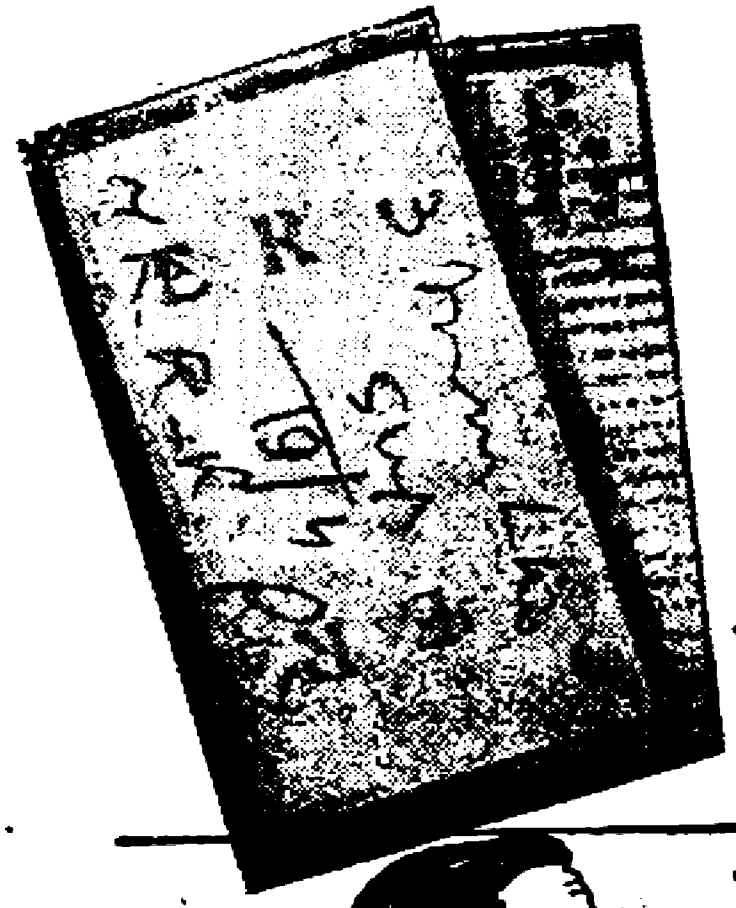

যে আসন আপনার নামে সংরক্ষিত নয়, তা'তে ভ্রমণ করা অপরাধ।

অন্যের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারতেন! ঝঞ্ঝাটের শেষ থাকতনা!

পুরো ভাড়া এবং জরিমানা, যাত্রা পথেই বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া; ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস; ভাগ্য খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে।

অথৈ জলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন? মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে!

পূর্ব রেলওয়ে-তে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ধরা পড়ছেন

টাকা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন না। অনুমোদিত সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

medium

কোন উত্তর না দিয়া কাশীনাথ চলিতে লাগিল। দরওয়ান বেচারী কি করিবে ঠাহরিতে না পারিয়া একটু দাঁড়াইয়া নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া স্থির করিল, যাওয়াই উচিত। কাশীনাথ তাহা টের পাইল না। আপন-মনে চলিতে চলিতে মামার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুরাতন একটা ঘরের বারান্দায় আসিয়া, উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, হরিবাবু বেড়াইতে যাইতেছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়াছে, বারান্দায় অল্প অন্ধকারও হইয়াছে, সুতরাং চিনিতে পারিলেন না। নিকটে আসিয়া বলিলেন, কে ও?

কাশীনাথ বলিল, আমি।

হরিবাবু অতিশয় বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন কে ও, জামাইবাবু নাকি?

কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল। তখন হরিবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, ও মা, দেখে যাও, জমিদারের জামাইবাবু এসেছেন—কাহার ডাকাডাকে কেহ সাড়া দেয় না।

হরির মা বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, তাই ত। দুঃখী মানুষকে মান পাওচ যায়?

কাশীনাথ বরাবর চুপ করিয়াই রহিল। তখন মাতুলানী আপনার কন্যা বিন্দু-বাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন বিন্দু, একবার এদিকে আয় মা—তোর কাশীদাদা এসেছেন একটা বসবার আসন দে, আমি ততক্ষণ আর-একটা জেলে আনি।

বিন্দুবাসিনী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। শ্বশুর-ঘরে যে বলিয়া কাপড় পাওয়াতে এত একটা আসিতে পারে না। আজ

মাস-খানেক হইল এখানে আসিয়াছে। আসিয়া অবধি তাহার কাশীদাদার সহিত দেখা হয় নাই। কাশীদাদাকে সে বড় ভালবাসিত, তাই নাম শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, শুধু একজন বুড়া অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া আছে। এরূপ কাশীদাদা পূর্বে সে দেখে নাই। বড়লোকের জামাতা হইয়াছে এবং বাবু হইয়াছে দেখিয়া তাহার হাসি আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া অন্ধকারেও দাদার মুখখানা এত ম্লান বোধ হইল যে, সে আর হাসিতে পারিল না। কাশীনাথের মুখ ম্লান হইতে পূর্বে কেহ দেখে নাই, বিশেষ বিন্দু বাড়ীর মধ্যে সেই কেবল কাশীনাথকে কিঞ্চিৎ চিনিতে পারিয়াছিল। সে নিকটে আসিয়া সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিল, কাশীদাদা! এখানে একলা কেন? চল, আমার ঘরে গিয়ে বসবে চল। কাশীনাথ বিন্দুর ঘরে আসিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিল।

বিন্দু কহিল কাশীদাদা, আমি কত-দিন এসেচি, তুমি একদিনও দেখতে আসনি কেন?

আসতে পারিনি বোন।

কেন আসতে পারনি?

কাশীনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আসতে দেয় না।

আসতে দেয় না? সে কি?

কাশীনাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল, ঐ-রকম।

বিন্দু দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে দেয় না?

না, দেয় না। আমি কোথাও গেলে শ্বশুরমশাইয়ের অপমান বোধ হয়।

বিন্দু বুঝিল, এ-সকল কথা বলিতে কাশীনাথের ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাই অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, তোমার বৌ দেখালে না?

কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল।

বিন্দু আবার বলিল, কেমন বৌ হয়েচে?

ভাল।

তবে আমি একদিন গিয়ে দেখে আসব।

কাশীনাথ মুখ তুলিয়া বিন্দুর মুখের পানে চাহিল; ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যেও।

এমন সময়ে গম্ গম্ শব্দে একখানি গাড়ী আসিয়া সদরে থামিল। বিন্দু বলিল, ঐ বুঝি তোমার গাড়ী এল।

বোধ হয়। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবে?

কোথায়?

বৌ দেখতে।

বিন্দু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার যবে সুবিধা হবে সেই দিন এসে নিয়ে যেও।

কল আসব?

এসো।

পরক্ষণে কাশীনাথ গাড়ী লইয়া নিজে আসিল। বিন্দুকে যাইবার সময় কোথা হইতে হরিবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিবার সময় গাড়ী দেখিয়া কাশীনাথের আগমন কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। ভিতরে আসিয়া বিন্দু কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, বৌমাকে একবার দেখতে যাচ্চে।

কোন বৌমাকে? জমিদারের মেয়েকে?

গৃহিণী কথা কহিলেন না। তখন হরিবাবু মহাগম্ভীরভাবে কহিলেন, বিন্দু যদি ওখানে যায়, তা হলে এ-জন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না।

মা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে কি গো, ভাইয়ের বৌকে দেখতে যাবে তাতে দোষ কি?

দোষের কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার সময় নাই। বিন্দু যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে এ-বাড়ীতে সে যেন আর না আসে।

হরিদাদা কি প্রকৃতির মানুষ, বিন্দুর তাহা অবিদিত ছিল না। সে নিঃশব্দে চলে গিয়া কাপড়-চোপড় খুলিয়া রাখিল। কাশী-নাথ দাঁড়াইয়া সব দেখিল। তাহার পর ম্লান মুখে গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

সন্ধ্যার সময় কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কৈ ঠাকুরঝি এলেন না?

কাশীনাথ কাতরভাবে বলিল, পাঠালেন না।

কেন।

ত জানি না। বোধ হয়, এখানে পাঠাতে তাঁদের লজ্জা বোধ হয়। কথা-গুলি কমলার বুকের ভিতর গিয়া বিঁধিয়া গেল।

(৪)

জমিদার প্রিয়বাবুর একটি মাত্র সন্তান কমলা। প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংসার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি হয় নাই। সে সমস্ত মৃত হইলে, মনের দুঃখে বৃদ্ধাবস্থায় আর একটি সংসার পাতাইলেন—তাহার ফল একটি মাত্র কন্যা-রত্ন। নিঃসন্তানের সন্তান হইলে পুত্র-কন্যার ভেদ থাকে না। তাই কমলা কর্তার উপর কর্তা গৃহিণীর উপরও গৃহিণী। তাহার কথা কাটে, কিংবা অমান্য করে, বাড়ীর মধ্যে এ-ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কমলা ধনবতী, বিদ্যাবতী, রূপবতী, গুণ-বতী—সর্ববিষয়ে সর্বময়ী কর্ত্রী; তথাপি একজনকে কিছুতেই সে আয়ত্ত করিতে পারিল না; যাহাকে পারিল না সে তাহার স্বামী। কমলা অনেক করিয়া দেখিয়াছে। রাগ করিয়া দুঃখ করিয়া দেখিয়াছে, মান করিয়া অভিমান করিয়া দেখিয়াছে, আদর-যত্ন করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন দখল করিতে পারে নাই। দখল করা দূরে থাকুক, তাহার বোধ হয় কাছে যাইতেও পারে নাই। একটা দরিদ্র লোক যে কত বড় মন লইয়া তাহার স্বামী হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য সন্ধ্যাবেলা কমলা প্রার্থনা করিত, ঠাকুর ওঁর মনটি আমাকে ধরিয়া দাও। সময়ে সময়ে মনে

করিতে বোধ হয় মনই নাই, তাই ধরিতে পারি না। কমলার নিকট তাহার স্বামী একটি জটিল রহস্য বলিয়া মনে হইত। যত দিন যাইতে লাগিল, উহাদের পথ পাওয়া দূরে থাক তত অধিক জটিল বলিয়া মনে হইত। কখনও সে ভাবিত, স্বামীর এত অধিক ভালবাসা বোধ হয় কোনও স্ত্রী কখনও লাভ করে নাই; কখনও মনে হইত, এত দারুণ উপেক্ষাও বোধ হয় কখনো কাহাকেও ভোগ করিতে হয় নাই। তথাপি কমলার দিন কাটিতে লাগিল; মধু কাটে না কাশীনাথের; পড়াশুনাতেও আর মন বসে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও বিরক্তি বোধ হয়, কথা-বার্তা আমোদ-আহ্লাদেও প্রবৃত্তি হয় না। অমন হৃষ্ট-পুষ্ট সবল কৃশ হইতে লাগিল, অমন গৌরবর্ণ কালো হইতে লাগিল। ক্রমশঃ জ্বর হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কমলা কপালে করাঘাত করিল। পূর্বে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ-কথা আর জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা আর রক্ষা করা চলিল না। স্বামী আসিলে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কাশীনাথ বিব্রত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না।

কি হয়েছে, কাঁদচ কেন?

কমলা কথা কহিল না। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া কহিল, তুমি আমাকে একেবারে মেরে ফেল, এমন একটু একটু করে পুড়িও না।

কাশীনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল—কেন, করেচি কি?

তা কি তুমি জান না?

কৈ, কিছুই না।

আর যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমার দাঁড়াবার একটু স্থান রেখো।

এবার কাশীনাথ কমলাকে তুলিতে পারিল, কাছে বসাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে, বেশ করে বুঝিয়ে বল দেখি?

তুমি রোজ রোজ এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমার শরীর কি বড় মন্দ হয়েছে?

কমলা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছিল; সেইভাবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হয়েচে।

আমিও বুঝতে পারি, হয়েচে—কিন্তু কি হয়েচে বল?

কমলা মুখ তুলিয়া বলিল, ওষুধে যাও

কাশীনাথের হাসি আসিল, কহিল ওষুধে সারবে না।

তবে কিসে সারবে?

তা জানিনে।

ওষুধে সারবে না কিসে সারবে সে বলিল না। তবে কি আমরা একান্ত এক, পুড়িয়া মরে

কাশীনাথ কাঁদিয়া মনবে, ঠোলে পড়া দিলা, কেহার-আহারও জানিত না, প্রশ্ন-উত্তরও তাহার আসিত না; কিন্তু এখন স্বাভাবিক স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সে বলিল, এখানে সুখ পাই না—তাই বোধ হয় এমন হয়ে যাচ্ছি।

তবে এখানে থাক কেন?

না থাকলে কোথায় যাব?

এখান ছাড়া কি আর জায়গা নেই? যেখানে সুখ পাও সেখানে গিয়ে থাক।

তা হয় না।

কেন হয় না?

এখানে না থাকলে কি স্বপ্নকুমারীর ভাল বোধ হবে?

আর এমনি করে শুকিয়ে গেলেই কি তার ভাল বোধ হবে?

ভাল বোধ হবে না, কিন্তু উপায় কি? তোমার বাবা গরীব দেখে—

কমলা মুখ চাপিয়া ধরিল—ছিঃ, ও-সব কথা বল না। আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি উপায় করে দিব।

কাশীনাথ চিন্তা করিয়া কহিল, সব কথা তোমাকে খুলে বলা যায় না। আবার কিছু-ক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এই-সব দেখে-শুনে মনে হয়, আমাদের এ বিয়ে না হলেই ভাল হত।

কেন?

তুমিই বল দেখি, আমাকে পেয়ে কি একদিনেরও তরেও সুখী হয়েচ? আমি সোহাগ জানিনে, আদর জানিনে, ধরতে গেলে কিছুই জানিনে। তোমাদের এই বয়সে কত সাধ, কত কামনা, কিন্তু তার একটিও কি আমাকে দিয়ে পূর্ণ হয়? আমি যেন তোমার স্বামী নয়, শুধু, তার ছায়া।

কমলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সব কথা সে ভাল বুঝিতেও পারিল না। একটা কথা তাহার অন্তরের ভিতর হইতে এতক্ষণ ধাক্কা মারিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছটফট করিতেছিল, সেটাকে যেন বলপূর্বক একটা বায়ুহীন কক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, বিষম পীড়াপীড়ি করিয়া এইবার বাহির হইয়া পড়িল। কম্পিতকণ্ঠে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি তুমি দেখতে পার না।

সে-কথা আর একদিন বলব।

না বল—কিন্তু আমাকে বিয়ে করে কি তুমি সুখী হওনি?

কি জানি, হয়ত না।

অন্য কাকে বিয়ে করলে কি সুখী হতে?

তাও ত ঠিক বলতে পারিনে।

শুনিয়া কমলার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। এই সময় একজন দাসী বাহির হইতে বলিল দিদিমণি, মার বড় জ্বর হয়েচে—তোমাকে ডাকচেন।

কমলা চক্ষু মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৫)

গৃহিণীর সে জ্বর আর সারিল না। পনর দিবসমাত্র ভুগিয়া সকলকে কাঁদাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; পড়শীরাও ধিক্কার দিতে বাকি রাখিল না। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনিও বুঝিলেন, তাহাকেও অনেকদিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। এইবার কমলার অনেক কাজ পড়িল; নিজের সুখ-চিন্তা বাতীতও পৃথিবীতে অনেক কিছু করিতে হয়। বৃদ্ধ পিতা ক্রমশঃ অপটু হইয়া আসিতেছেন, কমলা সর্বদাই পিতার নিকট থাকিতে লাগিল। আর কাশীনাথ? সে সৃষ্টিছাড়া লোক; এইবার যেন সময় বুঝিয়া পুস্তকের রাশি লইয়া ঘরের কবাট রুদ্ধ করিয়া বসিল। যখন পুস্তকে মন লাগে না, তখন বাহির হইয়া যায়। কখন হয়ত একাধিকক্রমে দুইদিন ঘরিয়া বাটীতেই আসে না। কোথায় আহার করে, কোথায় নিদ্রা যায়, কেহই জানিতে পারে না। এ-সব দেখিয়া শুনিয়া কমলা একরকম হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে যুবতী হইলেও এখনও বালিকামাত্র। স্বামী-প্রীতি, স্বামী-ভক্তি এখনও তাহার শিক্ষা হয় নাই। শিখিতেছিল—বাধা পড়িয়াছে যাবার স্বামী কর্তৃকই বাধা পড়িয়াছে। তাহার দোষ কি? সে যাহা শিখিয়াছিল ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিল। যে-সব

সোনার দাগ বুকের মাঝে চিহ্ন পড়িয়াছিল, তাহা এখনও উজ্জ্বল হয় নাই, বাহিরের সৌন্দর্য্য এখনও ভিতরে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে নাই—প্রত্যহ অসাবধানে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যখন একেবারে মিলাইয়া গেল—কমলা তখন জানিতেও পারিল না। একখানা ক্ষুদ্র অট্টালিকার দুই একখানা ইট, দুই এক-টিকরা কঠি পাথর বুকের মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে—কখনও কখনও দেখিতে পাইত, কিন্তু সে সকল এত তুচ্ছ জিনিস যে তাহা কোড়া দিয়া সেই সমস্ত গাঁথিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। এখানে এক সময়ে একটা রাজপ্রাসাদ ছিল, প্রমোদ-কানন ছিল—স্বপ্নের ঘোরে আসিয়াছিল, স্বপ্নঘোরে চলিয়া গিয়াছে। সে সকল ফিরিয়া দেখিবারও তাহার কখন সময় নাই। যাহা গিয়াছে—তাহা গিয়াছে।

বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়া, সমস্তদিনে আনন্দ-কথা কহিয়া, কর্ম্মসাগরে তাহার দিন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু একের কাহাতে সুখ হয় কখনও তাহাতে হয় না। কমলা যে সুখ অনুভব করিতে লাগিল, তাহা কি তাহাতে চরম সুখ পাইতে পারিত? তখন ফিরিয়া তাকিয়া তাহার সে সাগরে একদিন প্রিয়বাবুকে দেখিল, চমকিয়া উঠিল, পাল কি-রকম হয়ে যাচ্ছেন, কখন বাড়ীতে থাকেন, কখন যান—কখন কি করেন,

সদ্য প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ

মানুষ ও মন

(কথোন)

রচয়িতা—কালী কর

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (ঝঃ বিঃ)

ভূমিকায় কালী সরকার কারয়াছেন। ইহা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত প্রচুর আধুনিক ও লোকসঙ্গীত এবং ভক্তিমূলক গান। সাবলীল ও মনোহর রচনাভঙ্গী এবং নতুন চিন্তাধারা গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। মূল্য ৭-৫০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এক্সিকিউটর বুক সিণ্ডিকেট

৪৪।১এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০০১

ধারণা করিতে পারে না। বিশ্ব-সংসারে যেন হয় কথাবার্তা নেই।

প্রিয়বাবু নিজের শরীর ও মন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, এ-সকল দেখিতে পাইতেন না। বৃদ্ধা দাসীর কথায় তাঁহার চৈতন্য হইল। কমলা আসিলে সস্নেহে কহিলেন মা, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার যথার্থ উত্তর দেবে?

কমলা পিতার মুখোপরি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা বাবা?

দেখ মা, আমাকে লজ্জা করবার আবশ্যক নেই; বাপের কাছে বিপদের সময় কোনও কথা গোপন করতেও নাই, আমাকে সব কথা খুলে বল—আমি নিজে সমস্ত মিটিয়ে নিতে পারব।

কমলা ম্লান হইয়া রহিল। প্রিয়বাবু আবার কহিলেন, সুখে থাকবে বলে তোমাকে সুপাত্রে দান করেছিলাম। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই—কিন্তু তোমাকে অসুখী দেখে আমার সুখও নেই। বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কমলার চক্ষু দিয়াও জল পড়িতেছিল; বৃদ্ধ সেই অশ্রু সস্নেহে মুছাইয়া বলিলেন, সব কথা আমাকে খুলে বলবে না মা? কিন্তু কি বলিতে হইবে কমলা ভাবিয়া পাইল না। প্রিয়বাবু কতক্ষণ যেন থামিয়া তাহার পর বলিলেন, কাড়া হয়েছে বুঝি?

কমলা ভাবিল, তার থাকলে তো ঝগড়া হবে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

ঝগড়া হয়নি? তবে সে মাঝে তোকে দেখতে পায় না?

কমলার একবার ইচ্ছা হইল—বলে, তাই বটে; কিন্তু তাহা পারিল না। স্বামী তাহাকে দেখিতে পায় না বলিয়া তাহার বুকে বাজিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রিয়বাবু ম্লানমুখে কাঁপিয়া বলিলেন তবে তুই কাঁদি দেখতে পাচ্ছি মা?

কমলা ভাবিল, তাই হবে বুঝি। আমিই হয়ত দেখতে পাচ্ছিনে। কিন্তু সে কি কথা? আমি আমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছিনে? কমলা ঢিপিয়া কাঁদিয়া অন্তরকে পরিষ্কার করিবার প্রয়াস করিল—দেখিল সেখানকার পাঁচ-সাত কণা হইয়া গিয়াছে; শুধু মাঝে মাঝে দুই-একজন তিনিসপত্র সরাইয়া লইতে আসিতেছে যাইতেছে; তাঁহাদেরই অসাবধানে কখনও হয়ত একটু-আধটু সুর বাহির হইয়া পড়িতেছে; কখনও হয়ত দুই-একজন অভিনেতা পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। কমলা কাঁদিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু আবৃত করিল।

প্রিয়বাবু অতিশয় কাতর হইলেন; বলিলেন, কেন কাঁদিস মা?

বাবা আমার যেন কেউ কোথা নয়।

প্রিয়বাবু ধীরে ধীরে কন্যাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ছি মা, ও-কথা কি মুখে আনে? তুই মার মেয়ে সে যে আমার সর্ব্বস্ব ছিল; এখনও খোঁজ পাই সে আমার পায়ের কাছে এসে বসে থাকে—শুধু তোদের ভয়ে দিনের বেলা আসে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, যদি সে এসে তোর একথা শুনতে পায় অভিমানে মনে বড় দুঃখ পাবে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল ঘরটায় অন্ধকারও হইয়াছিল। কমলা সচকিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল বাস্তবিক কেহ ঘরে আসিয়াছে কি না। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। সে তখন বাহিরে আসিল, তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল; শরীর এত দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল যেন অর্দ্ধেক রক্ত কেহ বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহার কাজকর্ম সমাপ্ত করিয়া সে ঘরে কালীনাথ মাটির উপর আসন পাতিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পুঁথি খুলিয়া বসিয়াছিল সেইখানে গিয়া উপবেশন করিল।

কালীনাথ মুখ তুলিয়া দেখিয়া সস্নেহে বলিল, তুমি যে!

আমি এসেচি।

বস বলিয়া কালীনাথ আবার পুঁথিতে মন সংযোগ করিল। কমলা বহুক্ষণ বসিয়া তাহার পুঁথি-পাঠ দেখিল তাহার পর হাত দিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া দিল। কালীনাথ আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, বন্ধ করলে যে?

খুটো কথা রও। লোক পড়—একটু না পড়লে ক্ষতি হবে না।

এইজন্যে বন্ধ করে দিলে?

শুধু তাই নয়; কিন্তু হবে যখন—এজন্যও বটে।

কালীনাথ অল্প হাসিয়া বলিল, কেন বিরক্ত হবে কমলা? তোমাকে কখনও কি আমি বলেচি? কথা কও না, কাছে এস না, বই না পড়লে কেমন করে দিন কাটবে বল দেখি? একটু হাসিয়া বলিল আর—হয়েচে আজ দুদিন কিছুই খাইনি তা তুমি ত একবার খোঁজ নাওনি।

কমলা মুখ তুলিয়া দেখিল স্বামীর মুখ বড় শুষ্ক; কপালে হাত দিয়া দেখিল গা গরম। তখন কাঁদিয়া স্বামীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। কালীনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া আর একবার

প্রকাশিত হল শ্রীভৃগু বিরচিত

শ্রীশ্রীভৃগু সংহিতা (২য় খণ্ড) ৫

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পাশ্চাত্যের ভিন্নে, এদেশ ভিন্ন প্রকৃতির থেকে অনেক, অনেক উচ্চস্তরের, প্রাচ্যের বিরাট জ্যোতিষ-সমৃদ্ধ অনন্যকারী.....

ভৃগু সংহিতা (১ম খণ্ড) ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

মৃগু পুস্তকালয় ॥ ৬৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

অনেকে ৫ ও ৬ তোমার সব কাজ আমাকে দিতে পারে।

আমি পারি কিন্তু তুমি আমাকে পারবে কি?

কিসে পারবে না?

ঠেকিয়ে।

আমাকে না?

একেবারে নিজের কেউ তুমি হয়ে গেলে কখন এসে তুমি সব সময় ঠিক বুঝতে পারবে না।

কথাটা তুলীকের আস্তানায় সে মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এমনকি স্বয়ং তুলীক যখন সে কথা শুনতে পেল তখন তার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা বোঝানোর জন্য তারও আলাদা করে কিছু বলার দরকার নেই। সে কালবিলম্ব না করে তুলীক বেগ ঘোড়ার পিঠে চড়ে সোজা চলে গেল কাফিলার সর্দার তুলাকের তাঁবুতে। তুলাক তখন তার সঙ্গীদের নিয়ে বসে আহার করছিল। তুলীক বেগকে দেখে তুলাক তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তার পাশে বসতে বলল। তুলীক বেগ তুলাকের কানে কানে কী যেন বলল। তুলাক তার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর তুলীক বেগের কাঁধে হাত রেখে তাকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে এল। তুলীক বেগ তুলাককে কী বলেছিল তা কেউ জানতে পারল না। তবে তুলাক তার কথা শুনে যে খুব খুশি হয়েছিল তা তার হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

(৬)

পরদিন ভোরবেলা কাফিলার সকলে ঘুম থেকে উঠে দেখল তুলীক বেগ তার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে সেই পশু কিনে আনা ছোট্ট বাচ্চাটি। সে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করছে। তুলীক বেগের এই পরিবর্তন দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। তুলীক বেগ তার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। সে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে খাবার খাওয়াচ্ছে। তুলীক বেগের এই পরিবর্তন দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। তুলীক বেগ তার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। সে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে খাবার খাওয়াচ্ছে।

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেঁকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষীরাজ বংশ. যেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমণি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' থেকে)

কলকাতা রাজনারায়ণের কলমে

রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ার। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহুমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমণি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্থর। দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল। তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি প্রযুক্তির মাটি। এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

MJ

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

কিছুই থাকবে না পরে সমস্ত ফাঁকি দিয়ে নেবে।

কালীনাথ প্রবলভাবে বলিতে লাগিল, আজ্ঞা করুন।

প্রিয়বাবু বলিলেন আজ্ঞা আর কি করব! কাল দুপুরে সংক্ষেপে একবার দেখা করে যাবেন, এই বলা।

সে আচ্ছা বলিয়া কালীনাথ প্রস্থান করিল। প্রিয়বাবু কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন মা বড় ভুল হয়েছে, নিজে ভাবতে পারি না, তাই কালীনাথকে আমার জমিজমা সমস্ত ভার দিলাম। উইলখানা তার হাত হবার আগেই যা হয় একটা উপায় করতে হবে। দিন দুই তিনের মধ্যে যদি উপায় নিজে বাহুবী-এর পিতা কালীনাথকে ডিক্রিজারীতে আদায় দিতে পারেন তিনি নিজে বাহুবী-এর হাতে এস্টেট তুলে দিয়ে দেবেন। তেমন হলে এস্টেট হাতে পাইয়া দুদিন পরে সে একটা নষ্ট উইলের দুই তালুকদার পক্ষ তাহাকে জাল যেন ধ'র ধ'র ভাবিতে আরম্ভ করিল।

কালীনাথ নিম্নমিতভাবে কাছারীর কাজ করে করুণা নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা চালাইয়া যায় এবং প্রিয়বাবু নিয়মিতভাবে শয্যায় শুইয়া থাকেন। সকলের বেশ সাজানো চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে প্রিয়বাবুর শরীরের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। একদিন তিনি কমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উইল করিব। পরে উপাধানের নিম্ন হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।—আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার জামাতা কালীনাথকে ও অপর অর্ধেক কন্যা কমলা দেবীকে দান করিলাম কেমন ভুল হয়নি মা? কমলা কথা কহিল না। প্রিয়বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন কেন মা, তোমার মনোমত হয়নি কি? এ উইল তিনি যে লক্ষ করিয়া এখানে খসড়া করিয়াছিলেন। তাহার মনে সন্দেহ ছিল, তাহার স্বামী সম্পত্তির অর্ধেক মাত্রাকার অর্জিত হইবে কমলার অন্যান্য পুত্রে হইবে। কিন্তু এমন যে কথা জিজ্ঞাসিতেই এই মুখে বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। প্রিয়বাবু পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভেঙে বলো কি?

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল না।

কি মা?

কমলা একটু ইতস্তত করিয়া, কহিল, এস্টে নিজের কারার নামে লিখে দাও

সে কি কথা মা?

কমলা মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল

প্রিয়বাবু প্রাচীন লোক। সংসারে অনেক দেখিয়াছেন অনেক শুনিয়াছেন, কমলার কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া মনে হইল না। এত এত সব কথা ছেলে ভুলাইয়া কাকিতে পারিলেন আর তিনি কি করিয়া এমনই অন্ধ হইয়া গেলেন যে তাঁহার শরীর ঘাইয়া দেখিতে পাইবেন। উপাধানে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া ছিলেন এখন সেই উপাধানে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন তুমি আমার একমাত্র সন্তান তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না। সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু কাজটা ভাল হবে না। আশীর্বাদ করি সুখী হও। কিন্তু সে ভরসা যে করতে পারি না। দীর্ঘ জীবনে অনেক লোকের বিচার করেছি—এরূপ মন নিয়ে কারার যেন সুখী কখনও সুখী হতে পারে না। বিশ্বেশ্বর যেন বলিয়া আবার বলিলেন সেখানে ভাল হবে বলি, কর্মফল হতে এই মনে করা তোমাদের চিরদিনই সমান ভুল করে সমস্ত বিষয় দিয়ে যাচ্ছিলাম: জানতাম তুমি আর সে ভিন্ন নও। আজ বল যদি মা কিছুমাত্র তার বিরুদ্ধ-আচরণের তোমার দুঃখ হচ্ছে?

কমলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বিষয় সব তার আমার পানে ফিরে চাইবেন না।

কিসে না পোল?

তাহার হাত ধরিলেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন আমি কালীনাথকে চিনি কিন্তু তুমি চেন না। সে ঠিক তার মতন। তুমি তোমার কেহতে না পারে তাহার নিজে কোনও দেখতে পাইবে না না সেখানে পারে না। আর কমলা! এমন কাউকে কি স্বামীকে হাতে রাখা যায়? কেহ করে মানব মন বশ করতে পারা যায় কিন্তু জোর করে একটি ছোট ফুলকেও ফুটিয়ে রাখা যায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় কহিলেন প্রার্থনা করি সফল হও—কিন্তু এ ভাল উপায় নয়। সে যদি তোমাকে না দেয় তাহলে এইটুকু তোমার অবশিষ্ট থাকবে? যেটুকু থাকবে তাতে অন্তত সম্পত্তিতে কি চলে না? আরও এক কথা, স্বামীকে দেহ মন আত্মা পার্থিব অপার্থিব সব দিতে হয়—যাকে সব দিতে হয় তাকে এই অর্ধেক বিষয়টুকু কি দেওয়া যায় না? কমলা, এমন কখনো না। যদি কখনও সে জানতে পারে মনে কষ্ট পাবে।

কমলা কোনও উত্তর দিল না প্রিয়বাবু আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কয়েক প্রায় আধ ঘণ্টা মৌন হইয়া রহিলেন। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। কমলাও চক্ষু মুছিয়া আপনার নিত্যকর্ম প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রিয়বাবু তাহার উকিলকে ডাকিয়া বলিলেন আমি উইল বদলাব।

উকিল জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ বদলাবেন?

আমার জামাতার নাম কেটে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাকে লিখে দেব।

কেন?

সে কথার প্রয়োজন নাই। যা বলবার সেইরূপ লিখে নিন।

(৭)

প্রিয়বাবুর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেল। উইল দেখিয়া কালীনাথ কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত হইল না। সে জানিত যাহা নিজে করা হয়েছে—তাহাই লিখিয়াছে। ইহাতে দুঃখই বা কি, ভয়ের আশ্চর্যই বা কেন? তথাপি সে যখন মহাশয় কালীনাথকে নিভৃতে পাইয়া সান্ত্বনা করাইবার ইচ্ছা মহাশয় যে এরূপ উইল করিবেন, তাহা আমি কল্পনা

প্রকাশিত হল

রামপ্রসাদ ঃ জীবনী ও রচনাসমগ্র

ডক্টর বসন্তকুমার ভট্টাচার্য-সম্পাদিত

সম্পূর্ণ নতুন ধরনে জীবনী রচনা। জীবনী রচনা অপেক্ষা জীবনী আবিষ্কার করাই ভালো। "শুধু সমসাময়িক কাহিনীর উল্লেখের মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে দেশের দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রামপ্রসাদজীবনীকে স্থাপন করা হয়েছে। টীকা-টিপ্পনীসম্বলিত সমগ্র রামপ্রসাদ রচনার এই অভিনব সংস্করণ এখনই সংগ্রহ করুন। গ্রাহকরা ১২ টাকায় পাবেন। সাধারণ মূল্য ২০ টাকা।

রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত

সম্পাদনা ঃ ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

এই খণ্ডে আছে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানবিষয়ক, স্বদেশ, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাসমূহ [বঙ্গভাষার লেখকের ব্রতকথা, বঙ্গভাষা, নানাকথা, চরিতকথা ও আরও ২১টি প্রবন্ধ] দাম প্রতি খণ্ড ২০ টাকা, গ্রাহকরা ১২ টাকায় পাবেন। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে।

শ্রেষ্ঠোক্তা রচনাসমগ্র (দুই খণ্ড) ৪০ টাকা। মাত্র ১০০ সেট বই আছে। এখনই সংগ্রহ করুন।

চন্দ্রমেলা এ-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

আজকের তাজা খবর!
আপনার প্রিয় ডিটারজেন্ট
ন্যাট
এখন পাবেন আকর্ষণীয় প্যাকে
500 gms
Gnat
detergent
powder
নৈট
ডিটারজেন্ট
পাউডর
ন্যাট—জুড়ি নেই কাজের
জবাব নেই দামের
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা ১

CENTRAL LIBRARY

...বি নাই। পূর্বে তিনি একবার উইল ...রিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাকে ও তাঁহার ...নাকে সমান ভাগ দিয়াছিলেন। সে উইল ...কহার কথা শুনিয়া যা কি ইচ্ছা ...লাইয়া দিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে ...রিতেছি না।

কাশীনাথ ঈষৎ হাসা করিয়া কহিল ...বার প্রয়োজনই বা কি! যার বিষয় সে ...করে; তাতে আমারই বা কি, আর ...পনারই বা কি?

হেওয়ানজী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন ...ও—তবু—

কিছুই 'তবু' নাই। বস্তুতঃ আমার ...পত্তিতে অধিকার কি? এবং আমাকে ...র্থক দিয়ে তোলাই আশ্চর্য হবার কথা ...ল বটে। আর আমাকে অর্থক হেওয়াও ...তে সহজ হেওয়াও হই। কিছু ...তে আছে কি?

হেওয়ান এবার বিলক্ষণ অপ্রতিভ ...লেন। শুষ্কমুখে বলিলেন, না না, প্রভেদ ...ছু নাই, আমি শুধু অর্থোদ্ঘাটন করে ...ছিলাম। তাঁর অভিপ্রায় আমি জানব ...তাম, এই জন্যই এ-কথা বলছিলাম।

তিনি তাঁর কর্তব্যই করেছেন অর্থাৎ স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন গতি না স্বামীই স্ত্রী ভিন্ন অন্য গতি অর্থাৎ দাঁড়িয়ে; একেবারে অতটা হাতে পেলে হয়ত কৃপণা ফলত এই আশঙ্কায় বোধ হয় পূর্বের ...রিয়ে গিয়েছেন।

বৃদ্ধ হেওয়ান মহাশয় কা ...রের পণ্ডিতমূর্খ টুলো ভট্টাচা ...রিতেন; তাহার মুখে এরূপ বুদ্ধি ...নিয়া ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে ...না। এইরূপে বৃদ্ধ হেওয়ান উ ...কাশীনাথের হাত বিজ্ঞতার পরিচয় ...য়াছিলেন, শুনা দিকে কমলার উ ...ত অজ্ঞতার পরিচয় পাইতে লা ...বিষয় শুনা করবার সে আপনাকে ...রবে; ইনি কেমনতর মানুষ? ...বিকল প্রশ্ন মুখমধ্যে ফিরিয়া ...ল, বুঝিতে পারি না।

সহস্র পরিচয়ে সহস্র চেষ্টায় ...কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, ...ত-পা-সর্বাঙ্গের মানুষটা কিসে ...নটা তাহার নিজের স্বভাবের

সম্প্রতি প্রকাশিত

ফোটা পদ্মের গভীরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪-০০

রাতের সমুদ্র ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭-০০

সীমাস্বর্গ ॥ প্রলয় সেন ॥ ৮-০০

অন্য নাম নরক ॥ অজাতশত্রু ॥ ৬-৫০

নতুন ভুবন ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫-০০

রামায়ণী প্রেমকথা ॥ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ॥ ৬-৫০

চুপি চুপি আঁধারে

॥ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫-০০

গোয়েন্দা কর্ণেল ৬-০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবখানে যে মাতাল নিরুদ্দেশ হলে সবার আগে বেরায়, কর্ণেল তার পিছনেই থাকেন। এই আশ্চর্য ভদ্রলোকের বিচিত্র কাজ নিয়ে চোখ ধোঁধানো আখ্যান।

কামনার সুখ দুঃখ ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ৬-৫০

সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। ...

প্রকাশ ভবন, ৩/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

নয়। কি ভালবাসে না? যাকে ভালবাসা অনন্ত অতলস্পর্শী যেন দেখা নির্দিষ্ট করিয়া তুমি ইহার সাহিত্যে যাইও না, বলা করিতে পারিব না। হয়ত ভালবাসিবে কিন্তু তোমার মর্যাদা না।

সে সুশীলা আমার কাছে মানে রা করিল, যারা আমাকে একটা হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন।
কি?

যার জিজ্ঞাসা করিস? তোরা আমাকে কেন হাত-পা বেঁধে দিলেন?
কি বলতে আছে দিদি?

নতে নেই? তোরা যে বাজটা ল আছি তার কথা মুখেও এক-পারবে না।

তা নয়। উনি দিব্যি মানুষ; তবে াগদীশ ছিটু আছে। ওঁর বাপেরও তাই ভগীরথবাবুরও—

(হয়। পাগলের কথা মুখে রাপ পাগল হলেই কিছু আর । হয় না। পাগল একটুকুও নয়, গ্রামাকে কষ্ট দেয়!
পাগল, এ-কথা স্বীকার করতে ত বাজিল।

অন্ত তিনদিন হইল কাশীনাথের দেখা হয় নাই। সুইদিন ইস্কুলেই কেন খোঁজ লইল না, কিন্তু তৃতীয় দিনে উদ্বিগ্ন হইয়া বাড়ির চাকরকে পাঠাইল, কাশু সুইদিন ধরিয়া মাস্টারে আসে নাই, তোমরাও কোনও সন্ধান করে নাই, তবে কিরকম এখানে আছে?

সেরূপ ভাবিল, মন্দ নয়! কে কোথায় চলিয়া গেলে তাহার জন্য কিরূপে সন্ধান হইবে? পরে মাস্টারের নিকট হইতে সে জানিয়াছিল, তিন সহস্র টাকা হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন কিসের করে তিনবেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই।

কল্যাণী কিছুক্ষণ কপোল হাতে দিয়া বসিয়া রহিল; পরে তাহার পিতার উকিলবাবুকে ডাকিয়া বলিল, তাহার বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে পারে, এমন একজন লোক এক সপ্তাহের মধ্যে বাহাল করে দিন; যেমনই বেতন হোক আমি দেব।

(৮)

কলিকাতার একটা কক্ষ ও প্রকাণ্ড গলির ভিতর একখানা ছোট একতলা বাটীতে সন্ধ্যাবেলা ভাগে ভিজিয়া, এক হাঁটু কাদা-পাঁক মাখিয়া কাশীনাথ প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুই শিশি ঔষধ, এক টিন বিস্কুট ও চারের বাঁধা বেদানা প্রভৃতি ছিল।

এই বাটীর একটি কক্ষে নীচে একজন রোগী শয়ান ছিল এবং নিম্নে একটি স্ত্রীলোক তাহার সেবা করিতেছিল। কাশীনাথ প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকটি কহিল, কাশীবাবু, এ ভিজে এলে কেন? কোথাও দাঁড়ালে না কেন?

তা কি হয় বেন? কাজ তো হয়নি, দাঁড়ালে হচ্ছে হত।

তা বটে! কিন্তু বৃষ্টিরা বন্ধ হবার কথা অনেকক্ষণ নয়—তুমি দাঁড়াও।

এই কয় বৎসর ধরিয়া কি ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা কাশু! আমরা তাহার বাপের বাড়ী থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তার বোধ একটু, তাহার কথা বলিতে; যেদিন সংসারের ভোগের ভোগাইয়া যাইবার ও ঘটিয়াও যাইতে পারে নাই, তার দাদাশ্বশুরের (তাহার শ্বশুরের) সংবাদ পাইয়া তাহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। তখন, তাহার শ্বশুরের যথাসর্বস্ব পড়া হইয়াছে। সকলে মিলি চিকিৎসা করাইল, কিন্তু

গলাব্যথা—
কাশি থেকে
নিমেষে আরাম...
ভোকাসিল
ভোকাসিল
ভোকাসিল
চায়কোনা,
সল্ফেট
কাশির বড়ি
VOCACIL COUGH DROPS
VOCACIL
VOCACIL
VOCACIL
VOCACIL
U-VOC-4 BEN

কিছুতেই প্রাণরক্ষা হইল না। পাঁড়া বড় বাড়িয়া উঠিলে গোপালবাবু কহিলেন, ছোট-বৌমাকে একবার নিয়ে এস—তাঁকে একবার দেখব। ছোটবৌমা আমাদিগের বিন্দুবাসিনী। মৃত্যুর দুই-এক দিবস পূর্বে গোপালবাবু বিন্দুকে বলিলেন, মা, এই চাবি নাও ঐ বাক্সে যা রইল সব তোমাকে দিলাম। বিন্দু হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। অন্যান্য বধূরা মনে করিল, বৃদ্ধ মরিবার সময় বিন্দুকে সব দিয়ে গেল। আরও এক কথা, গোপাল-বাবু পাঁড়ার সঙ্গেই একদিন চারি সন্তানকেই কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বাপ, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কিছুমাত্র মিল নাই এবং তোমাদের জননীও জীবিত নাই, তখন আমার মৃত্যু হলে তোমরা আর এক সংসার পেতো না। মিথ্যা অনর্থ করে ভিন্ন হবার পথে যতটুকু সম্ভব আছে, তা নিয়ে পৃথক হও। যা কিছু রেখে গেলাম, তার উপর কিছু উপার্জন করলে তোমাদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলবে।

পিতার মৃত্যুর পর সকলে পৃথক হইয়া বিন্দু একদিন সকলের বাড়িয়া দেখিল ভিতরে একখানি রামায়ণ ও একখানি মহা-ভারত ভিন্ন আর কিছুই নাই। আশার নিরাশ হইলেও বিন্দু মনোমধ্যে কথাটা গোপন করিয়া রাখিল। কিন্তু সন্দেহটা মনে উদয় হইল, ইহার শেষটুকু জল—ইহাই আমার বটে।

কিন্তু কতক বিন্দুর সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিল, তাহার পর বিপদের আরম্ভ হইল। বিন্দুর স্বামী যোগেশবাবু পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বিন্দু সেবাশুশ্রূষা করিল, কয়েকখানি ভূমি বন্ধক দিয়া চিকিৎসা করাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গ্রামস্থ কয়েকজন প্রতিবাসী তখন কলি-কাতায় যাইয়া চিকিৎসা করাইতে কহিল। বিন্দুবাসিনী আপনার সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়া স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। এখানেও বহু রকম চিকিৎসা করাইতে অবশিষ্ট ভূমিগুলি ক্রমশঃ বন্ধক পড়িল। কিন্তু রোগের কিছু হইল না। অর্থাভাবে এখন উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইবার উপায় রহিল না। বিন্দু স্বামীর অনুরোধে পত্র লিখিয়া জানাইল। কিন্তু কোন ফল হইল না তিনি উত্তর পর্যন্ত লিখিলেন না। কেবল সে তাহার অপর দুই ভাতৃবধূকে লিখিল, কিন্তু তাহারাও অনুরোধ পত্রা অবহেলা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু মনে মনে এখন হয় উপবাস করিবে, না হয় বিষ খাইয়া মরিতে হইবে।

স্বীয় মুখ ঢাকিয়া যোগেশবাবু সমস্তই বুঝিতে পারিতেন। একদিন তাহাকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিলেন বিন্দু, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল; মরতে হয় সেইখানেই মরব—এখানে কেলবার লোক পাবে না।

এইবার বিন্দু দেখিল, মরণ নিশ্চিত; কেন না, অন্য উপায় নাই, স্বামীকে মাটী বিক্রয়াইয়া লইয়া যাইবারও উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে এ অবস্থায় রাখিয়া কেমন করিয়া মরিবে? আর যদি মরিতেই হয়, তখন লজ্জা করিয়া কি হইবে? অনেক বিতর্কের পর সে লজ্জার মাথা খাইয়া এ-কথা কাশীনাথকে পত্র দ্বারা বিদিত করিল। পরের ঘটনা আপনাদের অবিদিত নাই।

আসিবার সময় কাশীনাথ অনেক টাকা আনিয়াছিল। সেই টাকা দিয়া শহরের উৎকৃষ্ট ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসা করায় সকলেই কহিল যে, বায়ু-পরিবর্তন না করিলে আরোগ্য হইবে না। কাশীনাথ সকলকে লইয়া বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইল। এখানে থাকিয়া মাস দুয়ের মধ্যে সবাই বুঝিতে পারিল, যোগেশবাবু এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। তথাপি ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই। সেই জন্য তাহাদিগকে এখানে রাখিয়া কাশীনাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

প্রাতঃকালে কমলার সহিত দেখা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলে?

রাত্রে এসেচি।

কমলা আপনার কর্ম্ম চলিয়া গেল। কাশীনাথ বাহিরে আসিয়া কাছারী-ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া কর্মচারিগণ দাঁড়াইয়া উঠিল। শুধু একজন সাহেবী পোষাক-পরা যুবক আপনার কাজে চেয়ারে বসিয়া রহিল। এক-জন আগন্তুককে দেখিয়া অপরাপর কর্ম-চারীরা যে সম্মান করিল, নবাবাবু বোধহয় তাহা দেখিতে পাইলেন না। কাশীনাথ নিজে একটা কেদারা টানিয়া লইয়া উপ-বেশন করিল। এই লোকটি নূতন ম্যানে-জার হইয়া আসিয়াছেন: নাম শ্রীবিজয়-বিনোদ দাস। কলিকাতায় বি-এ পাশ করিয়াছিলেন: এবং অতিশয় কর্মদক্ষ লোক, তাই উকিল বিনোদবাবু ইহাকেই ম্যানে-জারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ম্যানেজার অনেকক্ষণের পর কাশীনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, মশাইয়ের কোনও প্রয়োজন আছে কি?

না, প্রয়োজন নাই, কাজকর্ম দেখছি মাত্র।

এবার সেওয়ান মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন ইনি আমাদের জামাইবাবু।

বিজয়বাবু গাত্রোত্থান করিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করিলেন। এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বিজয়বাবুকে কহিল, ভিতরে মা একবার আপনাকে ডাকচেন।

বিজয়বাবু প্রস্থান করিলে কাশীনাথ ডাকিয়া কহিল, ইনি কে?

নূতন ম্যানেজার।

কে রাখলে?

মা রেখেছেন।

কেন?

বোধ হয় কাজকর্ম সুবিধামত হচ্ছিল না বলে।

এখন কোথায় গেলেন?

বাড়ীর ভিতরে।

কাশীনাথ আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া ভিতরে আসিল। আসিবার সময়

। তুমি আমার টাকা নিতে কি
করেছ?

। যা তা করে টাকাগুলো উড়িয়ে
আমার ইচ্ছা নাই।

লীনাথ—পাষণ্ডের কালীনাথ হইলেও
পড়া পাইল। এরূপ ব্যবহার যা
করা সে পূর্বে আর করে নাই।
ম্ব হইয়া কহিল, আমাকে দেওয়া কি
। দেওয়া?

যেন করেই হোক, নষ্ট করার দায়ই
। দেওয়া।

প্রয়োজনে ব্যয় করার সঙ্গে নষ্ট করা

করার প্রয়োজন?

জনকে দিতে হবে।

হতে ত হবে, কিন্তু পাবে কোথায়?

। আজে ত দাও দেখি—আমি বলে
না।

কালীনাথ চুপ করিয়া রহিল, কাথাটা
। কাজে অপরিচিতার হস্ত প্রবেশ
। বাহিরে আসিয়া সে আপনার বাড়ি
। প্রস্তুত বিক্রয় করিয়া পাঁচ শত টাকা
াথে পাঠাইয়া দিল। সীতা এক-
। লিখিয়া দিল, আর কিছু চাহনে
আমার আর কিছুই নেই।

সেইদিন হইতে কালীনাথ আর ভিতরে
। করে না; কখনও কোনও খোঁজ
না। এজন্যই দিন-কতক পর হইবার
একদিন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল

আপনার কাছে একজন ব্রাহ্মণ আসে
গেছে।

পরক্ষণেই কালীনাথ বিস্মিত হই
দেখিল, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হুঁকে
ধরিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কহি
আপনি মহৎ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা
করেন না।

কালীনাথ ভীত হইয়া কহিল,
হয়েছে?

ব্রাহ্মণ কহিল, আপনার কত আছে, বি
আমার ঐ জমিটুকু ভিন্ন অন্য উপায় ন
ওটুকু আর নেবেন না। বলিতে বলি
কাঁদিয়া ফেলিল।

কালীনাথ ব্যস্ত হইয়া ব্রাহ্মণের
ধরিয়া নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
কথা খুলে বলুন।

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আ
পর্যন্ত নাই, শপথ করে বলতে পারি
কর্তাদের সম্মুখ জমিটা আমার নয়?

কে বলেছে আপনার নয়?

তবে বিজয়বাবু, আপনার নতুন মা
কাছে আমার নামে নালিশ করেছেন যে
নালিশ করেছে, আমি ত জানি না।

সঙ্গের লোকটিকে দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লা

হাত ধরিয়া জগদীনাথ পুনর্বার তাহাকে বসাইয়া বলিল, আজ তোমার ছুটি। কিন্তু আপনার যেমন ইচ্ছা সেরকম হবেন।

জগদীনাথ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া বিজয়বাবুকে ডাকিয়া বলিল, এ জমিটা আমাদের নয়, মিথ্যা ব্রাহ্মণকে কেন দিতেছ দাদা?

আদালতের হুকুম।

জগদীনাথ রুষ্ট হইয়া বলিল, মুন্সিফ কি সবের তদন্ত চুঁড়ি করতে লিখেছে?

ওসী আমাদের জানিস।

বা আপনাদের নয়।

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, আমি বৃদ্ধ মানুষ, বেশী আর কতদিন বাঁচব। সেটাই ভোগ এবং করব।

এ-কথা কমলাকে জানাইতে জগদীনাথের লজ্জা করিতেছিল; তথাপি বলিল, ও জমিটা তোমার নয়; ব্রাহ্মণের অভিশাপ অগ্রাহ্য করো না।

অগ্রাহ্য করি কে বললে?

যেই বলুক—ও জমিটা তোমার নয়। মিথ্যা মোকদ্দমা করতে বিজয়বাবুকে নিষেধ করে দাও।

কমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, বিজয়বাবু কাজের লোক, তিনি নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারেন। তাঁর কাজে তোমার হাত দেবার প্রয়োজন নাই।

তখন কমলার কাছে বিদায়ের দিন সাঙ্গ-হইয়া আসিয়াছে। জগদীনাথ কহিল, আমি স্বর্গীয় বেলুকে গ্রহণের সময় হতে বিষয় দেখে আসছি, এবং কাজ নিজেও বহুদিন তত্ত্বাবধান করেছি। আমি জানি, ও জমি কমলা দেবীর নয়।

বিজয়বাবু শ্রোকদ্দমা হারিয়া অপ্রস্তুত মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। অপর পক্ষ দুই হাত তুলিয়া জগদীনাথকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

(১)

পরদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিজয়বাবু মোকদ্দমার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সর্বশেষে নিজের টীকা-টিপ্পনী ও মতামত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেবল জামাইবাবুর জন্য আমরা এ মোকদ্দমা হেরে গেলাম। তখন পরদার অন্তরালে একগুণ কমলা দশগুণ হইয়া ফুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর হইতে কমলা কহিল, আপনি ভিতরে আসুন, অনেক কথা আছে। বিজয়বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ ধরে কথা হইল, তাহার পর বিজয়-বাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আজ বহুদিনের পরে জগদীনাথের আহার করিবার সময় কমলা আসিয়া বসিল। এখন আর তাহার পূর্বের উগ্রমূর্তি নাই, এবং সম্পূর্ণ শান্ত ও স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে কমলা কহিল, ঘরজোড়া বিভীষিকার জন্য সোনার লঙ্কাপুরী ছাই হয়ে গিয়েছিল—জান?

আহার করিতে করিতে জগদীনাথ কহিল, জানি।

কমলা কহিল, জানলে যে কি! সেও ত পরের জন্যেই হারাতে কি না।

জগদীনাথ প্রত্যুত্তর করিল না।

কমলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, তুমি জান যে চিরকাল পরের সঙ্গে মানুষ—একেও যাকে পরের উপাস করতে হয়, তার সত্য কথা বলবার সাধ্যই বা কেন, আর অত অহঙ্কারই বা কেন?

জগদীনাথ নিঃশব্দে একটি পর একটি করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

যার খায়, তার গলায় ছুরি দিতে তোমাদের মনেও দয়া হয়।

কমলা!

যে লোক আজ বৃদ্ধিপরামর্শের তার তোমা ছাড়া আর নাই। তোমার ভিন্ন ভিন্ন যে রকম ব্যবহার হচ্ছে, তাতে চক্ষুলজ্জা না থাকলে—

জগদীনাথ হাসিয়া বলিল বাড়ী থেকে দূর করে দিতে!

ছিঃ ছিঃ তাই।

জগদীনাথ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কমলার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি স্থাপিয়া বলিল, কমলা! আমি পূর্বে কখনও রাগ করি নাই, কখনও তোমার জন্য কথা বলি নাই; কিন্তু তুমি যা বলেছ, তা পরে বোধ হয় আর কেউ বলে নাই। আজ হতে তোমার পরে আর কারো খাড়া নাই। দেখ যদি ওষ্ঠে সুখী হতে পার। জগদীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলা সজোরে দাঁড়াইয়া কহিল, যদি সত্যবাদী হও, যদি মানুষ হও, তা হলে আপনার কথা রাখবে।

তা রাখব। কিন্তু ইহার পর যা কথা বলাল, তা তোমারই চিরকাল হয়ে রইল। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে কি ক্ষমা করবেন?

কমলা আরও কঠিন হইয়া উঠিল—তোমার শাপে আমার কিছুই হবে না।

তাই হোক। ভগবান জানেন, আমি তোমাকে শাপ দিই নাই, সদা আশীর্বাদ করি—ধর্মে মতি হউক, সুখী হও।

বাহিরে আসিয়া জগদীনাথ মাতুলকে, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি সম্বন্ধে একে একে কিছু কহিয়া সান্ত্বনা দিলেন, তুলা-বসানো তাকিয়া লইয়া নিজের জন্য কিছু ছিল বিলাইয়া দিল। তাহার পর গ্রামে জগদীশ সম্বন্ধে আলাপ করিয়া তাহাকে কমলা! কমলা জাগিয়া ছিল কিন্তু উত্তর দিল না। দ্বার খোলা ছিল, জগদীনাথ প্রবেশ করিয়া দেখিল, চোখ বুজিয়া কমলা একমনে প্রার্থনা করছে। জগদীনাথ তাহার হাত ধরিয়া জগদীনাথ আবার ডাকিল, কমলা! কোন উত্তর নাই। তাহার সমস্ত আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, বলিয়া জগদীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাণিজ্যে বাঙালী
একাল ও সেকাল
সুভাষ সমাজদার

এই গ্রন্থ এবং তার লেখক সম্পর্কে প্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "বহু এগারো বছর ধরে লেখক বাঙালীর ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পুরোনো গহন জঙ্গলে প্রবেশ করে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেছেন বাঙালীর কারবারের ইতিবৃত্ত। যে বস্তু যে পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা নিয়ে তিনি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়।.....

"বাঙালী কেমন করে ব্যবসার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে গেল, সেই শোকাবহ কাহিনী লেখক বহু কষ্টসাধ্য গ্রন্থ, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে উদ্ধার করেছেন, বাঙালী কোন কালেই অলস ও ধনিক বিদ্বেষী ছিল না। কিন্তু বিদেশী শাসকদের শোষণে ও স্বেচ্ছাচারিতায় এবং কুটিল ষড়যন্ত্রে বাঙালীর বাণিজ্যকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো।.....

"সর্বশেষ যইটি বাবসা বাণিজ্যের মতো একটি নীরস বিষয় নিয়ে লেখা, তথাপি লেখকের বর্ণনাভঙ্গী ও কালানুক্রম তাকে উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সুভাষ সমাজদার এই বইতে বাঙালী একটা জাতকার দিকের উপর যে আলোকপাত করেছেন, তার জন্য গবেষক ও ঐতিহাসিক হিসাবেও তিনি অভিনন্দনযোগ্য।"

মূল্য : কুড়ি টাকা

প্রকাশক ।। ৭১।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

বন্দু চুপ করিয়া অশনীনাথের মুখ-
চাহিয়া রহিল।

সেই ফাঁকে অশনীনাথ ও প্রাণপণে
না উঠিতে পারিবে না। মুহূর্তে যেন
বলাইয়া আসিতে লাগিল। ঘরে
ঘরে জ্বরের প্রকোপে ছটফট করিতে
অশনীনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল,
কথা ও তক্ত তুমি করনি?

বন্দু কাছে বসিয়া বাবার মুখের কাছে
লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো বাবা?

অশনীনাথ বিন্দুকে কমলা ভ্রম করিয়া
হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া
কম্পিতকণ্ঠে কাতর বলিল, আমি
সহ্য পারি না কমলা, শুধু একবার
এমন কাজ তো মাতে আর হয়নি?

(১০)

ঘন অজ্ঞান, চৈতন্য আচ্ছন্নের মত
ই কাটিয়া গেল। তাহার জন্য
রে মনে মনে আশঙ্কা ছিল, তাই
ঈশ্বরের প্রসাদে সংকটের হাতে
। দিয়া বসিয়াছিল। আজ দুইদিন
ম অপরাহ্ণবেলায় সন্ধ্যার পরে
সঞ্চার করিয়া উঠিয়া বসাইল।

াল করিয়া চোখ চাহিয়া কমলা সেখানে
ক্ষণ তাহার মাথা কোলে করিয়া
ছিল সে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

পরিচিতা কহিল, আমি বিন্দু, তোমার
র ভগিনী।

কমলা বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে তাহার
মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর
হাত নাড়িয়া ঘরের সমস্ত লোককে বাহির
করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি
বোনটি এমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি
ঠাকুরঝি?

বিন্দু চকিত পলকে সতর্কে চঞ্চল হয়ে
পড়িবার ভয়ে এবং ব্যথায় অন্ধ হে তোমার
হুঁশ হয়নি।

কমলা। কমলা একবার আচ্ছন্নের
উঠিয়াই স্থির হইল। তাহার পর মাথা
করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ
পর্যন্ত তাহার কোনপ্রকার সাড়া না পাইয়া
বিন্দু শঙ্কিত-চিত্ত তাহার ডান হাতখানি
নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা
বৌ।

কমলা মুখ তুলিল না, কিন্তু সাড়া দিল
তাহার, ভয় করো না ঠাকুরঝি, আমি আর
অজ্ঞান হব না।

সে যে মস্তকের মধ্যে অসহ্য
সহ্যের অতীত করিয়া তুলিবার জন্য নিরন্তর প্রাণ-
পণ চেষ্টা করিতেছে বিন্দু তাহা বুঝিল
তাই সে ভয় পেয়ে। থামিয়া থামিয়া কহিল

আরও কিছুক্ষণ একভাবে বসিয়া
থাকিয়া কমলা কথা কহিল, বাঁচল, তুমি
আমাকে ফিরে এই বুঝিয়ে বলে আমি
ঠাকুরঝি, আমার সেবা করতে কি করে
তোমার প্রবৃত্তি হলো আর নিজের ও কল্যাণ
এমন করতে পারলাম না।

প্রকাশিত হয়েছে

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের

ভারত স্বাধীন
হলো

India wins Freedom | অনুবাদক : ইলতুফ খান

বহুল আলোচিত এই স্মৃতিকথাটি খোলাখুলিভাবে স্পষ্টভাষায় লেখা। পরাধীন ভারত থেকে দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাগের নিগূঢ় কথা, গান্ধিজী হত্যার পেছনে কারণ ও নির্মম বাস্তব কাহিনী এমন দরদ দিয়ে এতো নির্ভীকভাবে স্পষ্টভাষায় আগে আর কেউ লেখেননি। ২০·০০

কিন্তু কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কেন প্রবৃত্তি হবে না বৌ, তুমি ত আমার পর নও! আমাদের পরিচয় নেই বটে কিন্তু দাদার মত তুমিও আমার আপনার। তাঁর মত তোমার সেবা করাও ত আমার চাই। বৌ তুমি জান না, কিন্তু এসে পর্যন্ত আমার কি করে যে দিন কেটেচে, সে ভগবানই জানেন। একদণ্ড দাদার ঘর, আর একবার তোমার ঘর। তাঁর কাছে কখন যাই কখন তোমার জন্যে প্রাণ ছটফট করে, আবার তোমার কাছে এসে বসলে তাঁর জন্যে আকুল হয়ে উঠি। বিকেলবেলা থেকে তিনি একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুচ্ছেন দেখে তোমার কাছে স্থির হয়ে বসতে পেরেছিলাম। এ-বাড়ী দাদা ছাড়া আর কেউ পাবেন এ ভরসাই ত করা ছিল না বৌ।

কমলা বলিয়া উঠিল ঘোড়ে আছেন?

কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া কহিল ঘোড়ে আছেন বৌ। ডাক্তার বলেছেন আর ভয় নেই; ঘরে চলে গেছে।

কমলার মুখখানি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াই তাহা মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া গেল। একবার তাহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া কিন্তুর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল।

কিন্তু চেঁচামেচি করিয়া কাহাকেও ডাকিল না—তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া নিঃশব্দে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। এই মেয়েটির স্বাভাবিক ধৈর্য্য যে কত বড় সে পরীক্ষা তাহার স্বামীর পীড়ার সময়েই হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু যাহার স্বামীর শিয়রে আসিয়া বসিয়াও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, এখন কমলার জন্যও সে অস্থির হইয়া উঠিল না। কিছুক্ষণে সংজ্ঞা পাইয়া কমলা চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল সে কোথায় আছে: তাহার পর সেই কোলের উপরেই উপুড় হইয়া প্রাণপণে নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে রুদ্ধন এত গাঢ়, এত গভীরতার যে, তাহা কিন্তুর কোলের মধ্যেই লুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহার এক কিন্তু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারও কানে পৌঁছিল না। নির্জ্জন বাহিরে রাত্রির আঁধার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, শুধু এই অকূলপ্লাবিত অন্ধকারের মধ্যে এই দুটি তরুণী রমণী, একজন তাহার বিধবার সমস্ত অনাগত আর একজনের অধীর-শান্ত কোলের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল।

ক্রমশঃ শান্ত হইয়া কমলা স্বামীর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেন যে নিজে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না তাহা কিন্তু কিছুতেই ভাবিয়া পায় নাই। একবার এরূপও ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছিল হয়ত বড়লোকদের এমনই শিক্ষা এবং সংস্কার' সেবা-শুশ্রূষার ভার চাকর-দাসীদের উপর দিয়া বাহির হইতে খবর লওয়াই তাহাদের নিয়ম।

হঠাৎ কমলা জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা ঠাকুরঝি তোমার দাদার জ্ঞান হলে আমাকে কি একবারও খোঁজ করেন নি?

একবার করেছিলেন বলিয়াই কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া শুধু উৎসুক ব্যাকুল-দৃষ্টিটুকু কিন্তুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দাদার জ্ঞান হলে তিনি আমাকে তুমি মনে করে গলা ধরে কেঁদিয়ে উঠেছিলেন—বল কমলা, এ-কাজ তুমি করনি? আমি মরেও সুখ পাব না কমলা, শুধু একবার বল, এ-কাজ তোমার পাপ হয় নি?

কমলা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে?

কিন্তু কহিল আমি ত জানিনে বৌ তিনি কোন্ কথা জানতে চেয়েছিলেন।

আমি জানি ঠাকুরঝি, তিনি কি জানতে চান বলিয়া কমলা একেবারে সোজা উঠিয়া বসিল।

কিন্তু কমলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি সে ঘরে যেয়ো না বৌ।

কেন যাব না?

ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন তুমি গেলে ক্ষতি হতে পারে।

আমার ক্ষতি আমার চেয়ে ডাক্তার বেশি বোঝে না ঠাকুরঝি, আমি তাঁর কাছেই চললুম; ঘুম ভেঙ্গে আবার যদি জানতে চান আমাকে ও তার জবাব দিতে হবে? বলিয়া কমলা কিন্তুর হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কিঞ্চিৎ-কণ্ঠে কহিল আমি মাথা সোজা রেখে চলতে পারব না বোন আমাকে ক্ষমা করে একবার তাঁর কাছে দিয়ে এস ঠাকুরঝি।

মনে মনে কহিল ভগবান হাতের নোয়া যদি এখনো বজায় রেখেছ ঠাকুর তা হলে সিঁথা-সিঁদুর বিলয় করে আর তা কেড়ে নিয়ো না। দুঃখ আমার যেখানে কোথায়— সে ত সমস্তই তোলা রইল। শুধু এই কথা প্রভু, তোমার সমস্ত কঠিন শাস্তি যাতে হাসি-মুখে মাথায় তুলে নিতে পারি আমার সেই পথটুকু ঘুচিয়ে দিয়ো না।

স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া কমলা কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না।

॥ নতুন নাটক ॥
জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হৃষ্ট কটা ৫·০০
অগ্নিদূতের
প্রায়শ্চিত্ত সমাচার ৪·৫০
সমর মুখোপাধ্যায়ের
অন্তঃপুর ৫·৫০
মনোজ মিত্রের
এক ভাঙা দুর্গ (২য় সং) ৫·০০
দিলীপ মজুমদারের
জনৈক সংবাদ ৪·০০
নিশ্চিন্তা : ৩০/১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

নতুন প্রকাশিত
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ
বিজ্ঞান ভারতী ১৬·৫০
বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যামূলক অভিধান
॥ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ॥
বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বহু নূতন শব্দ ও তথ্যাদিতে সুসমৃদ্ধ হইয়া নব-কলেবরে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক, পাঠক-মাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্য পুস্তক।
রোগারোগ্যে যোগব্যায়াম ৫·০০
॥ অনাইজাল সাহা ॥
ইহাতে রোগের নাম, আসন করিবার পদ্ধতি ও কি কি রোগে কোন কোন আসন প্রযোজ্য তাহা বিশদভাবে লিখিত আছে। যাহাদের আসন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না তাহারাও এই বইখানি পড়িয়া নির্ভয়ে ও অনায়াসে আসন অভ্যাস করিতে পারেন।
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। ৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-৯

ন হয়ে পড়েছিল তার মধ্যে আমার
: জবাব পৌঁছে গেছে। বলল: বাঁ
ভর দিয়া কাশীনাথ উঠিয়া বসিল·
হাতে কমলার মাথাটি জোর করিয়া
:র চেষ্টা করিয়া ডাকিল কমল!

:মলা সাড়া দিল না তেমনি অভোবে
: উপর মুখ চাপিয়া পড়িয়া রহিল
ন তাহার দু' চক্ষু বাহিয়া প্রস্রবণ
ট লাগিল।

হিন্দু মাত্র হইয়া উঠিল তুমি উঠে
না দাদা ডাক্তার বলেন তাহার মৃত্যু

কাশীনাথ হাসিমুখে কহিল ডাক্তা
গাই বলুন বোন আমি তোমের কাছে
আর ভয় নেই এ যাত্রা আমাকে তোর
ফিরিয়ে এনেচিস।

তার পরে কমলার মুক্ত চুলগুলি
হাতের মধ্যে লইয়া কপালে নাকে
নাড়া-চাড়া করিয়া কাশীনাথ পুনরা
শুইয়া পড়িল।

শ্রেষ্ঠ কটি বই.....নিজে পড়ুন, অপরকে পড়ান

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর

কোন পথে ?

১ম খণ্ড ১২-০০ ২য় খণ্ড ১৮-০০

আগাথা ক্রিস্টির

অন্ধকার আদিম ১৫-০০

Cards on the table

জেমস হেডলী চেজ-এর

অন্ধকারে একা ১৫-০০

You've got it coming

ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর

শৃগালের শেষ প্রহর

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাস্তব থ্রিলার ॥ ২৫·০০

হ্যারল্ড রবিন্সের

দি কার্পেটব্যাগার্স

দু খণ্ডে সম্পূর্ণ ! প্রতি খণ্ড ২৫-০০

এরিখ মারিয়া রেমার্ক-এর

প্রেম মৃত্যু ভালবাসা

১৪-০০

A time to love and a time to die

প্রকাশক—পত্রপুট । পরিবেশক-কথা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে
স্ট্রীট কলিকাতা—১২

CENTRAL LIBRARY

শরৎদা প্রসঙ্গে

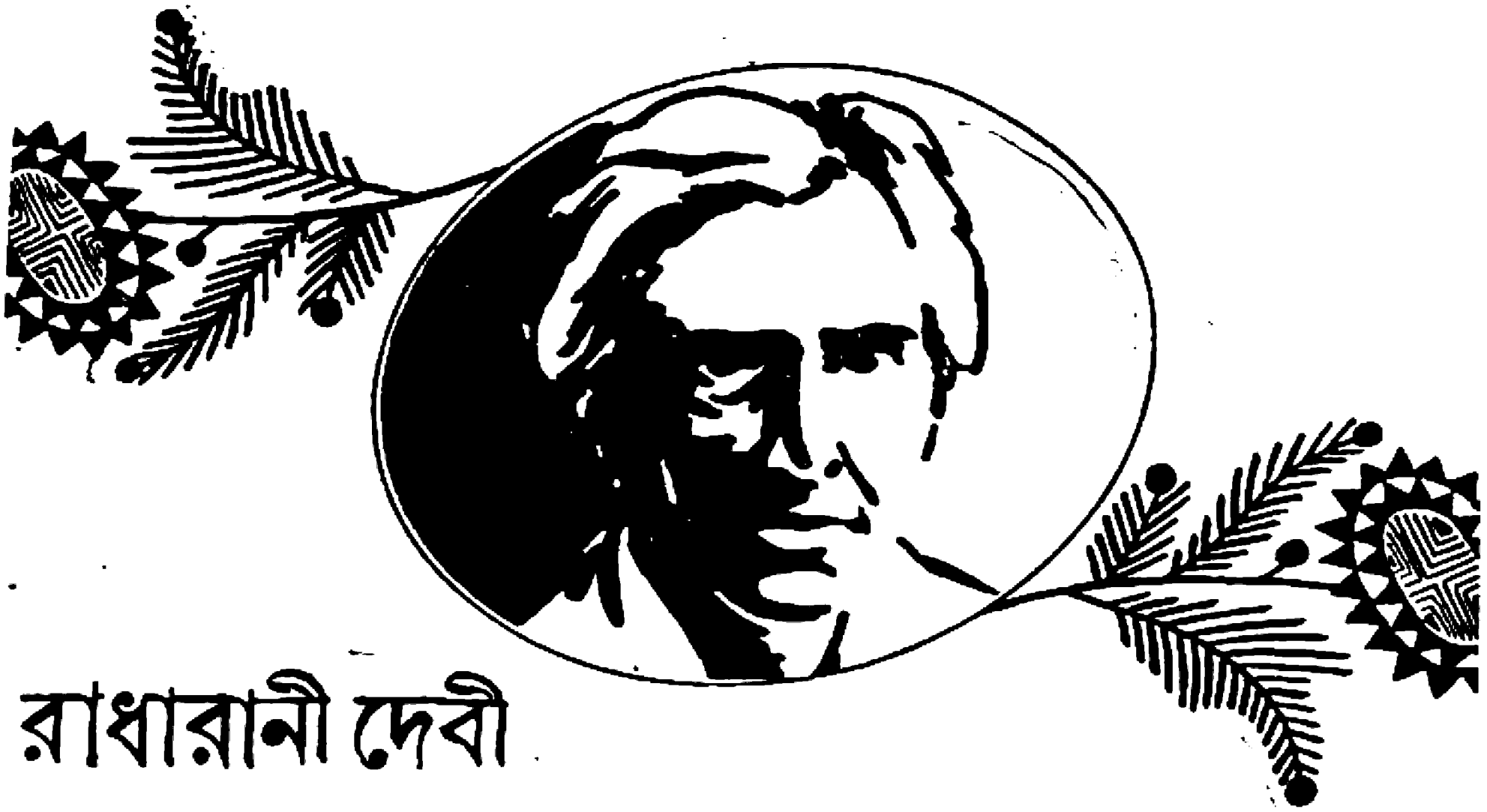

রাধারানী দেবী

শরৎদার কথা বাইরে জনসমাজে বলতে আমার অসুবিধা ঠেকছে। মনে হয় উনি বিরক্ত হবেন। ঠিকমত বলতে পারব না হয়ত। যে মানুষটি তাঁর স্নেহ, মমতা, নিরলস কৌতুক সব কিছু দিয়ে আমাকে সরস মধুর করে রেখেছেন তাঁকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় কি? যাঁর একটি আধটি অশ্রুগড়ে কথার উপলব্ধির জগতে বিস্ময়ের বিলয় ঘটে গেছে সেই অন্তরঙ্গ মানুষটির সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে যাঁর অতিলঘুত্বের ওপর চাঁড়ার তাঁর মহত্ত্বকে অনায় সন্দেহের বস্তু করে তুলি? তাই দ্বিধা আজ।

এতকাল কিছুতেই তাঁর কথা বলতে পারিনি। বারবার আটকে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে কলম।

—তারপর এ বিষয়ে সবার চলাগত ভাগিদে আমারও আজ মনে হচ্ছে শরৎদা সম্বন্ধে যতটুকু জানি উত্তরকালের কাছে জানিয়ে যাওয়া উচিত।

আমার বর্ণনায় তাঁর যথার্থ চরিত্রটি ফুটে উঠবে এমন ধারণা আমার নেই. এতবড় সুরকারকে নিজেকে ভাবি না। তাঁর সীমাহীন স্নেহের কাছে আমি চির-ঋণী। আমি চেষ্টা করবো যে-শরৎদাকে দেখেছি, সেই দেখার আলোয় তাঁর উত্তরসূরীদের যদি তাঁকে দেখাতে পারি। যাদের তিনি দেখেননি কিন্তু যাদের ভালো-বাসার ওপর তাঁর লোভ ছিলো, যাদের এগিয়ে চলার পথের ওপর তাঁর অখণ্ড ছিলো অনেক। নবীনদের তিনি খুবই ভালোবাসতেন। শরৎদার আড্ডায় দেখা যেতো অল্পবয়সী তরুণদের ভীড়ই বেশী। জীবনের শেষদিন অবধি শরৎদার মনটি তারুণ্যের গন্ডী পেরোতে পারে নি।

ওঁর বাড়ীতে অবিরাম লোকের আনাগোনা, আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া চলতো। আজও কেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে শরৎদার সামতাবেড়ের বাড়ীতে কোলকাতা থেকে কত লোকজন বন্ধুবান্ধবদের আসা-যাওয়া। বাড়ীতে কেউ পৌঁছলেই শরৎদা শিশুর মত আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে মাছ ধরবার ধুম পড়ে যেতো। বৌদিরও (হিরন্ময়ী দেবী) এতে খুব উৎসাহ ছিলো। তাঁর সঙ্গে থাকতেন ছোটো-বৌদি প্রকাশবাবুর স্ত্রী। কারো কখনও বিরক্তি বা ক্লান্তি দেখিনি? ছোটো-বৌদি কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাছ কুটতে বসতেন।' বৌদি রান্নায় ব্যস্ত। আর শরৎদা বারবার রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে তদারক করছেন। নির্দেশ দিচ্ছেন সাড়াটা ডালে-বিচ্ছু ত? কাঁটা-চচ্চড়িতে একটু কাল দিও ভাল করে। আর মাছের ডিমের অম্বল? হচ্ছে ত? বাঃ! বাঃ!"

খাশিমনে বাইরের বারান্দায় এসে আবার গড়গড়া টানতে বসলেন। সেইসব নির্ভেজাল আনন্দের দিনগুলো যেন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছে দুর্দিনরা থেকে। সবই মিলে অনন্দ করা যেন আজকের জীবনে একটা হয়ে গেছে। এখন আনন্দ মানে শুধুই হুল্লোড়, কৃত্রিম মজামাতি, নেশার মতো মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য কোনো কিছুতে অসাড় করে রাখা। তারপরই অবসাদ। হাজারো সমস্যার পাকে পাকে জড়িয়ে পড়া। অবিশ্বাসে অনাস্থায় দুনিয়া যেন ঘুণে ঢাকা দিন।

জীবনে অনেক ভোজসভায় যোগ দিয়েছি কত পার্টি পিকনিক হৈ-চৈ করেছি। কিন্তু শরৎদার সামতাবেড়ের বাড়ীতে লম্বা সারিতে বসে কলাপাতায় গরম ভাত, বৌদির হাতের সেইসব বাঙালী রান্নার স্বাদ, আর যা খেতে পারি তারচেয়ে তিনগুণ বেশী খাইয়ে দেওয়ার একান্ত আগ্রহ, এর স্বাদ ত আজও ভুলতে পারিনি। সেইসব স্নেহশীল অকৃত্রিম হৃদয়ের মানুষগুলি পৃথিবী থেকে কোথায় হারিয়ে গেলো।

যতোই ওঁকে দেখেছি, ওঁর সঙ্গে মিশেছি, ওঁর স্নেহভরা হৃদয়টি যেন অতল-স্পর্শ মনে হয়েছে। কত সময় অবাক হয়ে ভাবতাম যে—মানুষটা চিরকাল বঞ্চিত জীবনের ধূ ধূ রিক্ততার মধ্যে কাটিয়ে গেলেন কারো কাছে স্নেহ, মমতা, যত্ন কিছুই পেলেন না, তাঁর অন্তরে এমন স্নেহের সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কেমন করে? শরৎদার মধ্যে আমি দুটি সত্তাকে অনুভব করেছি। একটি সত্তা ছিলো রুক্ষ, কঠোর, বিদ্রোহী, অন্য একটি সত্তা অতি-কোমল, সুকুমার। জীবন ও জগৎ যাকে শূন্যতার মরুভূমি ছাড়া কিছুই উপহার

দিতে পারলো না তাঁরই অন্তর জলটলমল সরোবর হোলো কি করে? হয়তো রুক্ষ জীবন সরোবরের স্বপ্ন দেখতে দেখতে হৃদয়টাও কখন হয়ে ওঠে নির্মল সরোবর।

বড়দিদি, বিন্দুর ছেলে, বিরাজবৌ, শ্রীকান্ত পড়ে অজানতেই লেখকের ওপর একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। কাগজ-কলম নিয়ে বসে ওঁকে প্রণাম জানালাম। দেখা পাবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও গোপন রাখিনি।

তারপর নিজেই একদিন হাজির হলেন আমাদের বাড়ীতে। ওঁর কাছেই শুনলাম চিঠি পাবার আগেই আমার কথা উনি শুনেছিলেন। ৭ নম্বর দীনবন্ধু লেনের সেই মধুর দিনটি স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

জীবনে ঘটনা ও মানুষের ভীড় তো সাত বেঁধেই চলে। এরই মধ্যে আচমকা এক-একটা এমন মানুষের দেখা মেলে যাকে দেখলেই আপনার জন বলে মন চিনে নেয়—আর বিস্ময় জাগে এতদিন এই মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়নি কেন? শরৎদা ছিলেন ঠিক এই জাতেরই মানুষ। দেখা মাত্রই পরমাত্মীয় হয়ে উঠলেন। দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে হলেন দুঃখ-বেদনার অংশীদারও। তার চেয়েও বড় কথা সংশয়ভরা অনিশ্চিত পথের দিশারী। যখন আমার বিবাহের কথা চলছিল, তখনকার দিনে বিদ্বা বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিলো না। বনেদী হিন্দু বাড়ীর লোকেরা এমন দুঃসাহসিক কথা ভাবতেও পারতেন না।

তেরো বছর বয়সে আমার প্রথম বিয়ে-বিবাহ এবং এক বছরের মধ্যেই বৈধব্য। স্বামীর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তখনও মনের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। পরিণত বয়সে যাঁর সঙ্গে বিবাহ হোলো, তিনি সোজাসুজি বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। বলেছিলেন ভেবে-চিন্তে স্থির করতে। আমি প্রসন্নমনে এবং স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হলে তিনি আমায় সমাদরে গ্রহণ করবেন। রাজী না হলেও তিনি কিছুই মনে করবেন না। মোট কথা, মনে দ্বিধা বা সংশয় রেখে কোনো কাজ যেন না করি—এই কথাটাই বারবার বলেছিলেন।

আমি দ্বিধায় দুলছি—এই সময় শরৎদা এসে সামনে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বললেন, 'স্বার্থপর মানুষদের নিন্দা-বিদ্রূপ রাগরোষের বিরুদ্ধে তোমাকে মনে জোর আনতেই হবে রাধু। গোটা জীবনটাই তোমার সামনে পড়ে। নরেনের মত খাঁটি মানুষকে নিয়ে দুজনেই সুখী হতে পারবে।'

কখনও বা বলতেন, 'রাধু এমন অনেক সিচুয়েশন আছে যেখানে ভালোবাসার পাত্রকে দূরে সরিয়ে রাখাতেই ভালোবাসার সার্থকতা, আবার এমন সিচুয়েশনও কারো জীবনে আসে যখন পিছিয়ে এলে জীবনকে বঞ্চিত করাটা শুধু ভীরুতা নয়, স্বার্থপরতা।'

আমি রাগ করে বলেছিলাম, 'আমার ত আপনি বিয়ে করতে বলছেন, কিন্তু 'পথ-নির্দেশ'-এ হেমকে কেন কাশীতে পাঠালেন? তখন আপনার এ-সাহস কোথায় ছিলো?

শরৎদা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'আমি পাঠিয়েছি? কখখনো নয়'—বলেই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'তোরা। তোরা মেয়েরাই পাঠিয়েছিস।'—

কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিলো। বিশেষ একজনের কাছে তাঁর হৃদয় বাঁধা ছিলো এবং তাঁরই যুক্তি-অযুক্তির দিকে তাকিয়ে তাকে কলম চালাতে হোতো। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

যাই হোক আমাদের বিবাহ হোলো। শরৎদার আনন্দের সীমা রইলো না। আমরা যেন তাঁর নিজস্ব আত্মীয়ের মত হয়ে উঠলাম।

বিবাহের পর আমাদের সুখে-দুঃখে, সাংসারিক বিভ্রান্ত সমস্যায় স্নেহশীল অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে বরাবর ছিলেন। এ-বিষয়ে নিজেরই সুপ্ত একটা দায়িত্ববোধ তাঁর মনের মধ্যে কাজ করতো। প্রতিদিনই তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন। নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর বাড়ীতেও আমাদের যাওয়া-আসা ছিলো অবাধ।

বৌদির (হিরন্ময়ী দেবী) সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে দুই-একটা কথা বলি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মানুষটি। সর্বদাই হাসিখুশী। শরৎদা তাঁকে 'বড়-বৌ' বলে ডাকতেন। অনুষ্ঠানিক বিবাহিতা না হলেও শরৎদা তাঁকে বিবাহিতা স্ত্রীরই পূর্ণ সম্মান দিতেন। তাঁর অজস্র বন্ধু-বান্ধব অতিথি-দের ঝামেলা বৌদি আনন্দেই বহন করতেন। 'বড়-বৌ' কখনও অসুস্থ হয়ে পড়লে শরৎদা মাথায় হাত দিয়ে বসতেন। সর্বনাশ! সংসার চলবে কি করে? ও-বাড়ীর অন্দরমহলে আমার স্বামীর প্রবেশাধিকার ছিলো। হিরন্ময়ী দেবী একেবারেই লেখাপড়া জানতেন না। তবু অনেক কষ্ট করে অক্ষর চিনেছিলেন শুধু শরৎদার বই পড়ার জন্যই।

ছোটোবেলা থেকেই শরৎদা ডানপিটে ছেলেদের মত কাঠখোট্টা ছিলেন না। লেখিকা নিরুপমা দেবীর কাছে শুনেছি উনি ভারী সুন্দর বাঁশী বাজাতেন। ওঁর এক বন্ধুকে নিয়ে অনেক রাত অবধি সাপ-খোপ ভরা জংগলে মাঠে নদীর তীরে বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলাফেরা করতেন। ভাঙা মসজিদের ছাদে শুয়ে থাকতেন। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক ছিলো না। যাকে বলে একেবারেই বেউড়ুলে মানুষ ছিলেন উনি।

কবে এবং কেমন করে শরৎদা এমন লিখতে শিখলেন, মানুষের অন্তর গহনে লুকানো গোপন বেদনার ছবিটি চোখের [illegible] হৃদয় ছোঁওয়া মনে

সবেমাত্র প্রকাশিত হলো

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

নারায়ণ চৌধুরী

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের জীবন ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচনা। প্রবীণ প্রাবন্ধিক ও সমালোচকের পরিণত লেখনীপ্রসূত এইগ্রন্থে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি বিশিষ্ট উপন্যাস ও ছোট গল্প ধরে ধরে আলোচনা করায় আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের গুণ প্রকাশ পেয়েছে। এই বইয়ের অন্যতম পাঁচটি মূল্যবান প্রবন্ধ—শরৎচন্দ্রের শিল্পী ব্যক্তিত্ব সাহিত্য-চিন্তা, সমাজ-চেতনা রাজনৈতিক চিন্তা এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

সাহিত্যের রসজিজ্ঞাসু ও সাহিত্যের ছাত্রমাত্রের অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য ১০-০০

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর একখানি বহুলপঠিত গ্রন্থ

শরৎচন্দ্র

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান সমালোচকের শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সর্বতোমুখী পর্যালোচনা।

বর্তমানে বইখানির একাদশ সংস্করণ চলছে।

মূল্য ১০-০০

এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

ওঁকে ভুলবেন, সে খবর কেই বা জানে? আর শরৎদার মত এমন নির্মম অবজ্ঞার চোখে নিজেকে দেখতে আর কাউকে কখনও দেখিনি।

বিদ্রূপের কশাঘাতে নিজেকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করতে পারে কোনও মানুষ,—এ অভিজ্ঞতাও অজ্ঞাত থেকে যেত শরৎদাকে না দেখলে। নিজের প্রতি এই নির্মমতার কারণ কি? এর উত্তর লুকোনো ওঁর ছোটবেলার উপেক্ষিত জীবনে।

বাবার স্নেহের অভাব ছিলো। বাবার কথা শরৎদা শ্রদ্ধা আর মমতার সঙ্গে গল্প করতেন। মা, বাবা স্নেহশীল হলেও বেশীদিন তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় থাকবার সুযোগ ঘটেনি। মানুষ হয়েছেন জ্যাঠি-মেশোদের কাছে। দুরন্তপনা আর পড়াশোনায় অমনোযোগের জন্য কেউ ন্যাড়াকে দেখতে পারতো না। নোংরা তাঁর ছেলে-বেলার সঙ্গী। যে ছেলে নিয়মমাফিক চলে না নিজেদের পরিবারে পাশ করে না, অথচ কাঁটা তারের মত ভুল চাকরী করার স্বপ্ন বুকে নিয়ে সারাই দুরন্ত বয়ে-যাওয়া সময়টা হেলে-খেলে মাস্টারমশাই স্বাভাবিক। কথায়, ব্যবহারে তাঁর প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেতো।

সেইজন্যই হয়ত সমাজের উঁচু মহলের মানুষকে তিনি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন। ছেলেবেলায় বেশিরভাগ সময় কাটাতেন মাছ ধরে, ছেলেদের মধ্যে, দলে বাঁশী অভ্যাস-প্রেমীর সঙ্গে বেড়াতেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। উচ্চাশিক্ষার অবকাশ বা স্পৃহা কোনোটাই হয়ত তেমন ছিলো না। কিন্তু ছিলো বিধি-দত্ত তৃতীয় নেত্র, অনেক উচ্চশিক্ষিতও যার অধিকারী হতে পারেন না। এই তৃতীয় নেত্রের বরেই বোধহয় তিনি প্রবেশ করতে পারতেন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির গভীরে অনুভব করতেন অসুস্থ মানুষেরও দুঃখ বেদনা, সাহিত্যে যারা শুধু দিয়ে পেলে না কিছুই, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসেব কোনোদিন নিলে না। সেই বঞ্চিত, সর্বহারাদের বেদনাই দিয়েছিল তাঁর লেখনীর মুখ খুলে। আমার স্বামী বলতেন—মারাত্মক হতে সুদর্শনচক্র কেন আছে জান? অসুন্দরের আবরণ ভেদ করে সুন্দরকে দেখবার জন্য। বাইরের আচরণ ভেদ করে মানুষকে দেখার শরৎদা বুঝি এই সুদর্শনের অধিকারী ছিলেন। নেলে পণ্ডিতা অশিক্ষিতা নারীর মধ্যে মনুষ্যত্ব ত্যাগ, সেবা, সম্ভ্রমবোধকে তিনি দেখতে পেলেন কেমন করে? উদ্ধত অহংকারীর হৃদয়কন্দরে লুকিয়ে থাকা কোমলতার স্পর্শ পেলেন কেমন করে? অনুচ্চারিত প্রেমের বেদনা ও শুচিতার কারুণ্যকে এমন সুদক্ষ চিত্রকরের মত আলোছায়ার রূপ দিলেন কোন শক্তিতে? অবোধ্য মানুষের অসহায়ের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের অস্বাভাবিকতাকে এমন সূক্ষ্ম কৌতুকে উপভোগ্য করে তুললেন কোন জাদুকরী কৌশলে? শরৎদার চন্দ্রমুখী, অন্নদাদিদি, সহর, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, নতুনদা, শ্রীনাথ, বহুরূপী কেউই মনগড়া কল্পনার জগতের মানুষ নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের চেনামহলেই তাদের বাস, তাই তারা এত জীবন্ত, চিত্ত-গ্রাহী। দেশবিদেশের অলিগলিতে তিনি ঘুরেছেন, লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে দেখেছেন হৃদয়ভরা ভালবাসা দিয়ে। তাই তাদের নিভৃত প্রাণের যথার্থ সত্যটি তাঁর চোখে পড়েছে। শরৎদার সাহিত্য টবে ফোটানো ফুল নয়, জীবনের মাটির সঙ্গে এর সহজ যোগ, তাই জীবনকে এমন করে স্পর্শ করে।

অথচ এই মানুষটিকেই অধিকাংশ মানুষ তখন ভুল বুঝে নীচু ধারণা নিয়ে চলে গেছেন। যদিও তার জন্যে দায়ী অন্য কেউ নয়, তিনি নিজেই। আচ্ছা, উদাহরণ দোবো। কোনো সভায় হয়ত শরৎদা সভাপতিত্ব করতে গেছেন, মঞ্চের ওপরে ফরাসে শ্রেষ্ঠ আসনে বসে হয় হাঁটুর ওপর হাতের আঙুলগুলো দ্রুত নাচাচ্ছেন, কিংবা পা নাচাচ্ছেন, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন আনাড়ির মত ভঙ্গি করে, অথবা হঠাৎ ফুলদানীটা হাতে তুলে নিয়ে বলছেন বাঃ, এটা ত চমৎকার! আচ্ছা—এটার দাম কতো হবে? অনেক। না?' আমরা আশপাশ থেকে চোখের ইসারায় এরকম করতে নিষেধ করলে হেসে বলতেন, 'আমি গেঁয়ো মানুষ, মফঃস্বল মানুষ, এসব তো দেখিনি।' উনি ইচ্ছে করেই এইরকম একটা প্রাকৃতজনোচিত ভাব করতেন। সঙ্গীদের তাঁকে সামলাবার চেষ্টা মনে হত তিনি উপভোগ করতেন। ওঁর পেছনে বসে আমাদের চাপা তর্জন-গর্জন চলত, 'দাদা ও কী হচ্ছে? সবাই কি ভাবছে?' 'ওঃ, এরকম করলে সবাই মন্দ ভাবে বুঝি? তাহলে কেমন করে বসবো? এমনি করে?' বলেই যেন শিষ্টাচারী ভংগিকে বিদ্রূপ করে স্থির নিষ্কম্প হয়ে বসতেন। বাড়ীতে কিন্তু এরকমটা করতেন না। বাইরে তাঁকে সাবধান করা শাসন করা চলবে না—একথা জানতেন বলেই ছোট ছেলেদের মতো যেন আরো বেশিরকমের উল্টোপাল্টা আনাড়িপনা দেখাতেন। তখন বিরক্ত হয়েছি, এখন কিন্তু মনে হয় তিনি এইটেই হয়তো বোঝাতে চাইতেন, এইসব সভাসমিতিতে মানুষ আসে, কিছুক্ষণ ভদ্রভাবে বসে, বড়ো বড়ো কথা বলে, ভবালু চোখে শোনে, দুই তরফই যেন তারা কতবড় বিদগ্ধ, সভ্যভব্য আলোচ্য বিষয়ের কান্ডারী। কিন্তু জীবনের সঙ্গে মনের গভীরে এইসব ভাবভঙ্গির হয়তো কোনোই যোগ নেই। এসব সাজানো কৃত্রিম। সভা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এসবেরও সমাপ্তি ঘটে। আবার স্বার্থ-কেন্দ্রিকতা ক্ষুদ্রতা নিয়েই জীবন কাটে। এসব সভাসমিতি এদের জীবনধারার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

সত্য তাঁর কাছে ছিলো অন্য জিনিস। সেখানে কোনও ভেজাল চলতো না। সভা-সমিতির নিওন লাইটের আলোয় তা দেখা যায় না। তাকে দেখতে হলে নিজের জীবন থেকে অহংকে মুছতে হয়। তাই এসব বাহ্যিক সৌজন্য-ঝকঝকে ভদ্রতাকে শরৎদা বিশেষ দাম দিতেন না। অথচ এদের তিনি আঘাত বা অপমান করতেন না। অপরের চোখে নিজেকেই হাস্যকর করে তুলতেন আনাড়িপনা প্রকাশ করে। যে কৃত্রিমতার ওপর প্রচলিত সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার বনেদীভিতকে বোধহয় বিদ্রূপ করতে চাইতেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটি ঘটনা। চন্দননগরে একবার হরিহর শেঠ মহাশয়ের বাড়ী আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে গেছি। তিনি যেমন ধনী, তেমনই সদাশয় ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে পুরোনো আমলের সাবেকী ধরনে সাজানো বিরাট হলঘরে বিপরীতমুখী দুই দেওয়ালে দুটি বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শরৎদা কি কান্ডটা না করেছিলেন। 'এই রাধু,—দাদা, দেখি ক-তো বড়ো আয়না। আমার সামনে দিক পিছন দিক দুই-ই একসঙ্গে দেখতে

প্রকাশিত হল

সুশীল জানা

সোনালী (নাটক) ৫-০০

(জাতপ্রতিষ্ঠাদের একটি সার্থক নাটক)

সুশীল জানা

অন্যান্য নাটক

বাঁধ ৩-০০ আজকের নাটক ৩-০০

অভিযাত্রিক ৩-৫০ গল্প বলুন ৩-৫০

তোমার হলো সুরু ৩-৫০ ও তথাস্তু ৪-৫০

— আমাদের অন্যান্য মঞ্চসফল নাটক —

ঘূর্ণি		শম্ভু মিত্র	৩-০০
অন্ধকারের বৃত্ত		গঙ্গাপদ বসু	৪-০০
জমিদার		গঙ্গাপদ বসু	৩-৫০
বড়ো পিসিমা		বাদল সরকার	৪-০০
দুই রাত্রি		নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৩-০০
হারানো চিঠি		অমিতা রায়	৩-০০
অমাবস্যার মৃত্যু		মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়	৩-০০

— পূর্ণাঙ্গ নাটকোলিকার জন্য লিখুন —

গ্রন্থপীঠ, ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা - ৬

CENTRAL LIBRARY

ছিলেন। এমনই শরৎচন্দ্রই এ উদাহরণের উজ্জ্বলতম। ভালবাসার বেদীতে তিনি শিল্পকে বলি দিতে দ্বিধা করেননি। নারীর ভাল-মন্দ ভালবাসার কাছে পুরুষের ভালবাসা দাঁড়াতেই পারে না—এই কথাটাই আমরা সবাই জানি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভালবাসার কাছে বঁধু নারীর ভালবাসাও হার মানে, রাধাদের কথা ভাবি সঙ্গে সঙ্গে দুটি কথা বলবার করেছিলেন—কান্না ও বঞ্চনা। প্রথম কথাটির মানে নারী অশ্রু ভালবাসে। দ্বিতীয়ের মানে আরও গাঢ় ভালবাসে।

এই ভালবাসার অনুভব শরৎচন্দ্রের জীবনে এসেছিলো—এক বিধবা তরুণীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ভালবাসার উপলব্ধি চিত্তে জাগার সঙ্গে সঙ্গে এ অনুভবও জেগেছিলো যে এ ভালবাসা নিষিদ্ধ। এ প্রেমের কথা মুখে উচ্চারণ করাও পাপ। তাই এ অনুভূতিকে লুকিয়ে রেখেছেন হৃদয়ের গহন গভীরে, এক সীমাহীন স্তব্ধতার আবরণে। কারণ তখনকার দিনে মানুষের জীবন পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে সমাজসংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎ-বিচিত্রা দাম : ১২-০০

পণ্ডিতমশাই দাম : ৩-০০

মেজদিদি দাম : ৩-০০

নিষ্কৃতি ২-০০

শ্রীকান্ত ১ম ৫-০০ ৪র্থ ৬-০০

কাশীনাথ ৬-০০

বিনয় ঘোষের

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে

প্রতি খণ্ড ৪০৲ গ্রাহকেরা ২৫% কমিশন পাবেন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আরোগ্য নিকেতন

দাম : ১৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

ফেরারি ফৌজ এর ৮৲

ডঃ নবগোপাল দাসের

স্বপ্ন হতে বিদায় ৮·০০

তারাশঙ্করের

উত্তরাধিকার ১২·০০

অবনীন্দ্র রচনাবলী

১ম খণ্ড ১৪৲—২য় খণ্ড ২২-৫০

৩য় খণ্ড ছাপা হচ্ছে।

অদ্যমোনিক ১ খণ্ডে শেষ হবে।

কথা চরিত মানস ৬·০০ ॥ বিমল মিত্র

জাগরী ৭·০০ দিগ্‌ভ্রান্ত ১০·০০ ॥ সতীনাথ ভাদুড়ী

মন্দাক্রান্তা ৬·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মানব কল্যাণে রসায়ণ ৭·৫০ ॥ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা ৭·৫০ ॥ শিবনারায়ণ রায়

বাংলায় বিদ্বৎ সমাজ ৭·৫০ ॥ বিনয় ঘোষ

শশাঙ্কের মুখোপাধ্যায় বনফুলের সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর

বলাকা রমন সন্ধিপূজা উত্তর জাহ্নবী

দাম : ৬-৫০৲ দাম : ৬-৫০৲ দাম : ১০৲

প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বয়স। সে সময় শুধুমাত্র বৈধব্যের পর মেয়েদের এমনই প্রথা ছিল। তার আকর্ষণ হলে সে হয় তো তাঁরা পারতেন না এমন কিছু কাজই নেই। ভালবাসার কথা ছেলে পুরুষের মুখে শোনার কল্পনাকেও তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন। এ-হেন তাঁর কাছে ভালবাসার কথা উচ্চারণ করে অথবা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলে তাঁর চোখেই ছোটো হয়ে যেতে হবে এই ভয়ে প্রতিটি মানুষ নিজেকে দূরে রাখে। এখনকার ছেলেমেয়েরা যেমন প্লাটোনিক ভালবাসার কথা কল্পনা করতে পারে না। অথচ আমরা জানি শরৎচন্দ্রের জীবন এ ভালবাসা ছাড়া, পরিপূর্ণ।

মনের যে ভালবাসা চিরকাল অন্তরিত হয়ে রইল তার অস্তিত্ব তাঁর সাহিত্যের স্তরে স্তরে ভালবাসাকেই তিনি আমরণ ভালবেসে গেছেন। আবেগের উত্তাপ অন্তরে ছড়িয়ে দিয়ে চিরদিন তাকেই ধরে রেখেছেন। চরিত্র সম্বন্ধের জন্য কোনো বাস্তবতা ছিল না—শুধু ভালবাসার জন্য, তাকেই ঘনিষ্ঠ করবার জন্য হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেই সার্থক। এ প্রেমের ঘর নেই, অন্তর আছে।

হঠাৎ একদিন ছকভাঙা ঝড় এসে যাকে স্পর্শ করেন বাস্তবই হয়তো তাকে চিরকাল পেয়ে তুমি এখন থেকে না কোথাও চলে যাও. আমি সবইকার বেহিসেবীর অসম্মান সহ্য করতে পারি না. নির্মম সত্য। তার নিষ্ঠুরতা মাথা পেতে নিয়ে এক নিঃস্ব হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলো। শুধু শুধু হৃদয়ের আর কোনো মূল্য নির্ণয় করা—ঐ কথার লিখন—চিরকুট।

তাই প্রথমেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের জীবন মূল্যে অনেক বড়; অনেক দামী। সারা জীবন এই মূল্যবোধ নিয়েই তাঁর কারবার। কাউকে ভালবেসেছেন; কাউকে বা ঘৃণা করেছেন, মানুষকে ছাপিয়ে কোনো কিছুই তাঁর জীবনে বড় হয়ে উঠতে পারেনি।

একটি বিষয়ে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রেমের উপলব্ধিই তাঁর সাহিত্যের প্রাণরস। এ থেকে তিনি কোনোদিন মুক্ত হতে পারেননি; মুক্ত হতে চানওনি। জীবনের শেষ দিকে কবিতায় তাই বৈচিত্র্যময় আত্মদানের শিহরণের কাহিনী। বহু নারীর ভালবাসায় তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু কাউকেই কিছু দিতে পারেননি—নিতেও পারেন নি।

'বরং রব কুধায় কাতর, ভাল সে-ও,
সুধার-ভরা দুখ তোমার
ছিনায়ে নিয়ে চলে যেও।'

একটি নৈর্ব্যক্তিকতার বেড় যেন তাঁকে সকলের থেকে স্বতন্ত্র করে একাকীত্বের খাঁচায় বন্দী করে রেখে দিয়েছিল। সেখানে আর কেউ প্রবেশের অধিকার পায়নি।

শরৎচন্দ্রের জীবনে রঙ্গলক্ষ্মী, বৈচি-ফুলের হালি সবই সত্যি—আবার সত্য নয়। মানুষের জীবনের আত্যন্তিক সুখ ও দুঃখ অনুভবের উৎপত্তি যত বাস্তবে, এই সুখ বা দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লে শিল্পী হওয়া যায় না। বেদনা অথবা আনন্দকে শিল্পে রূপান্তরিত করে সর্বমানবের মনে সঞ্চারিত করতে হলে নিজেকে অনেকটা নিরাসক্ত হতে হয়। আর তা হতে পেরেছিলেন বলেই এঁরা মনোরাজ্যে অনুভূতির এমন অজস্র ফুল ফুটিয়ে যেতে পেরেছেন।

সাহিত্যধর্মে প্রতিষ্ঠালাভ হলেও তখনকার সমালোচকেরা পিউরিটানিজমের কলঙ্ককেও তিনি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন শুধু প্রেমাস্পদের প্রতি এই ভালবাসাকে মর্যাদা দেবার জন্যই। আগেই বলেছি, আচারনিষ্ঠ বৈধব্যপালনই তাঁর বনিতার জীবনে প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই এমন কিছু প্রথাবিরুদ্ধ বৈপ্লবিক ধারণার কথা শরৎচন্দ্র লিখতে পারতেন না, যা তাঁর বনিতার সংস্কারকে আঘাত করবে। তাই শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে বাল্যবিধবা নায়িকারা যৌবনে পুরুষকে ভালবাসলেও তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পবিত্রতা বাঁচিয়ে চলেছে। সকলেই কঠিন নিয়ম-সংযম ও উপবাস করেছে।

এ সম্বন্ধে তাঁকে কোনো চিঠি লিখলে শরৎচন্দ্র বলতেন 'দাদা, এই লেখা তাঁরই প্রেরণায় ঘর কাজ ছেড়ে দেশ ছেড়েছি। সে যা পছন্দ করবে না তা লেখা চলবে না হলে না, এই হেতুটিই আমার কলমকে বেঁধে রাখত।' একজনের মৌন নির্দেশে কলম চলতে চলতে হাতো কূলই যেখানে তিনি উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন সেখানে পৌঁছতে পারেন নি। একলব্যের মতই যেন বুড়ো আঙুল কেটে তাঁকে নিবেদন করেছেন শিল্পীর পক্ষ, সাহিত্যিকের পক্ষ এবং বিশেষ করে পুরুষের পক্ষে এই যে কতবড় ত্যাগ তা সাধারণ মানুষের ধারণাতীত। শরৎচন্দ্র বলতেন—ভালবাসা পরিতৃপ্তিধর্মী নয়। এখানে অংক মিলিয়ে হিসেব করে দেওয়া, ও পাওয়া করতে গেলে ঠকতে হয়। নায়ক বিয়াত্রিচেকে নিয়ে যে অমর কাব্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্য বৈহিসেবী ভালবাসা থেকেই। অংক কষে এ উপলব্ধির ধারেকাছে পৌঁছনো যায় না। প্রথম যৌবনের সেই ভালবাসাই এঁদের অমৃতের অধিকারী করেছে।

উত্তরকালে গহর, কমললতার মত মধুর চরিত্রের জন্ম বোধহয় এই ভালবাসার অন্তর থেকেই। এঁদেরও ভালবাসা প্রকাশের অধিকার ছিলো না। মন যাকে চেয়েছিলো তাকে পাওয়া গেলো না বলেই হয় আরো গাঢ় আরো গভীরতর হয়েছে দিন দিনে। দূর থেকে সাহিত্যের পথ বেয়ে তার কাছে কিছু পৌঁছে দিতে পারলেই মন তৃপ্ত তুষ্ট খুশি। কত বড় স্রষ্টা হলেই শুধু হৃদয়ের ভেতর এই ভালবাসার সৃষ্টির মধ্যেই ডুবে থাকা যায়—মনে কোনো প্রতিদান কামনা না রেখে? অথচ এই শরৎচন্দ্রকে অনেকেই জানেন না। জানেন না পিউরিটানিজমের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার করুণ কাহিনী। কত অনায়াসে আমরা সমালোচনা করি রমা-রমেশ, সুমনলিনী-গুণীন্দ্র, সতীশ ও সাবিত্রীর মিলন ঘটবার

আনন্দ বাগচীর — আবদুল জব্বার-এর
পরমায়ু ৮-০০ — বদর বাউল ৬-০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
ছোট পাখি নীল আকাশ ৫-০০
প্রশান্তকুমার মিত্র সম্পাদিত
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ৭-০০
এতে লিখেছেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ বাগচী, গোপাল ভৌমিক, আশা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অজিত ঘোষ, গৌরী বসু, অশ্রু মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।।
মিত্র প্রকাশনী। ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। ফোন : ৩৪-৪৬২২

ঃ যখন সর্বের বেগে মুকুল আসে।

ছেলে নিঃস্ব করে আকাশে তিনি সিন্ধসাধক। এই নিঃস্বতাই তাঁর ঐশ্বর্য বলা চলে।

বেদার আর একটি উক্তি স্মরণ করেই হিনীর সর্বানিকা টানব। আলোকার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'আমি যাদের ধনী, জমিদার, রাজা মহারাজার মেলে দিতে জানতেন। হয়ত বাইজীর কিংবা মোসাহেবদের পোষণ করতেই অকৃপণ হাতে অর্থসাহায্য করে ফেউলে বেরেন। দরাজ হৃদয় ছিলো বলেই তাঁরা ফেউলে হতে জানতেন। এখনকার মানুষ ভালবাসা, ভাললাগা কোনো কিছুর জন্যই ফেউলে হতে পারবে কি?

সে শক্তি তাদের কই? ব্যাঙ্কারা গুনে গুনে হিসেব করে পা ফেলে হাঁটে—পাছে ভুল করে ফেলে, তাই এ ভালবাসা সংকীর্ণ। এ নদী নয়, ডোবা। এখনকার মানুষের হৃদয় কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে বলে তাদের ভালবাসা জৈবিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না এইটেই আজকের যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।'

অনুলিখন — সন্ধ্যা সেন

যে বইগুলি নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে

মূল উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষান্তর এই প্রথম

উর্দুর বিভিন্ন কবির

১০০টি শের ও গজলের বিশ্বস্ত সংকলন

শের শায়রী

গদ্যে অনুবাদ করেছেন ॥ শচীন ভৌমিক

দাম : ৬-০০

উর্দুর শ্রেষ্ঠতম কবি

মির্জা গালিব-এর

২০০টি শের ও গজল নিয়ে

গালিবের কবিতা

পদ্যে অনুবাদ করেছেন :

শক্তি চট্টোপাধ্যায় আসান রশীদ

দাম : ৮·০০

উর্দুর আর এক কবি

বাহাদুর শা জাফরের

১১২টি শের ও গজল নিয়ে

বাহাদুর শা জাফরের কবিতা

গদ্যে অনুবাদ করেছেন ॥ সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

দাম : ৮·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ।।৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড।।কলকাতা-২

CENTRAL LIBRARY

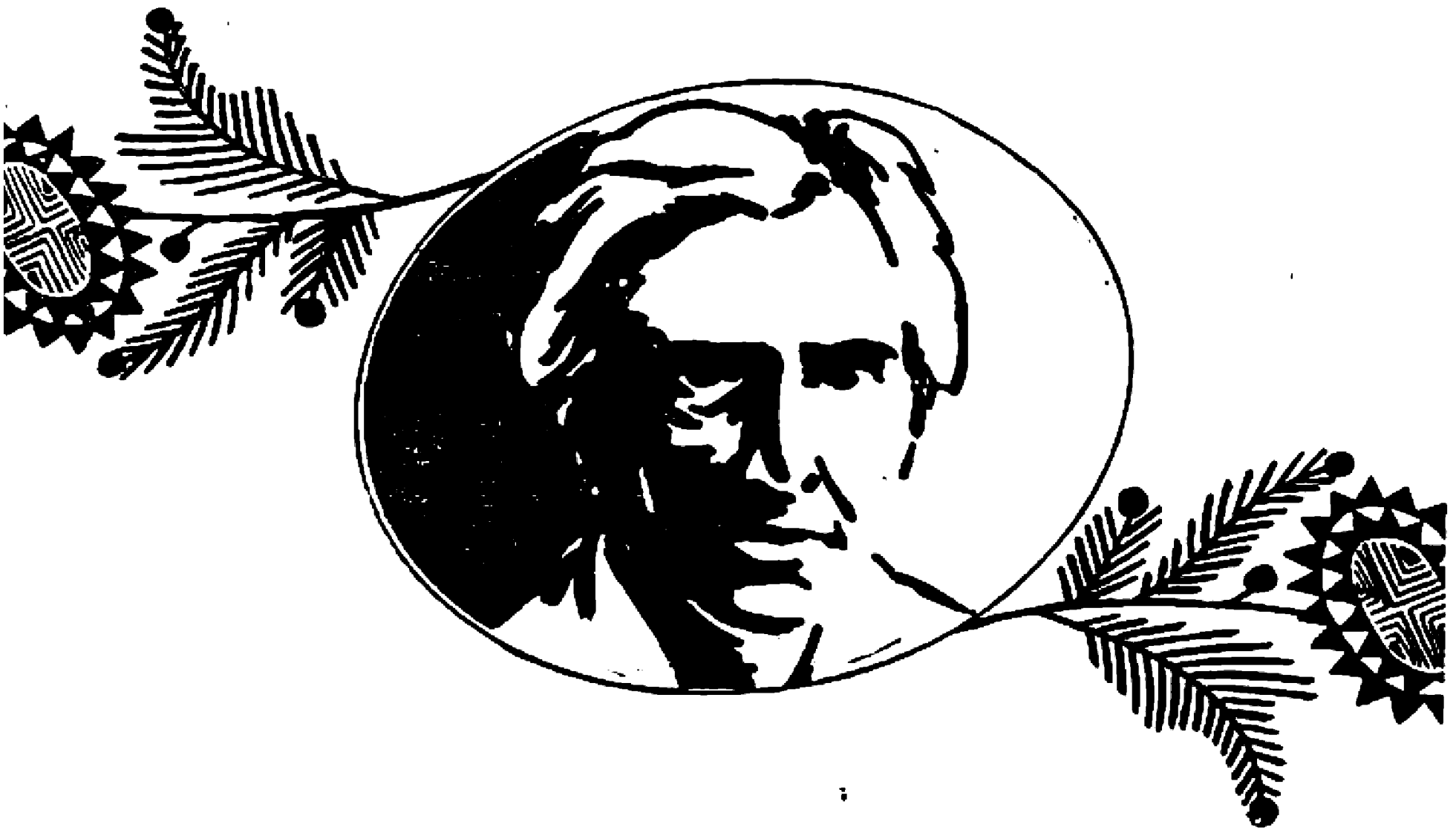

শরৎচন্দ্র নিকট আত্মীয়ের চোখে

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়

এক রবিবারের সকালে হাওড়া থেকে না হয়ে দেউলটি স্টেশনে যখন নামলাম ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা পঁয়তাল্লিশ। ম এসেছি কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের শেষ সের আশ্রয় পানিত্রাস-সামতাবেড় গ্রামে বলে। আমি আজ দেখা করতে যাব ন গ্রা থেকেই জানানো আছে শরৎচন্দ্রের নে শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়কে। চন্দ্রের শেষবয়সের দিনগুলির উজ্জ্বল ট সংগ্রহ করে নিতে চাই তাঁর থেকে। নব-কৈশোর থেকে পঁচিশ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত নন্দদুলালবাবু ৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। তাই তাঁর তিচারণে শরৎচন্দ্রের জীবনের বেশ কিছু রেখা তথ্য পরে বলে আমার ধারণা ছিল।

পানিত্রাস গ্রামেই আমার জন্ম। যৌবন ত এখানকার অকাল-বাতাস মাটি ও ষের মধ্যেই কেটেছে।

অল্প রিকসা করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে নো স্টেশন রোড ধরে যখন বোম্বে হাই ক এলাম, তখন এক এক করে কত স্মৃতি ড় করে এলো মনে। হাই রোড থেকে কালো তের মতো রাস্তা সুবিশাল মাঠকে চিরে গেছে দূরের গ্রামগুলির দিকে। বাঁ-ক ফাঁকা মাঠের প্রান্তে রয়েছে নতুনগ্রাম, কলা মেজক গ্রাম। ডান দিকে ধূ ধূ মাঠ ন গরমের দিনে জলের চেষ্টায় খাখা ছে।

অনেকদিন পরে গ্রামে আসছি। নন্দ-লাল মুখোপাধ্যায়কে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, এই সেদিনও শরৎমেলায় দেখা হয়েছিল। কোনদিন শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি নন্দদাকে। তাই আজ বুকের মধ্যে আমার অসীম কৌতূহল।

রূপনারায়ণের তীর বরাবর উঁচু বাঁধ। যদিও স্টেশন থেকে টানা নতুন রাস্তা পানিত্রাস স্কুলের পিছন দিয়ে চলে গেছে, তবু শরৎচন্দ্রের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবো বলেই বাঁধের কাছে গিয়ে রিকসা ছেড়ে হাঁটা পথ ধরলাম। গ্রীষ্মের সূর্য এমন সকালেই গলদঘর্ম করে দিয়েছে আমাকে। তবু হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন সেই অস্বস্তিকর অবস্থা ভুলে গেলাম। নির্জন গ্রাম!

চারপাশে ঘন সবুজের ঘ্রাণ, মাঝে মাঝে নদীর বুক থেকে উঠে আসা হাওয়া। হঠাৎ হঠাৎ বিচিত্র সব পাখির ডেকে-ওঠা। কখনো বা দূরে তালগাছের সবুজ হলুদ রং-এর ফিতের মত রূপনারায়ণ নদের ছবি।

এ সবের মধ্যেই ডান দিকে দেখলাম শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়। শরৎচন্দ্রের অধিকার উৎসাহ, সাহায্য ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত। বাঁদিকে সেই শ্রীসুবেন বোষ্টমের দোকান ঘর (যা এখন লুপ্ত)। সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের সাংসারিক প্রয়োজনের জিনিসপত্র যেত। আমি সেলফটা পিছনে রেখে, ডান দিকে সানতা গ্রাম ফেলে এক সময়ে গোবিন্দপুর গ্রামে চলে এলাম।

গোবিন্দপুরেই নন্দদা থাকেন। ডান দিকে একটু বাঁকুর পেরিয়ে বাঁওড় পানিত্রাস হাইস্কুল, শরৎচন্দ্র পত্নী হিরণ্ময়ী দেবীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত, শরৎচন্দ্র পাঠাগার পিছনে ফেলে বাঁধের কোল ঘেঁষে এক সময়ে বাঁদিকের মাঠে নেমে পড়লাম। আলের সরু ছিটিবিছি রাস্তা ধরে এগিয়ে রূপনারায়ণের ধার ঘেঁষে নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর সীমায় এসে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে নটা।

একটা উঁচু ঢিবির চড়াই পেরিয়ে খামকে দাঁড়াতেই দেখি সামনে এক বিরাট দীঘি। দূরে পান-বাঁধানো ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে সপরিবারে নন্দদা, হাসতে হাসতে বললেন, "ফিরে, এসে গেছিস। তোর কথাই ভাবছিলাম।"

বাষট্টি বছর বয়স হয়েছে নন্দদার। মুখে কিন্তু কিশোরের উৎসাহ।

জিজ্ঞেস করলাম, "কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি? আমার চিঠি পান নি?

'হ্যাঁ পেয়েছি। তুই ঘরে গিয়ে বোস। আমার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি। একটু এগিয়ে দিয়ে এখনি আসছি।' বলেই

ছেলেকে বললেন আমাকে ওঘরে বসাতে। আমি নন্দনার সুন্দর করে সাজানো ছোট্ট ঘরটিতে এসে বসলাম।

সামনেই ওয়েস্টেড। নন্দনা যখন বইয়ের থেকে আমার সামনে এসে বসলেন, তখন বললাম। প্রথমে দিন, হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বাড়ীর কাউকে বাতাস করতে বললেন।

'বলুন, কি জানতে চান?'

আমি বললাম, 'অনেক কিছু। সময় লাগবে। দিতে পারবেন তো?'

বললেন, 'আমার কথা শুনবি তো? তাতে কোন অসুবিধে নেই।' বলেই বাড়ীর কাউকে বুঝি ডাকতে বললেন, 'এই বীরেনের জন্যে চা করা' পরমুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাদা বীরেন তুই তো এই গ্রামেরই ছেলে, ছোটবেলা থেকেই এখানে কাটিয়ে গেছিস এই সেদিন পর্যন্ত। অনেক তো শুনেছিস মামার সম্বন্ধে, আর কি জানতে চাস?'

আমি তখন আমার সাইড ব্যাগ থেকে লেখার প্যাড কলম আর আমার লিখিত প্রশ্নগুলি টেনে বের করে নিশ্চিন্ত আলোচনার সুবিধের জন্যে কিছু প্রশ্ন একটু নোট করে রেখেছি নিজের মত করে। অবশ্য কিছু মনের মধ্যে ভাসছে, তেবো হচ্ছে। বললাম, সে সব অনেক শুনেছি, আমার বাবা অনেক কথা বলেছেন। তাছাড়া এমনিতেও অনেক কথা অনেক কানে এসেছে। কিন্তু নন্দনা, আপনি আমার হয়ে শরৎচন্দ্রকে যেভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, বা আপনার ফ্যামিলি যেভাবে দেখেছেন সেই দেখার কথা জানতে চাই। তাছাড়া এই গ্রামের পরিবেশে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাও আমার আছে। তা হোঁ আপনি ডিস্টেন্স-এ না বসলে জানা যাবে না?'

নন্দনা হাসলেন, আমার হাতের কাগজগুলোর দিকে তাকালেন। বললেন 'ঠিক আছে, এক এক করে বল, উত্তর দিচ্ছি।' একটু থেমে কি যেন ভেবে বললেন 'আমার বাবা তো জন্মসূত্রে, তাই আমারও এরাও কিছু কিছু জানেন। বাবু থাকলে অনেক কথা বলতে পারতো, শুনতো এই কথা আগে মারা গেছে।'

আর দেরী না করে প্রথম প্রশ্ন করলাম, 'লোকে জানে এবং আপনিও বলেন, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আপনার মামা। সম্পর্কটা একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

উত্তর : শরৎচন্দ্রের নিজের দিদি অনিলা দেবী আমার নিজের ঠাকুরমা। জাঠাইমার তিনটি মেয়ে ছিল। ছেলে নেই। তিনি আমাদের ছেলেদের থেকেও বেশী স্নেহ দিয়ে কাছে কাছে রাখতেন। একেবারে ছোটবেলা থেকেই শরৎচন্দ্র আমাদের আপন মামার মতন।

প্রশ্ন : আপনার এখন বয়স কত হল?

একটু কি যেন ভাবছেন নন্দনা। সেই ফাঁকে আমি নন্দনাকে কয়েকমুহূর্ত নিবিষ্ট চোখে দেখে বয়েসটা বুঝতে চাইছিলাম। মাথার বড় বড় চুল সব পাকা। এক গোছা, কাশফুলের মতো, ব্যাকব্রাশ করা। ফর্সা রং নন্দনার লম্বা পাতলা চেহারা। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নাক। নাকটা শরৎচন্দ্রের নাকের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। নন্দনার মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। হঠাৎ নন্দনা বললেন, 'হাঁ, তা প্রায় বাষট্টি হয়ে গেল।'

প্রশ্ন : পানিত্রাস শরৎচন্দ্রের মাঠে শান্তি-নিকেতনের পৌষ মেলার মত কয়েকদিন ধরে একটা মহামেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলার কর্তৃপক্ষরা বলেন, শরৎচন্দ্রের প্রথম পানিত্রাস আসার তারিখের কাছাকাছি একটা সময় মেলাটা হয়। আপনি ঠিক করে কি বলতে পারেন শরৎচন্দ্র কবে নাগাদ পানিত্রাসে এসেছিলেন।

উত্তর : ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের একদিন মামা পানিত্রাস - সামতাবেড়ের বাড়িতে পদার্পণ করেন। আমার বয়স তখন বছর দুই। ইতিহাস করতে হাত বাড়াই। তবু জাঠাইমার কাছে শুনেছি, এবং কিছু কিছু স্মৃতিতে মনে পড়ে, মামা তখন মাঝে মাঝেই ব্যক্তিগত কাজকর্ম থেকে এসে দিদির কাছে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন, এমন কখনো কখনো থাকতেনও।

প্রশ্ন : তাহলে কি কাজে চলে থাকতে থাকতেই নিজের মনের তাগিদে, মনে ভাল লেগে যাওয়ায় জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন?

উত্তর : সেটা, মামার নিজস্ব মনের ব্যাপার। আমি বলতে পারব না। তবে জাঠাইমার কাছে, আমার বাবার কাছে শুনেছি মামা এখানে এসে প্রথমই বাড়ি করার কথা বলতেন, জমি-জায়গার খোঁজ নিতেন। দেবানন্দপুরের বাড়িটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন, কিন্তু ফল হয়নি। শেষে এখানকার মাপের বাড়িটার ছবি এঁকে দিয়ে মামার বাড়ি করার ব্যবস্থা করা হয়।

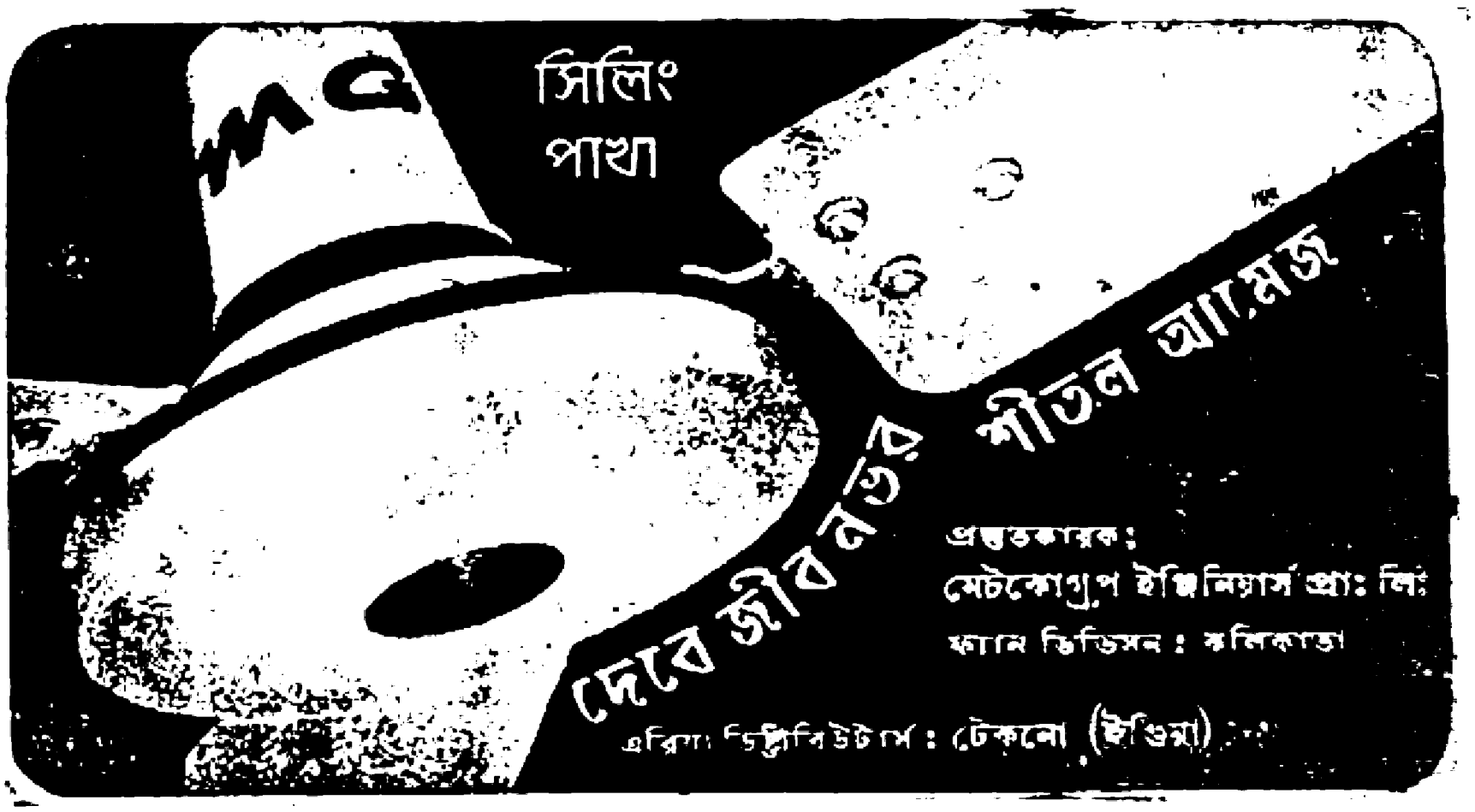

CENTRAL LIBRARY

বং গোপাল হালদার মামার বাড়িটার চার হেরী করে।

প্রশ্ন : তখন তো স্বপনারায়ণের খান পর্যন্ত এমন বিরাট চর পড়েনি। চোখের সামনে দেখেছি, তখন বন্দরপুর - সমতাবেড় মানে বাঁধের কটা জীবন বালের জলের তলায় ডুবে . এসব কেনেও শরৎবাবু বাড়ি লন কেন ? কেউ নিষেধ করেননি ?

উত্তর : বারণ করেছিলেন অনিলা দেবী, ই জ্যাঠামশাই, বাবা এবং বাড়ির আরও ড়। কিন্তু মামা শোনেননি। চিরকালই কর্ম জেদী স্বভাবের ছিলেন মামা।' চ বলতে হাসলেন নন্দদা। বললেন কার একটা ঘটনা মনে পড়ছে বলি' র জন্মেই বাড়ি করার পর, (তখন গৃহ-ও হয়ে গেছে) মামা স্বপনারায়ণের বার র একটা বড় পার্টিশন দিচ্ছেন। কাজ । এমনি একদিন সকালের দিকে একটা নক্সা করে ইরিগেশান বিভাগের বড় বড় ড়া-চোমড়া সাহেব, বন্দুকধারী আর্মড হাজির। বুঝে দাখ, তখনকার দিনের ব! সাহেবদের দেখে মিস্ত্রিরা কাজ করে দিয়েছে। খবরটা যখন মামার কানে ল মামা চুপ করে বসে রইলেন, যেন ই হয়নি। সাহেবরা ও'কে ঘিরে য়েছেন, উনি তখন দেখার ভান করে জর দিকে স্থির তাকিয়ে। সাহেবরা কে ডিস্টার্ব করতে ভয় পাচ্ছেন। কল বাদে মামা কথা বললেন। কি সব হল। পরে বোঝা গেল, ইরিগেশান কে না জানিয়ে পার্টিশন তোলা অন্যায় ছ। তাই অফিসাররা এসে স্বরচন্দ্রকে দ পাথার জন্যে 'ব্যাকডেটে' একটি আবেদনপত্র লিখে দিতে বলেছেন। মামা তাতে কিছুতেই রাজী নন। বরং সেই নিনের তারিখ দিয়েই চিঠিটা লেখেন পাঁচ-ছ' লাইন এই হলেন মামা। কি প্রকৃতি, কি মানুষ কাউকে তিনি ভয় করতেন না। নিজের পায়ের তলায় অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দিতেন না।'

নন্দদার বলা শেষ হয়েছে, প্রথমে রহিম অরেঞ্জ কোয়াস এলো তারপর চা সঙ্গে কিছু মিষ্টি, আর কখনো মিষ্টি আম। নন্দদা বললেন 'নে, সরবতটা খেয়ে নে। চা আছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে'।

আমি তখন প্রশ্নের কৌতূহল গোটানোর আকর্ষণে আরও বেশী তৃষিত। বললাম, 'খাচ্ছি। খেতে খেতেই বরং প্রশ্ন করি!'

'বল', চায়ে চুমুক দিলেন নন্দদা।

প্রশ্ন : সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিরুপমা দেবী সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি—এঁরা সব শরৎচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধু। এরকম কোন আতিথ্য আগমনে শরৎবাবুর জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার কিছু স্মৃতি কি আপনার আছে?

উত্তর : সত্যিকথা বলতে কি তখন আমি ছোট। কাউকে চেনা সম্ভব নয়। তবে মামা একটা ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন দালানে, অনেকের সঙ্গে গল্প করতেন—এ দৃশ্য আমার মনে পড়ে। আমাদের বাড়িতে এসে জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমার সঙ্গে কতদিন গল্প করে গেছেন। আমার মাকে বলতেন বৌদি। একবার বলতে শুনেছি, আজ আর ফিরব না খেকে যাবো এখানে। জ্যাঠাইমা মানে অনিলা দেবী বলতেন মামা উপেনকে পিতার মত শ্রদ্ধা করতেন সবে। (শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল অনিলা দেবীর কাছে) সুরেনকে বন্ধুর মত ভালোবাসত। সব আসত ওর বাড়িতে।'

প্রশ্ন : বড়দিদির নায়ক সুরেন্দ্রনাথ, চরিত্রহীনের অনাদি চরিত্র উপেন্দ্রনাথ, পল্লীসমাজে বেণী ঘোষাল—এসব চেনা নাম তাঁর বাস্তব জীবনের চারপাশে ছিল। শিল্পীর এইসব চরিত্রের সঙ্গে আসল ব্যক্তির কোন যোগ আছে নাকি?

উত্তর : না তেমন কিছু শুনিনি। তবে চেনাজানা লোকের নাম তিনি লেখার মধ্যে ব্যবহার করতেন প্রায়ই। এটা তো তোরাও জানিস।

প্রশ্ন : নানা চিঠি, কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় শরৎচন্দ্রের সংসারের প্রতি আসক্তি খুব একটা ছিল না। তিনি বাড়ি এখানকার আশেপাশের গ্রামগুলোর গরীব-দুঃখীদের মধ্যে অনেক সময় কাটিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার স্মৃতি থেকে কিছু বলুন?

উত্তর : এই গোবিন্দপুর গ্রামেই অনেক দুঃস্থ কাহার-জেলেদের বাস। শরৎচন্দ্র নিজেই চিকিৎসা করতেন বাড়োকোমর। মনে পড়ে, এঁদের অসুখ-বিসুখে নিজেই গিয়ে ওষুধও দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে পথ্যের ব্যবস্থা করতেন, নিজেই পকেট থেকে টাকা দিতেন। কোন কোন অসুস্থ রোগীকে নিজের বিছানায় শুয়েও সেবা করেছেন। নাপতী ছেলেদের দুরবস্থায় কাপড় জামা পর্যন্ত দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি—ওরে, এদের মুখের হাসি হচ্ছে সত্যিকারের হাসি। এ হাসিতে কোন ময়লা নেই।'

প্রশ্ন : শুনেছি এই গ্রাম আর আশপাশের গ্রামের নীচু জাত আর অত্যন্ত গরীব অশিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে একান্ত হয়ে যেতেন শরৎচন্দ্র। ঘুরে বেড়াতেন তাদের মধ্যেই। এরকম কোন লোক এখনো কি বেঁচে আছে, যার সঙ্গে শরৎবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল?

উত্তর : তেমন কেউ নেই। তবে মামার শেষ ভৃত্য গোপাল হালদার এখনো জীবিত। আর একজনের নাম মনে পড়ছে। আমাদের বাড়ির পাশেই থাকে। নাম হরি পাখিরা, এখনো বেঁচে আছে। ওকে একদিন মামা খুব মেরেছিলেন।

প্রশ্ন : মেরেছিলেন? সে কি! কেন? ঘটনাটা একটু বলুন তো!

উত্তর : হরির সঙ্গে তুই দেখা করে জেনে নিস, আরো ভালো হবে। তবে আমরা নিজের চোখে দেখেছি তো! সেটাই বলি। হরি প্রায়ই মদটদ খেয়ে মাতলামি করত। মামা ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে বেড়াতে যেতেন। প্রথম একদিন হরিকে মত্ত অবস্থায় দেখেছেন, কিছু বলেন নি। পরে একদিন মদ খেয়ে ও বৌ-কে ধরাধর করছে। সেই নিয়ে ওর বাড়ীতে চীৎকার, হৈ-হট্টগোল। এই সময় মামা ওর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সব ব্যাপারটা শোনা মাত্রই মামা তো গিয়ে খুব রেগে চড় মারেন হরিকে। আর সেই মুহূর্তে মামাকে দেখানোই একি সাধুবাবা! বলেই একেবারে ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে মামার পায়ের গোড়ায় সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে হরি। মামাকে যেমন ভয় পেতো ওরা তেমন ভক্তও করত। এই ভয়-ভক্তি মেশানো ছবি গ্রামে কত যে দেখেছি।

প্রশ্ন : শরৎচন্দ্র এই গ্রামে আসার পর একঘরে হয়েছিলেন। একজন কথাশিল্পীর জীবনে এ এক মারাত্মক খবর। এই একঘরে হওয়া সম্পর্কে কিছু বলবেন তো? এর মূলে কি তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী?

উত্তর : হ্যাঁ, এই হিরণ্ময়ী দেবীকে কেন্দ্র করেই প্রধানত গোলমালটা বাধে। তখনকার জেলক গ্রামে সমাজপতিদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। পানিত্রাস গ্রামের পঞ্চানন গাঙ্গুলী পানিত্রাস হাই স্কুল কমিটির একজন গণ্যমান্য সদস্য। তিনি আবার সমাজপতিদেরও একজন। একবার স্কুলের জন্যে চাঁদা চাইতে এলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। মামা বললেন, 'আমি তো কমিটির সভ্য নই, টাকা দেব কেন?' পঞ্চাননবাবু বললেন, 'তুমি যে সংশোধনবিহীন একটা ছেলে হিরণ্ময়ীকে বিয়ে করছ। তা সমাজের পক্ষে অন্যায়। ওকে নিয়ে সমাজে বাস করতে গেলে অর্থদণ্ড দিতে হবে, সেই জন্যেই টাকা চাইছি। না দিলে সংশোধন করবে কী করে? শরৎচন্দ্র স্পষ্ট কড়া-কড়া ভাষায় তাঁর জবাব

ডঃ এস. এস. পাত্র
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬.
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বর্ণচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৩এ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট
ক্যালিকাতা-৯
ভিপিতে ৬.৮০ টাকা পাঠালেও অগ্রিম ৬.০০ টাকা পাঠাইলে অগ্রাধিকার দিই

ম ধন্দা • হাওড়া—১
মহৎ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের জন্ম-
শতবর্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন
ত্র মিত্রের উপন্যাস পরপারে—৬-০০
শত্র কয়ের গল্পগ্রন্থ
ভালোবাসা বড়ের পাখি—৩-০০
ন কয়ের কাব্যগ্রন্থ
অনুদ্বিগ্ন কৃতজ্ঞতা—৩-০০
ত্র মিত্রের আগামী উপন্যাস
ভালোবাসা—৫-০০
লনাল—৩ কেতকো; সংগ্রহ করুন।
গৌতম ধারা প্রেস এন্ড
পাবলিসিটি ডিভিসন

ঢাকা পড়ে যাচ্ছি? আমি অন্যায় করেছি, তাও মানি না। কেউ বিয়ে করলে সমাজপতিদের অনুমতি, অনুগ্রহ নিতে হবে নাকি? সমাজপতিদের এই দম্ভও আমি মানি না। আপনি এখনি আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে পারেন।' পঞ্চাননবাবু ভীষণ অপমানিত বোধ করেন। তারপর থেকেই একঘরে করার চক্রান্ত। একদিন সন্ধেবেলা আমাদের বাড়ি এলেন পানিত্রাসের পঞ্চানন গাঙ্গুলী, সামন্তার কেশব ঘোষাল, ঘোষকের সুরেন রায়। তখন নরেনদা, আমাদের বাড়ীতে বসে। ওঁরা জ্যাঠামশাই ও আমার বাবাকে বললেন, 'শরৎচন্দ্রকে একঘরে করা হল।' তার উত্তরে আমার বাবা ও জ্যাঠামশাই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'শরৎচন্দ্রকে একঘরে নয়, বরং আমাদের নিয়ে একঘরে করতে পারেন।' একটু থেমে নরেনদা আবার বললেন, মামা একঘরে অন্যায়কে সহ্য করতে পারবেন না বলে। তাছাড়া হিরণ্ময়ী দেবীকে ঘরে এনে রাখায় বাপারেও গ্রামের লোকেরা অনা অনেক সন্দেহ করত। গুজবে বিশ্বাস করে তাঁকে সমাজপতিরা একঘরে করতে চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু এতে মামার মনে এতটুকু রেখাপাত হয়নি। আমাদের বাড়ির এই উঠোনে মামাকে দেখেছি কত প্রফুল্ল, উজ্জ্বল। সেদিনও চিত্তরঞ্জনের দেওয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্তিটি পুজো করলেন গ্রামের পণ্ডিত জীবন ভট্টাচার্য। তাঁকে পুজো করতে নিষেধ করে সেই সমাজপতিরা। তখন আমার জ্যাঠতুতো ভাই জীবন পুজো শুরু করেন। তবে কি জানিস, একঘরে করে রাখটা ঘোপে টেকেনি। মামার অসামান্য ব্যক্তিত্ব ছিল। আমাদের এই উঠোনে বসেই আর একদিন এক সমাজপতিকে বলছেন:— আপনারা একঘরে করবেন কি? আমি আপনাদের ঘোল আনাকে একঘরে করলাম।" অবিশ্যি এটাও ঠিক তখনকার স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র ছোকরারা মামার পক্ষে ছিল বলে নির্ভীক তেজস্বী শরৎচন্দ্রের এ গ্রামে ভালবাসা, প্রতিষ্ঠা লোপ একটুও অস্বাভাবিক হয়নি।

নরেনদার একটানা কথা শুনতে শুনতে আমি সেদিনের খবরটা শেষ করলাম। মন দিয়ে শুনেছি নরেনদার কথা। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম পাশের জনা-দশেক বাইরের থেকে কে যেন নরেনদাকে ডাকলেন। উঠে গেলেন উনি। শুনতে পাচ্ছি, জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

আগন্তুক বললেন, 'আপনার পুকুরের কিছু মাছ কিনতে চাই।' বাকি কি বলেন অস্পষ্ট শোনালো।

'না না সব মাছ নেব না। ও আমার জানাশুনা অনেক আসবে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া নানা কাজে লাগে।' আচ্ছা এখন যান, আমি হাসছি, কথা বলতে পারছি না।' বলতে বলতে নরেনদা নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কোন পুকুরের মাছ?

'ওই যে বড় সামনে দিয়ে এসে

নন্দলাল মুখোপাধ্যায়

ছুনে গেছি এই পুকুরেই ওই ষাট মামার পুঁটি পোষা মাছ ধরে বেড়াত—গালের সুমাটের সেই কাহিনি মনে। ইস কি সুন্দর ছিল মাছ পুঁটো। একটু থেমে বললেন 'আর কি জানতে চাস বল।'

বললাম শরৎচন্দ্রের বিবাহ সম্পর্কে কিছু বলুন। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে ওঁর বিয়ে কি ভাবে হল? মেগোমিরেজ না লাভ?'

উত্তর : হিরণ্ময়ী দেবীকে মামা রেঙ্গুন থেকে বিয়ে করেই ঘরে এনেছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাপের বাড়ি মোজিলপুর জেলার ঘাটাল সাব ডিভিশনের অর্ন্তগত হাজহাটী নরেনপুরে। এ খবর মামীমাই বলেছেন আমাকে। ' মামীমারা বিয়ের আগে বাবা-মার সঙ্গে রেঙ্গুনে থাকতেন। সেখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ। হিরণ্ময়ী দেবী লেখাপড়া জানতেন না। শরৎচন্দ্র সানডারলেন্ডের বাড়িতে তাঁকে 'পরিণীতা' পড়িয়ে 'হিরণ্ময়ী চট্টোপাধ্যায়' নামটি শুধু লেখাতে শিখিয়েছিলেন। আমরা মামীমাকে যা দেখেছি—তাঁর অদ্ভুত সরলতা, দুঃখদের জন্য অকৃত্রিম পরিচয় নানান ঘটনায় মনে পড়ে এখনো। হিরণ্ময়ী দেবী কোনদিন কাউকে নিজের ছবি তুলতে দেননি। তিনি দেখতে যে খুব একটা ভাল ছিলেন না এটাই বোধ হয় কারণ—অন্তত আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেভাবে দেখেছি—তাতে তাই মনে হয়। তার ওপর জল-উঠোনে রোগ তাঁকে একেবারে কাবু করে ফেলে। মানসিক অশান্তিও তাঁর ছিল।

প্রশ্ন : শরৎচন্দ্র মৃত্যুর সময় তিনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর : শিবপুরের বাড়িতে। মৃত্যুর পর থেকে সামতাবেড়ের বাড়িতেই বাকি জীবন কাটিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রের ছোটভাই প্রকাশচন্দ্র কলকাতা থেকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন, আমরাই মামীর দেখাশোনা করতুম।

প্রশ্ন : শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দেবদাস-পার্বতী, রমা-রমেশ, পল্লীসমাজ-রমা-রমেশ ইত্যাদি মনস্তত্ত্বভিত্তিক প্রেমের সিকোয়েন্স দেখে কেন যেন মনে হয় শরৎচন্দ্রের প্রেমের কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনি কিছু শুনেছেন আপনার জ্যাঠাইমা, মানিক দেবীর কাছে বা অন্য কোন সূত্রে?

উত্তর : শরৎচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যিকদের একজন ভবঘুরে। আমার মা-জ্যাঠাইমার কাছে একটা কথা বহুবার শুনেছি। কথাটা হল শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে শিবপুরে আসার আগে বছর দুয়েক একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। মেয়েটির সঙ্গে থাকতো একটি বাচ্চার জন্য কাঁথা কোলানো থাকতো একটি হারমোনিয়াম। ভাবতো কি পিসিটীচারের সাপ্লাই! যে মেয়েটিকে সঙ্গে এনেছিলেন, তিনিই নাকি পরে শিবরাণী বাইজী বা রাজলক্ষ্মী হয়েছেন।' একটু থেমে নরেনদা বললেন, 'এই রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রেম ছিল। তখন শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে। জ্যাঠাই-মা বলেন, সুরো (শরৎচন্দ্রের ডাকনাম) বিয়ে করতে চায়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মায়ের ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল, জাতে নীচু বলে সুরো মায়ের কাছে খুব বকুনি খায়। সুরো তখন মায়ের বাড়ি ছেড়ে পালায়।' তারপরে হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা রেঙ্গুনে চাকরি করা কালীন সময় হিরণ্ময়ীকে বিয়ে করে।

প্রশ্ন : এই গ্রাম এবং আশ-পাশের গ্রামের মৃত এবং এখনো জীবিত মানুষের মধ্যে যাঁরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কোন না কোন সূত্রে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বা হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম বলুন না?

উত্তর : অনেকেই মৃত। মৃতদের মধ্যে যেমন জাহ্নবীর মেহিনী ঘোষাল, বিজয়

ভালো ছবি তুলতে,
নিউ ফটো বিউটি-তে আসুন
বিনামূল্যে নিগেটিভ দেওয়া হয়।
আন্দুল বাজার। আন্দুল সুপারমার্কেট
ফোন—অফিস : ৬৭-৪৫২৬ গৃহ : ৬৭-২২১৬

ঘোষাল, বসন্ত ঘোষাল, ভীষ্ম ঘোষাল, কেষ্ট বসু, সামতাবেড়ের পাঁচকড়ি মুখুজ্যে, হরিলাল ঘোষাল, মনমোহন ঘোষাল, গোবিন্দপুরের বসন্ত পাত্র, পদ গাঙ্গুলী, হৃদয় পাত্র এঁরা। এখনো বেঁচে আছেন অথচ খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের মধ্যে এখনি যে সব নাম মনে পড়ছে তা হল কোর বাবা পুলিন কাকা, খগেন ঘোষাল, অমূল্য ঘোষাল।

প্রশ্ন : শরৎবাবুর এখানকার জীবন-যাত্রায় ভৃত্যদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ভৃত্যদের কিছু খবর দিন। তাঁর পোষা পশুপাখিদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্র এখানে আসার পর প্রথম ভৃত্য রাখেন পঞ্চানন মণ্ডলকে। তার-পর এক এক করে নন্দী ধাড়া, যামিনী ধাড়া আসে। শেষ গোপাল হাজরা, গোপাল হাজরা বাদে বাকি সকলেই মরে গেছে। আর পশু-পাখির ওপর অত্যন্ত মমতা ছিল তাঁর। কাকাতুয়া ময়না খরগোশ ময়ূর বেড়াল কুকুর ছাগল-এ সবই তাঁর প্রতি-দিনের পোষা ছিল।

প্রশ্ন : মধ্যমভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র (স্বামী বেদানন্দ) ও ছোট ভাই প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মানসিক সম্পর্ক কিরকম ছিল? এবিষয়ে কিছু বলতে পারবেন?

উত্তর : না। সম্ভব নয়। তবে এটুকু জানতে পারি, আমার মেজভাই-এর ডাক নাম ছিল গিরুন। তিনি মামার কোলে মাথা রেখে এখানেই মারা যান।

প্রশ্ন : পানিত্রাসের এতবড় একটা হাইস্কুল থাকতে তিনি সামতাবেড়ে গার্লস স্কুল করতে গেলেন কেন?

উত্তর : আগেই বলেছি, পানিত্রাস হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে ভাল চোখে দেখতেন না, তাই এঁদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি। শরৎচন্দ্র আগাগোড়া মেয়েদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই মানসিকতা জানা ছিল বলেই গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা কর্মীরা শরৎচন্দ্রকে স্কুলের সভাপতির পদে বসিয়েছিলেন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মনমোহন ঘোষাল, হেম ঘোষাল ইত্যাদি এবং সামতার আরও অনেকে। প্রচুর অর্থ সাহায্য যেমন করেছেন, তাই সঙ্গে দেখেছিস তো, স্কুলের গায়ে কটা বড় পুকুর আছে, ওটাও নিজের খরচে কাটিয়ে দিয়েছিলেন যাতে মেয়েদের জল কিনে হয়।

প্রশ্ন : শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সেকালের বৈপ্লবী রাজনীতি করতেন। দেশের স্বাধীনতার বিপ্লবী অধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত গভীর যোগ ছিল। এ রাজনীতি করার কিছু খবর দিন।

উত্তর : শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সে সময়ের যে বিপ্লবীর গোপন যোগাযোগ ছিল : গোবিন্দপুরের ভাড়া বাড়িতে থাকার সময়ই টিলের গোরস্তান কবরের মাঠ, সেখানে যেতে। তা থেকে খানিকটা আন্দাজ করতে পারিস, সেইজন্যেই এখানে এই নির্জন ও পানিত্রাস-সামতাবেড়ে আসা। আমি নিজে দেখেছি—এখানে জগদ্বন্ধুর বিপ্লবী নায়ক মাস্টারদা, মানে সূর্য সেন ও তাঁর দলের লোক মামার কাছে এসেছিলেন। তবে তখন এ-সবের গুরুত্ব বুঝতুম না। আমি অনেককেই চিনতাম না, সম্ভবও নয়। পরে বুঝতে পারতাম।

প্রশ্ন : কিছুকাল আগে পর্যন্ত শুনেছি, শরৎচন্দ্রের বইও বাড়িতে আনতে দিত না—এমন শরৎ-বিরোধী পরিবার নাকি এই গ্রামেই আছে?

উত্তর : আছে, এই গোবিন্দপুর গ্রামেই। তবে তুই তো তাদের চিনতে পারবিনা। আমি তাদের নাম বলতে চাই না। এঁরা শরৎচন্দ্রকে দেখতে পারতেন না। থাক্, ওঁদের নামটা যেন লিখে দিস না পত্রিকায়।

প্রশ্ন : ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত বা আরো কিছু কিছু চরিত্র ও বর্ণিত ঘটনা সূত্রে কেন যেন মনে হয় শরৎচন্দ্র নিজেও শিকারী ছিলেন, আগ্নেয়াস্ত্র ভালবাসতেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এসব লেখা সম্ভব। তাই কি!

উত্তর : খুব ভালো শিকারী ছিলেন মামা। আমরা মানে তাঁর এই ভাগ্নেরা বহুবার যে নৌকো করে হুগলীনারায়ণের চরে বেগুড়ি শিকার করতে গেছি। চলন্ত নৌকায় দাঁড়িয়ে উড়ন্ত বেগুড়ি মেরেছেন। প্রথম গুলিতেই, যেন বন্দুক নিয়ে গুলী ছোঁড়ার খেলা খেলতে খেলতে। এমন অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য। কথাটা শেষ করেই নন্দদা হঠাৎ বললেন, 'তোকে একটা দারুণ গল্প বলি। মামার মনটা কিরকম শক্ত, মৃত্যুভয়হীন ছিল —এতেই প্রমাণ পাবি। আমার দাদা ব্রহ্মদত্ত একবার মামার সঙ্গে শিকারে গেছেন নৌকায়। মামার পুলীচরা বন্দুকের নলটা একটু দূরে আমার দাদার ঠিকই মুখ করে পোরানো আছে। হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলী বেরুনোর শব্দ। গুলী একেবারে দাদার পাশ দিয়ে প্রায় গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, একটু এদিক-ওদিক হলেই লেগে যেত। দাদা মুহূর্তে ভয় পেয়ে নদীতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে নৌকায় তোলার জন্যে ব্যস্ততা। মামাও উদ্বিগ্ন, অস্থির। মামা তখন করলেন কি, উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুকের আর একটি গুলীর সদ্ব্যবহার করার জন্যে নলটি নিজের বুকে লাগিয়ে ট্রিগার ধরে থাকলেন। স্থিরদৃষ্টি জলের দিকে—গুলী উঠলো কিনা তাই দেখা। কয়েক মুহূর্ত পরে ভেসে উঠতেই দাদাকে নৌকায় তোলা হল। মামা বললেন 'আর নয়, এখনি নৌকা ফেরাও। শিকারে যাব না।' মামাকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করা হল—বন্দুকের নলের মুখটা ওভাবে বুকের ওপর চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?' স্পষ্ট উত্তর দিলেন 'হরু পায়ে যদি গুলী লাগতো, বা জল থেকে ও না উঠতো, তাহলে আমি অন্য গুলীটি নিজের বুকেই সদ্ব্যবহার করতুম। এমন মৃত্যুভয়হীন মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র।'

দুঃখবাসে শরৎবাবুর এই প্রসঙ্গটা শুনছিলাম আর ভাবছি এত আমি নেট করছিলাম। নন্দদার কথা থেমে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত ঘর নিস্তব্ধ। আমি আমার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। বললাম, 'আচ্ছা নন্দদা, আপনার কি মনে হয়, এই গ্রামে তো শরৎবাবু প্রায় ১৯১৬ থেকেই আসছেন। তাহলে তাঁর উপন্যাসে এখানকার মানুষদেরই কথা অভীরভাবে ছড়িয়ে আছে। আমার তো মনে হয় পল্লী সমাজ, কাশীনাথ, রামুনের মেয়ে, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা ইত্যাদিতে এর নানা সূত্রে প্রমাণ মেলে।

'তা তো নিশ্চয়ই। তা-ই স্বাভাবিক।' বলেই পিছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন নন্দদা। এত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিয়ে এতটুকুও ক্লান্তি বোধ নেই।

শেষ প্রশ্ন করলাম, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারী। সনে বাংলা ১৩৪১-এর ২রা মাঘ। মৃত্যুর ঠিক পরেই কোন শোক-সভা কি এই গ্রামে হয়েছিল? কে কে ছিলেন এই সভায়? গ্রামের আর কলকাতার?

নন্দদা সেই হেলান দেওয়া অবস্থায় বসে থেকে বললেন, 'হয়েছিল মৃত্যুর বেশ কিছুটা পরে। তবে আমার ঠিক মনে পড়ছে না কবে। আর আমি সে সভায় কেন যেন থাকতেও পারিনি। আশ্চর্য ঃ৪, তখনও ঠিক মামাকে আজকের মত করে ভাবতে শেখার মত মনই তৈরী হয়নি! তাই তেমনি স্মৃতি গড়ে ওঠেনি। ছেলেরা তখন।'

আমার প্রশ্ন এবার শেষ হয়ে গেল। খাতাপত্র, কলম কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে রাখতে রাখতে বললাম, 'আপনার অনেকটা সময় নিলাম নন্দদা, এমন একটা ছুটির দিন নষ্ট হলো তো?'

না, না, এটাও তো একটা বড় কাজ হল। সংসারের কাজ তো কালও হতে পারে। তোর কথার সূত্রে মামার কথা যে কতরকমভাবে মনে পড়ে গেল! সব কি আর তাষায় বলা যায়?'

আমি ঈষৎ হাসলাম। মনে মনে বল-লাম, সত্যি কথা, শরৎচন্দ্র মানুষটা ছিল জন্ম-ভবঘুরে, ক্ষ্যাপা খেয়ালী, নিজের যশ কোনদিনই তিনি ভাল করে বাঁধেন নি। শুধু বাহ্যজীবনে নয়, গভীরতর অন্তর-জীবনেও তিনি নিরাসক্ত মানুষ। তাই তাঁর শ্রদ্ধেয়া রাজনৈতিক এই পানিত্রাস-সামতা-বেড়ের বাইরের শান্তির জীবনেও তিনি ভয়ংকর অস্থিরতা নিয়ে কাটিয়ে গেছেন। বাস্তব শরৎচন্দ্র খুঁজেছেন মাটির গন্ধ মেশানো জীবন ও মানুষকে। শিল্পী শরৎচন্দ্র তৈরী করেছেন সেই মাটির গন্ধ মেখানোর উপযোগী মানস পরিবেশ, সৃষ্টি করার উপযোগী শিল্পের মাটি, শিল্পের ছায়া। পানিত্রাস-সামতাবেড় তাঁর অভিজ্ঞতায় মূল্যবান অনিঃশেষ খনি।

সাক্ষাৎকার : বীরেন্দ্র দত্ত

CENTRAL LIBRARY

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিজ্যোৎস্না

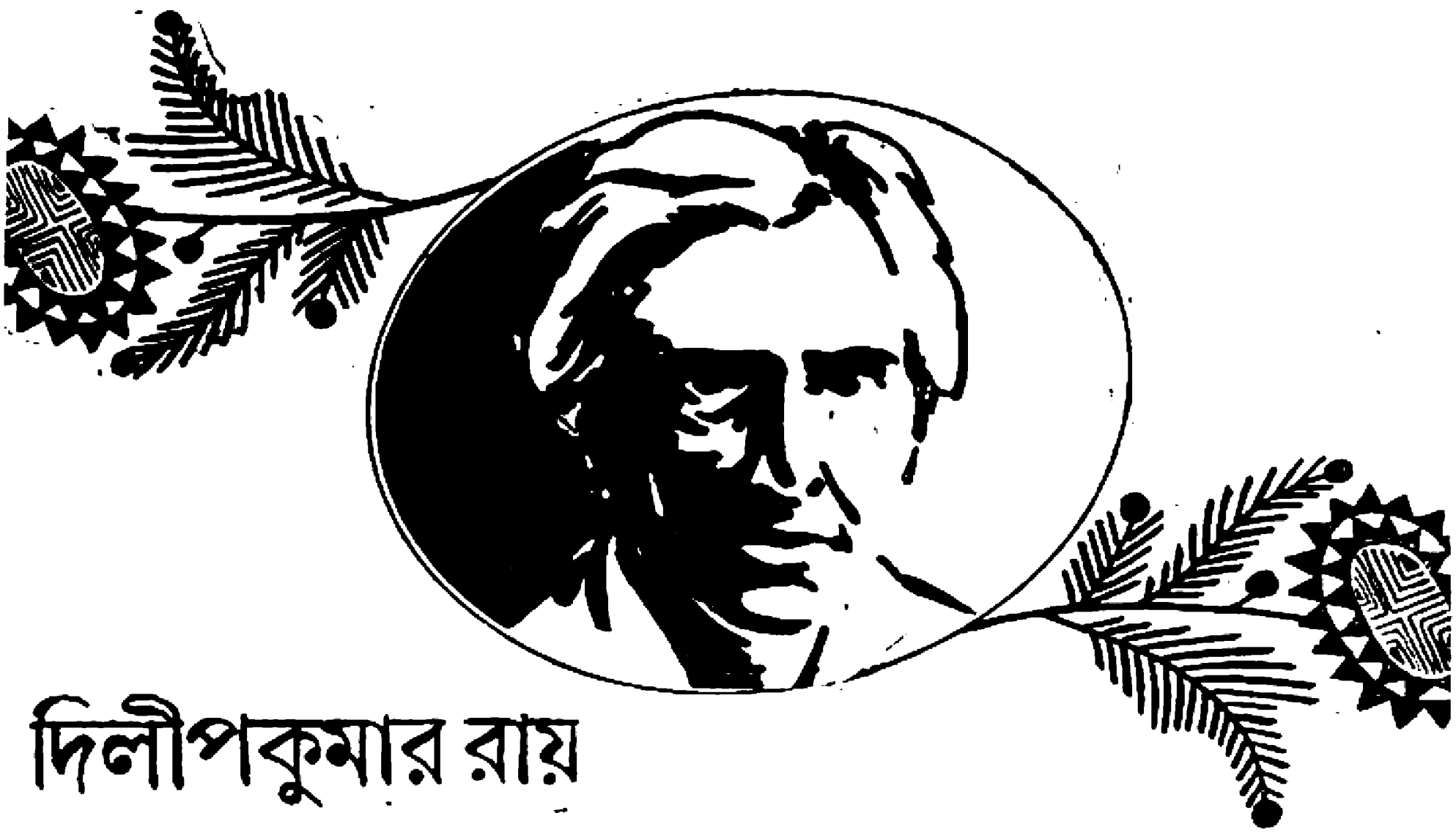

দিলীপকুমার রায়

কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় পড়েছিলাম—শরৎচন্দ্র তেমন কিছু নন, এ-যুগের পাঁচা ক্রিটিকরা যুগধর্ম অনুসারে তাঁকে আর অসামান্য কথাশিল্পী মনে করেন না। পড়ে হেসে উঠলাম আমি এযুগের ক্রিটিক নই ভেবে। আমাদের যৌবনে আমরা শরৎচন্দ্রকে কথা-সাহিত্যে মনের মান ও হৃদয়ের প্রীতি দিয়েছিলাম তাঁর গল্পের বিশেষ করে গভীর হৃদয়াবেগের জন্যে। তিনি যাই দেখতেন মনের দোষদ্রষ্টা চতুর দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন না, দেখতেন অন্তরের গুণগ্রাহী গভীর দৃষ্টি দিয়ে যার সংজ্ঞা শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন সাইকিক'। ভৌতিক গবেষণার সাইকিক নয়, প্রেম-উদ্বুদ্ধ সাইকিক দৃষ্টি যে দেখতে পায় যা অপ্রেম নিরপেক্ষ দৃষ্টি পরিধির বাইরে। শরৎচন্দ্র প্রায়ই একটি কথা বলতেন : 'সবাই কি সব পাত্রে দিলীপ?' না, ফরাসিতে যেমন বলেছেন তাঁর হুদো ছন্দে : 'যে পারে সে আপনি পারে সে ফুল ফোটাতে।' শরৎচন্দ্র ছিলেন একাধারে গল্পের ফুলমোকর ও মালাকর। তাই ঘটনার মধ্যে দিয়ে নানা অঘটনের আলোয় আমাদের চমকে দিতে পারতেন বিনায়াসেই। সব মহৎ শিল্পেই উদ্দীপনা থাকে এই চমকের—সারপ্রাইজ। গানের তানালাপে তথা নানা সুরবিন্যাসেও এই চমক আমাদের বিশেষ করে অভিভূত করে রসচেতনা করে। কবিতায় নানা নব ছন্দ ও ছন্দোবন্ধও মনকে দোলা দেয় অপ্রত্যাশিত আনন্দ-হিল্লোলে। একধারে অভাবনীয়কে ভাবনার পটে ফলিয়ে তোলা মহৎ শিল্পীর একটি মহীয়সী চাতুরী তথা গরীয়সী মাধুরী। শরৎচন্দ্র এ-গুণ সত্যটি জানতেন প্রথম থেকেই। তাই তাঁর কথাচিত্র হয়ে উঠত এমন মনোমদ, এমন বর্ণাঢ্য। না, শুধু বর্ণাঢ্যই নয়—বর্ণালি-সমৃদ্ধ—নানা রঙের সমাবেশ। প্রখ্যাত ফরাসিদেশী সমালোচক সাঁৎ বাভ বলেছেন : হে কবি, দরবার করো তাদের কাছে যাদের দেবার মতন উদ্বৃত্ত হৃদয় আছে। কারণ কেবল তাদের মধ্যেই পাবে তুমি যথার্থ গুণগ্রাহিতা—যারা তোমার গুণকেই বড় করে দেখে—যারা চলতি ফ্যাশনের নির্দেশে তোমাকে মানপত্র দেয় না তাই ফ্যাশন বদলালেও যারা তাদের মত বদলাবে না থাকবে তোমারি নিত্য।

তাই আমার মনে একটুও সংশয় নেই যে যারবার ফ্যাশন বদলালেও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রভা ম্লান হবে না—তিনি কথা-সাহিত্যে থাকবেনই, থাকবেন চিরবরেণ্য।

এর একটি কারণ—মানুষের নানা অভ্যাস বদলালেও গভীর হৃদয়বেগের আবেদনকে সমানই দৃষ্টি দেয়। তাই শ্রীকান্তের একটি স্মরণীয় উক্তি আজও ভুলতে পারিনি : চোখে যা সাধারণ ঘটনা, হয়ত বা সামান্য সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন সৃষ্টি।' শ্রীকান্ত আমাদের মন টানে বিশেষ করে এই জন্যেই : কত অফুরন্ত দৃশ্য একের পর এক বদলে যাচ্ছে কালিডোস্কোপের মতন নিতানব বিন্যাসে! আজও মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই কৃষ্ণকলি-সার কুকুরটার ছবি। অশ্চর্য, একটা সামান্য প্রচ্ছায়া কুকুর তার মৃত আত্মসঙ্গীর ক্ষীণ কুঁইকুঁই পাঠিয়ে দিচ্ছে—হঠাৎ শ্রীকান্তের চোখে পড়ল এ কী ভাবে: মনে হয় না কি এ-

---

* Poetes, allez donc a ceux qui sentent, dont l'esprit et le coeur sont disponibles. C'est parmi eux qu'il s'agit pour vous de se creer des amis fideles qui vous aiment pour vos belles qualites, qui ne vous admirent point par mode, et qui sauront vous defendre contre la mode un jour quand elle tournera.....
SAINTE BEUVE

দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে যাকে দিয়েছেন সে একটি অন্য ধরনের বিচারক?—

"কলেকাটা রাঙাপাড়ের সেলাইকরা ঢিলেঢালা এখনো তার গলায়। নিঃসন্তান স্বামীর একান্ত স্নেহের ধন কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কী খাইয়া-যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ার ঢুকিয়া কুড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই—অনশনে অর্ধাশনে এ-বেচারা বোধহয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালো-বাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, একদিন সে ফিরিয়া আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি প্রেম? এ-প্রতীক্ষা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?"

ওফেলিয়া শুনতাম। "He best can paint them who shall feel them most"

(বক্ষে হৃদয় নাড়া দেয় আমি ছবি বলতে ওঠে শ্রেষ্ঠ ছবি হবে) শরৎচন্দ্রের মনপ্রাণ জানতে মুখপাত্র নিতে স্নেহটির অন্তরে বিশেষ মাতৃস্নেহ। স্পষ্ট মনে আছে—তখন আমি স্কুলে পড়ি—কামের সুমতি বেরোয় 'যমুনা' পত্রিকায়। পড়ে আমি অধীর হয়ে পিতৃদেব নিরুপমাদেবীকে গিয়ে ধরলাম : 'পড়ুন।' পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে আমার যেন মাকে জিজ্ঞাসা করেন কেমন লাগল। মায়ের নিপুণ স্টিচকে ওঁপাতে সাবধানে বলল : বেশ। পিতৃদেব বললেন 'বেশ কি রে? বল চমৎকার!' তার পরে বন্ধু সংসদে বললেন: ঐ সুকণ্ঠ ছেলে রাম আর বৌদির চাবুককে যন্ত্রণায় অশ্বিথর কিন্তু ঘাটের চারদিকে কেবল ছোটাছুটিই করছে—গ্রামার মতন গ্রামার!' তিনি নাট্যকার ছিলেন বলেই রামের সুমতি-র নাটকীয় রসই সব আগে তাঁর মন টেনেছিল। বিন্দুর ছেলে-তেও পাই এই অপরূপ স্নেহের আলেখ্য। অন্নদাদিদি-র মাতৃস্নেহও কী মধুর! পক্ষান্তরে মা-র মধ্যে যে শুরু সন্তাননিষ্ঠ কঠোরতা থাকতে পারে তারও অনবদ্য ছবি ফুটে উঠেছে নিষ্কৃতি-তে নৈরক্ত তথা পল্লীসমাজে বিদ্রোহবহ্নির মধ্যে। নীলকান্তের অতুলনীয়া দিদিও কি মাতৃস্নেহে অনিন্দনীয়া নয়? গোকুলের ভাইপোতে? কিন্তু পরং কাহিনীতার মূল্যায়ন থাকুক—আমি চাই আজ মানুষ, শরৎচন্দ্রের কথা বলতে। তাই যদি এবার স্মৃতিসরণী ভণিতায় যায় বসে আমার মন দেখতে দেখতে টাইটম্বুর হয়ে ওঠে। কেবল এখানে মুস্কিল এই যে, পুনরুক্তি পরোপরি বর্জন করা সম্ভব হবে না যদি এ আশ্চর্য মানুষটির অনন্য ব্যক্তিত্বকে রেখায় রঙে ফলিয়ে তুলতে চাই। বলতেই হবে দিনের পর দিন কী গভীর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম তাঁর কাছে যিনি আমার কাছে শুধু আদর্শ কথা-শিল্পীই নন—ছিলেন একান্ত অভিভাবক তথা সখা-সচিব। কিন্তু না, আরো আছে। তাঁকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম সব্যসাচী বলেই বটে, কিন্তু পরে তাঁর নিষ্ঠুরতা, ঔদার্য, সত্যনিষ্ঠা, দৃষ্টিপ্রতিভা—সর্বোপরি মানুষকে কাছে টানবার সহজশক্তি-তারও কম মুগ্ধ হই নি। তাঁর কাছে আমার ঋণ এক জন্ম—অপরিশোধ্য বলেই আরো দুর্বহ—তিনিই আমাকে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গিয়ে পেশ করেন। সে-সময়ে আমার মন রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন ছিল না—তাঁর শিক্ষা পিতৃদেবকে কটূকাটব্য করে ছিল বলে। (এখনে বলে রাখি—পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথকে পিতৃ-দেবই চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছিলেন—সেকথা সত্যের খাতিরে পরে স্বীকার করতে আমার একটুও বাধেনি।) এ বিস্বাদ প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম আরো এই জন্যে যে, শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাকে বোঝান যে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে না আসাটা হবে বোকামি। তিনি নানা সময়ে কবির সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার একটি চুম্বক দিলে হয়ত আমার বক্তব্যটি প্রাঞ্জল হবে। শরৎচন্দ্র উঠতে বসতে বলতেন : বাংলা-র মহাভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের মতন সর্বতোমুখী প্রতিভাকে আমরা দিনের পর দিন তাঁর নানামুখী দীপ্তির মধ্যে দিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তিনি শুধু কবি নন নয়ী গীতিকার সুরকার রসরাজ নটরাজ —কী নন তিনি? তাঁর পূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনো আসে নি, কিন্তু যেটুকু জগৎ-সের চোখে পড়েছে তাতেই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, মন মেতে উঠেছে, প্রাণের পরিতে জমিতে সোনা ফলেছে। সর্বোপরি, তাঁরা যে-ভাষার পথে হু হু করে এগিয়ে চলেছি সে-ভাষার রাজপথ প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র কাটেন বটে কিন্তু তার নানামুখী গতির চমক আমাদের তামসিক মনকে জাগিয়ে তুলেছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথেই ভাবকলে। যে-কোনো দেশেই এমন অষ্টনটী প্রতিভার আবির্ভাব হয় কালে ভদ্রে। এহেন মহামানবকে তাদের কাছে দেবেও তুমি মুখ ফিরিয়ে নেবে এ হতেই পারে না। —ঐ লৌহাতুমি ছাড়ো। তোমাকে যেতেই হবে তাঁর কাছে আর তাঁকে শোনাতে হবে তোমার বলকণ্ঠের গান।"

(পরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন —তীর্থঙ্কর দ্রষ্টব্য : 'তোমার চিঠির উত্তরে আমি এই কথাটি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, কোনদিনই আমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করি নি। তার কারণ যার কাছ থেকে আমি কোন ক্ষোভ পাই তার সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ করে থাকি। তোমাদের মত যাদের আমি ভালোবাসি, তাদের কখনো কখনো নিন্দা করা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু যাদের সম্বন্ধে আমার কোনো প্রতিকূলতা আছে তাদের নিন্দায় আমি পরোক্ষভাবে যোগ দিই নে। তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিয়ে তাঁকে ইংলন্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলেম, শুনেছি সে-পত্র তিনি মৃত্যু-শয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখে-ছিলেন। সে উত্তর আমার হাতে পৌঁছয় নি।')

আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেই শরৎ-চন্দ্র আমার পরিচয় দিলেন। শুনে তিনি খুশী হয়ে বললেন কত কথা যে! মুগ্ধ

তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদনা : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য · তারাশংকরের লেখা সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় দুশোটি) কালানুক্রমিক সংকলিত-করে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি খণ্ডে জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত হচ্ছে। শোভন সংস্করণ।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪০টাকা ॥ গ্রাহক হলে তিনখণ্ড ১০টাকা ॥ একত্রে জমা দিলে ৮০টাকা

গ্রাহক হবার নিয়ম : একত্রে ৮০৲ জমা দিন অথবা ১ম কিস্তি ২৫৲ জমা দিন। ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড নেবার সময়ে ২৫৲ করে এবং ৩য় খণ্ড নেবার সময়ে ১৫৲ জমা দিন। রেজিঃ ডাকে নিলে ১৫৲ বেশি দিতে হবে। ২৫ পয়সা ডাকটিকিট পাঠিয়ে অথবা হাতে গ্রাহকপত্র সংগ্রহ করুন। ড্রাফট বা পোস্টাল অর্ডারের নাম লিখতে হবে Shishu Sahitya Samsad Pvt Ltd. নামেও জমা নেওয়া হয়। গ্রাহক হবার ঠিকানা (১) শিশুসাহিত্য এন্ড কোং ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলি ১২ (২) শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি ৯।

গ্রাহক হবার সময়সীমা তুলে দেওয়া হল। এখন যে-কোন সময়ে গ্রাহক হতে পারেন। ১ম খণ্ড বের হচ্ছে তারাশংকরের জন্মদিন ২৪ জুলাই। বাকি ২খণ্ড ১ বছরের মধ্যে বের হবে।

শি শু সা হি ত্য সং স দ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৯

গৃহ বধূরা আজ স্বাধীন....

SICO

তাদের বৈদ্যুতিক
সরঞ্জামে সাজান
সিকো
কিচেন

উপহার দিয়ে
বিজ্ঞানের
প্রয়োগে রান্নাঘরে
বিপ্লব এনেছে

গৃহস্থালীর আজের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুন্দর সম্ভার শুধু "সিকো"তেই পাবেন।
"সিকো" সরঞ্জামের সাহায্যে খুবই অল্প সময়ে চিকেন রোস্ট, চিকেন রোল, কেক, কাস্টার্ড একই "ওভেনে" তৈরী হবে। যে কোনো খাবার গুভেনে ইচ্ছেমত গরম ও ঠাণ্ডা রাখতে পারবেন, মনে হবে এখনি উনুন থেকে নামান হল।
আপনার রান্নাঘর ধোঁয়া, ছেলেমেয়ে গরম থেকে মুক্ত থাকবে।

SICO
1911

গৃহস্থালীর বিস্ময়কর সিকো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
কুকিং রেঞ্জ···ওভেন··হট্‌ফুড ক্যাবিনেট,
হটপ্লেট···হোয়েজ ওয়াটার হিটার ইত্যাদি

দি সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট
কোঃ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস ঃ ৬, শেরবাহাদুর রোড, রো
এলাহাবাদ-২১১০০১।
এলাহাবাদ ○ বোম্বে ○ কলকাতা
○ মাদ্রাজ ○ নিউ দিল্লী ○ আহমেদাবাদ
○ হায়দ্রাবাদ ○ বাঙ্গালোর
পরিচালনের ডিস্ট্রিবিউটার ঃ
ন্যাশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল
৬৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ঃ ২৩-৬৭৩

CENTRAL LIBRARY

হয়ে শুনলাম। এমন মিষ্ট কথা যে কোনো পুরুষের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হতে পারে আমি ভাবতেও পারি নি। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল কি অনিন্দ্য, লাবণ্যময়! কিন্তু অভিভূত হলাম তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে। মনে হল সত্যিই যেন একটা সোনার অভা, চোখে সে কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি, অঙ্গভঙ্গীতে কি সুষমা! বহু বছর পরে কেম্ব্রিজে রথীর লিখিত একটি চিঠি পড়েছিলাম :

"Rabindranath Tagore is assuredly the most beautiful man I have seen in my life'.

এর টীকা করেছিলেন তিনি এই বলে যে, এর handsome বিশেষণটি চলবে না—beautiful, beautiful'ই হল তাঁর যথার্থ অভিধা *le mot juste* কিন্তু শরৎচন্দ্রের কথায় ফিরে আসি।

এক জায়গায় শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়স্ক : উভয়েই বিষয় স্পর্শকাতর। রবীন্দ্রনাথকে আমি একবার লিখি : 'আপনার সঙ্গে এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের মিল প্রায় চোখে আসে। আপনারা উভয়েই অত্যন্ত স্পর্শকাতর।' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন : 'এ-কথা সত্য নয়। আমার বেদনাবোধ যদি অপেক্ষাকৃত অসাড় হত তাহলে শরৎচন্দ্রের কক্ষে ভর্তি হওয়া চলত না—আর বেদনাকে যদি অতিক্রম করতে না পারতুম তাহলেও কবির হার হত।' (তীর্থঙ্কর—ফেব্রুয়ারী ১৯৩২)

শরৎচন্দ্রকে এ-চিঠির কপি পাঠিয়েছিলাম পণ্ডিচেরী থেকে। উত্তরে সে সময়ে তিনি কিছু লেখেন নি—হয়ত এই ভয়ে যে, সে-চিঠি আমি সোজা কবিকে পাঠিয়ে তাঁকে অপ্রস্তুত করব। কিন্তু পরে বলেছিলেন কলকাতায় সে যখন সাহিত্যেই অন্য মন, কাজকর্মেও তাঁর জুড়ি নেই। বলে রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্রকে লেখা সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

'তোমার 'পথের দাবী' পড়া করেছি। বইখানি উত্তেজক।... আমি দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে-অ হয়েছে তাতে এই দেখলাম—একমাত্র গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা প্রজার বকো বা বাবহারে বিরুদ্ধতা কোনো গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে করে না।...শক্তিকে আঘাত করলে প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে। এই কারণেই সেই আঘাতের আঘাতের দুঃখ নিয়ে বিলাপ করে আঘাতের মূল্যে একেবারেই মাটি দেওয়া হয়। ইতি ২৭শে মাঘ ১৩০৩

এর উত্তরে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘপত্র লিখে পরে রাধারাণী দেবীকে লেখেন যে 'পথের দাবী' রবীন্দ্রনাথকে এসে তিনি কবিগুরুকে একটা প্র করতে অনুরোধ করায় এই নিদারুণ পেয়েছিলেন। শেষে শরৎচন্দ্র লিখেছি ভাবতে পারে বিনা অপরাধে কেউ এত বড় কটূক্তি করতে পারে?'

আমি এই বাদবিসম্বাদ সম্বন্ধে ব বহাল হয়ে বিপদে পড়েছিলাম। আমি প্রীঅরবিন্দের কাছে একটি মন্ত্র দীক্ষা পাই : যে, দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রবণতার ভেদ থাকলে বুদ্ধিপ্রসূত তর্কে লাভ নেই, আলো নামে না

সাহিত্য অকাদেমির অর্ঘ্য

মহেশ, বিলাসী, আঁধারে আলো, রামের সুমতি, ছবি ও অভাগীর স্বর্গ
ছটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ
খুশবন্ত সিংহ-কৃত

THE DROUGHT & OTHER STORIES

দাম ৪-৫০

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিতব্য
অ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-রচিত
শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার

SARATCHANDRA : MAN AND ARTIST

আগামী ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে প্রকাশিত হবে

সাহিত্য অকাদেমি
৩৫, ফিরোজ শৌভিরাম
কলিকাতা—২১
৩৬-১০১১

যদি মতভেদের বলে থাকে আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক, সে তো সাঁচা কথাই বলেছে, দিলীপ। আমার নিজের মন জানে এ সত্য পরম সত্য।

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, আমার চেয়ে কে বড়ো কে ছোটো এ নিয়ে বস্তুতপক্ষে আমার মনে কোনো অপেক্ষা কি উপেক্ষা নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন, আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হত না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যই আমি কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক-আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকায় জন্যেই হয়ত ভুল করেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশী দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনি ধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে হোয়া। দিলীপ কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে। ইতি।'

রবীন্দ্রনাথকে তিনি কী গভীর ভক্তি করতেন তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিই।

একদা আমি তাঁর ওখানে বসে. তাঁর নানা গালগল্প শুনেছি চায়ের সঙ্গতে এমন সময়ে দু-তিনজন অতিথির উদয়।

ওঁদেরই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিমুখ, তাই তাঁরা কোরাসে নানা সুরে শরৎচন্দ্রের। একজন কথায় কথায় বললেন : "আপনি যা লেখেন শরৎবাবু, আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু রবিবাবু কী যে লেখেন মাথামুণ্ডু ভেবে পাই না।' শরৎচন্দ্র উত্তরে পিঠ পিঠ বললেন : 'এর কারণ কী জানেন? আমি লিখি আপনাদের জন্যে, আর রবি-বাবু লেখেন আমাদের জন্যে।' মন্তব্য অনাবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কত যে নিদর্শন পেয়েছি। কথায় কথায় তিনি আবৃত্তি করতেন কবির কত কবিতা, গান—উদ্ধৃত করতেন তাঁর নানা বাণী, বলতেন তাঁর রূপের কথা—যেন অমর্ত্য-লোকের রাজকুমার পথ ভুলে এসে পড়েছেন পোড়া বাংলায়.....ইত্যাদি। একটি পত্রে তিনি কবিকে লেখেন : 'কালের যাত্রার সঙ্গে আপনার যে আশীর্বাদ পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে-কোনো সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ-দান মাথায় করিয়া লইলাম।' রবীন্দ্র-পার্ষদ প্রীপ্রমথ চৌধুরীকে ১৯৩২ সালে জানুয়ারি মাসে লেখা তাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

'পরম কল্যাণীয়েষু,

সত্যি এখন আমি যে কতখানি ঋণী হয়ে এসেছি যে, তোমরা টাউনহলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে! আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়, আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলেও নয়—যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ-অনুষ্ঠানটিকে যে-নিষ্ঠায় হয়ে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে—তাতেই আমার আনন্দ, অফুরন্ত আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কতদিন কতনা মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়—এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানে নি পড়ে, বলে—আমার চাইতে কেউ বেশি মরুক করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার চাইতে বেশিবার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস—তাঁর চোখের বালি তাঁর গোরা তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভালো বলে, সে তাঁর জন্যে। এ সত্য পরম সত্য আমি জানি মস্ত কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভরে তোমায় আশীর্বাদ করি।"

রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে ৩১ ভাদ্র, ১৩৩১ তারিখে তাঁকে লিখেছিলেন সম্প্রতি সাময়িক বিলম্ব ঘটায় না থাকায় আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম।.....তোমার প্রতিভার স্বার্থ দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেছ, দেশে গভীর অন্তরে তোমার প্রসন্নাধিকার তোমার লেখনী বাংলাদেশীর চিত্তভন্তুতে হাসি ও অশ্রুতে নবরস ঝঙ্কারে অভিষিক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তন পূজা সেদিকে সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যস্বরূপ বাংলা সাহিত্য জ্যোতিষ্কশিখায় দীর্ঘ আয়ু সঞ্চার করবে। তা চিরতিষ্ঠিত থাকবে।"

অথচ এমনি অসম্পর্কিতে ভরা মানুষের মন যে, সেখানে শ্রদ্ধা অকৃপণে সেখানে প্রত্যাশার সঙ্কোচে মতান্তরে মনান্তর, মন ফেরে ফোন এসে জানা দিয়ে স্বচ্ছ সেই প্রীতির সম্বন্ধকে আবিল করে। তাই আ বহু চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র মনকষাকষি মাফ করবার কোনো সার্থ সেতু গাঁথতে পারি নি। তবু আমি যে পর্যন্ত চেষ্টা করতে ত্রুটি করি নি—রবীন্দ্র

আমরা আমাদের ঘোষিত বর্ণাঢ্য রচনাবলীর মধ্যে যথাসময়ে আটটির ভি-পি-তে এতদিন প্রকাশ করেছি। অবশিষ্ট দুটির মধ্যে গীতা দ্বিতীয় আগস্ট এবং দ্বিজেন্দ্র ২য় খণ্ড পূজার পর।

বেদ

৫ম খণ্ড। বহুরঙ। হাজার পৃষ্ঠা। মূল্য ৭৫ টাকা। গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট। বেদ এক মহাসাগর তুল্য গ্রন্থ। বেদ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরাই জানেন

এ মূল্যে বেদ দেওয়া যায় না। কেবল মাত্র বেদের বহুল প্রচারের জন্য আমরা এই নামমাত্র মূল্যে ধার্য করেছি। এ মূল্যে গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট। এরপর মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ হবে। তার আগেই ১০ সন্ধ্যা-র্থির বা মনি অর্ডারে পাঠিয়ে গ্রাহক হোন। প্রথম খণ্ড বেরুবে সেপ্টেম্বরে।

উপনিষদ ২য় ১৫, গীতা ১৮, প্রতিটি ৫ কিস্তিতে গ্রাহক করা হচ্ছে।

অন্যান্য গ্রন্থ : বঙ্কিম ১৮, মধুসূদন ২০, উপনিষদ ১ম ১৮, কোরান শরীফ ১৫, দীনবন্ধু ১২, দ্বিজেন্দ্র ১ম ১৫, বিষাদ-সিন্ধু ৮, রামমোহন ১৮, নজরুল ৭ খণ্ড

হরফ প্রকাশনী । এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা—৯

নামকে ধরে তাঁকে নিয়ে একটি প্রাক্‌কথন লিখিয়ে নিয়েছিলাম শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত গল্পগুচ্ছের ইংরাজি অনুবাদের। অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাক্‌কথনটি ছোট কিন্তু বড় চমৎকার—আমার মাসীমা আণ্ড অদার স্টোরীজ বইটির গোড়ায় ছাপা হয়েছে। এতে কবি সংক্ষেপে অথচ চমৎকার করে বর্ণনা করেছেন বৈষ্ণবিক বাংলা ভাষা কিভাবে পরিণতি লাভের পর ছেড়ে এক নব যৌবন ফিরে পেয়েছে আর এ-সফলীকরণে শরৎচন্দ্র কতো বড় অংশীদার—সাধারণের নেতা—সাধারণ। সব শেষে লিখেছিলেন

> (March 1935): "He has imparted a new power to our language..... He has achieved the best reward of a novelist: he has completely won the hearts of Bengali readers".

হঠাৎ শরৎচন্দ্র আমাদের ঘরোয়া বাংলায় যে নবশক্তি সঞ্চার করে গেছেন কথা-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ের কবাট আনন্দ।

এ-প্রাক্‌কথনটি যখন ছাপা হয় পণ্ডিচেরিতে ভেলিভালেসের (নিউফ্রান্সে) গোড়ায় যখন আমি ঐ সংখ্যা কাগজটি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-প্রেরিত। তিনি লিখেছিলেন : "শরৎচন্দ্রের সব লেখাতেই পরিচয় হাসে এক উদার বুদ্ধির, নিবিড় নিরীক্ষার ও মানুষের চিত্তপ্রকৃতি সম্বন্ধে সহজ স্পর্শকাতর তাই তাদের সঙ্গে মুক্ত মিলে চলতে বাধা পান হয়ে বন্ধু সৃষ্টি বাধা দেয় বলেই ....." ইত্যাদি।

দ্বিপ্রহর প্রকাশন
১৬৭, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া—১
•ভ্রমর কৃষ্ণকান্তের শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে ছোটদের জন্য উপহার
সানাই দাম : ৩-০০
সম্পাদক : সংকর মিত্র
শেষ পাঠাও
প্রাপ্তিস্থান—১৬ (৪ তলা)
নিউ মার্কেটস্থ বোড, কলকাতা, হাওড়া-১

শরৎচন্দ্র এ-বইটি পড়ে শুধু আমাকে লিখলেন (অভিমানী তো!) "রবীন্দ্রনাথ আমার প্রতি প্রসন্ন নন।.....তাঁর ঋণ আমি কোনো কালেই শোধ করতে পারব না, মনে তাঁকে এমনি ভক্তিশ্রদ্ধাই করি। কিন্তু তাগা বাঁধা সাধলো.....

"সেদিনকার রইল তোমার কথা। তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ দিলীপ। এর বেশি আর কি বলব?"

আমি তাঁকে লিখেছিলাম উত্তরে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হতেই পারেন না, আমাকে স্বহস্তে লিখেছেন (তীর্থঙ্কর কবিতা) "শরতের চিঠিখানি পড়ে মনে বেদনা পেয়েছি। বন্ধুজনের শরৎকে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভায় আমার চেয়ে নিশ্চয়তর আসন বসিয়েছেন এ-সংসারে আমি জানিই নে।"

কিন্তু ঘটিয়ে এসব মতান্তর মনান্তরেই সামাজিক—অবান্তর। স্মরণীয় তথা স্থায়ী সত্য এই যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন পুরোপুরিই আর শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এত গভীর যে, আমাকে তিনি লিখেছিলেন অকুণ্ঠই যে "সাহিত্য-সেবার কাজে তিনি আমার গুরুস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ মারাই আছেন এই শ্রদ্ধাহীন শ্রদ্ধা ও অহেতুকী প্রীতির সম্বন্ধই মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীরতম সম্বন্ধ, যাকি সব টীপিকাল কলাপ মায়া—ক্ষণিকে উঠতেও মেলে মাঝে মাঝেও মেলেনি।

শরৎচন্দ্রের গল্পাবলী, সামাজিকতা রসিকতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে লিখেছি। কেবল ফেলতে পারিনি তাঁর স্নেহোজ্জ্বল নরম মনটির কথা। তিনি বাংলার অগণন নর-নারীকে কাছে টেনেছিলেন শুধু তাঁর প্রতি আর চুম্বকে নয়, সবাই তাঁকে আপন মনে করত তাঁর হৃদয়ের সহজ দাবি টানে। আমি নিজে তাঁর কাছে কী মধুর স্নেহ পেয়েছিলাম তার কথা সংক্ষেপে কিছু বলা ইতঃপূর্বে আগে। ওর কয়েকটি চিঠির পরাংশ নিয়েই চলবে যে-সব চিঠি হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী'-তে ছেপেছেন :

> "তারপরে একদিন শুনলাম তুমি সব ছেড়ে বৈরাগি হয়ে গেছ। হঠাৎ মনে হয়ে ছিল আমার নিজেরি যেন একটা মস্ত বড় লোকসান হয়ে গেল। এ-জীবনে তোমাকে আর দেখতেই পাবো না এটা মনে করো আমাদের সোজা দুঃখ? ... (৪ঠা কার্তিক, ১৩০৮)"

"পণ্ডিচেরী আশ্রমে যাবার পর থেকে তোমার সম্বন্ধে এই বস্তুটা আমি বড় আনন্দের সঙ্গেই লক্ষ্য করে আসছি যে, ওখানে থেকে তোমার পড়াশুনা হয়েছে যেমন ব্যাপক সুদূরপ্রসারী, তেমনি হয়েছে গভীর অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য কেননা তোমার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য যেমন বিনম্রী তেমনি শান্ত। নিজে বহু আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তোমার বিদ্যাবত্তার লাঠি দিয়ে তুমি কাউকে প্রতিঘাত করো না। এই দিক থেকে তোমাকে বহুই পরীক্ষা করে দেখি ততই মুগ্ধ হই, ততই এই ভেবে খুশী হই যে, দিলীপ আমার ফলে.....তার আর ভয় নেই, এখন থেকে তার সততার শুভ্রতা তাকে নীচে নামা থেকে রক্ষা করে যাবে। দিলীপ, তাদের আমি বড় ভয় করি যারা নিজেরা সাহিত্যসেবী হয়েও অপর-জনদের প্রকাশে লাঞ্ছনা করে বেড়ায়। এই কথাটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে অপরকে তুচ্ছ প্রমাণিত করলেই নিজের বড়ত্ব প্রমাণ হয়ে যায় না। তার জন্যে আরো কিছু চাই। সেটা অতো সোজা জিনিস নয়। (৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)"

তোমার সেজ মনের পরিচয় ছেলে-বেলাতেই তোমার সঙ্গীতে, তোমার গুণি-জনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে, তোমার নানা কাজে আমি পেয়েছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহও আমার তাই অকৃত্রিম। কোনো বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতেই তা মলিন হবার নয়। তোমার লেখার সম্বন্ধে যে-শুভকামনা বহুদিন পূর্বে করেছিলাম আজ তা সফল হতে চললো এ আমার বড় আনন্দ। অবার আশীর্বাদ করি তুমি সার্থক হও। (৩রা মাঘ, ১৩৪২)

তাঁর একটি কামনা ছিল প্রায়ই বলতেন—আমার সঙ্গে একবার ওদেশে যাবেন বিশেষ করে বার্ট্রান্ড রাসেলকে দেখতে। একটি দীর্ঘ পত্রে লিখেছিলেন :

> দিলীপ যে বার্ট্রান্ডের হাতে পড়ে নি সে ভালোই হয়েছে।.....ও এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্ছে। ওকে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে, ওর সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘটবে না। কিন্তু সে-আশা সে-আনন্দে আজ ছাই পড়ল। (৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৭)

একটি গানে আমি লিখেছি : ভালো-বাসি—বলা সহজ, কঠিন শুধু ভালোবাসা। শরৎচন্দ্র দুটি বাক্যের মন্ত্রে সিদ্ধি-লাভ করেছিলেন : শিশুকে সুন্দরকে মুগ্ধচক্ষু দিয়ে আর সমাজে মানুষকে ভালোবেসে। প্রণাম তাঁকে :

> অন্ধকার তুমি, শিল্পী তুমি,
> চিরন্তনের অন্তরে
> মানা নি হয়ে আঁধারে বাঁধা কলম।

২৭।৫।৭৫

• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক • তাঁত
• মিল বস্ত্র
• গ্রেজাক
• শাটিং • সুটিং
• ছিট কাপড়
বসন্ত বসন
৭৩, বি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন : ৬৭-৫৩২৫

CENTRAL LIBRARY

শরৎ সাহিত্যে নারী

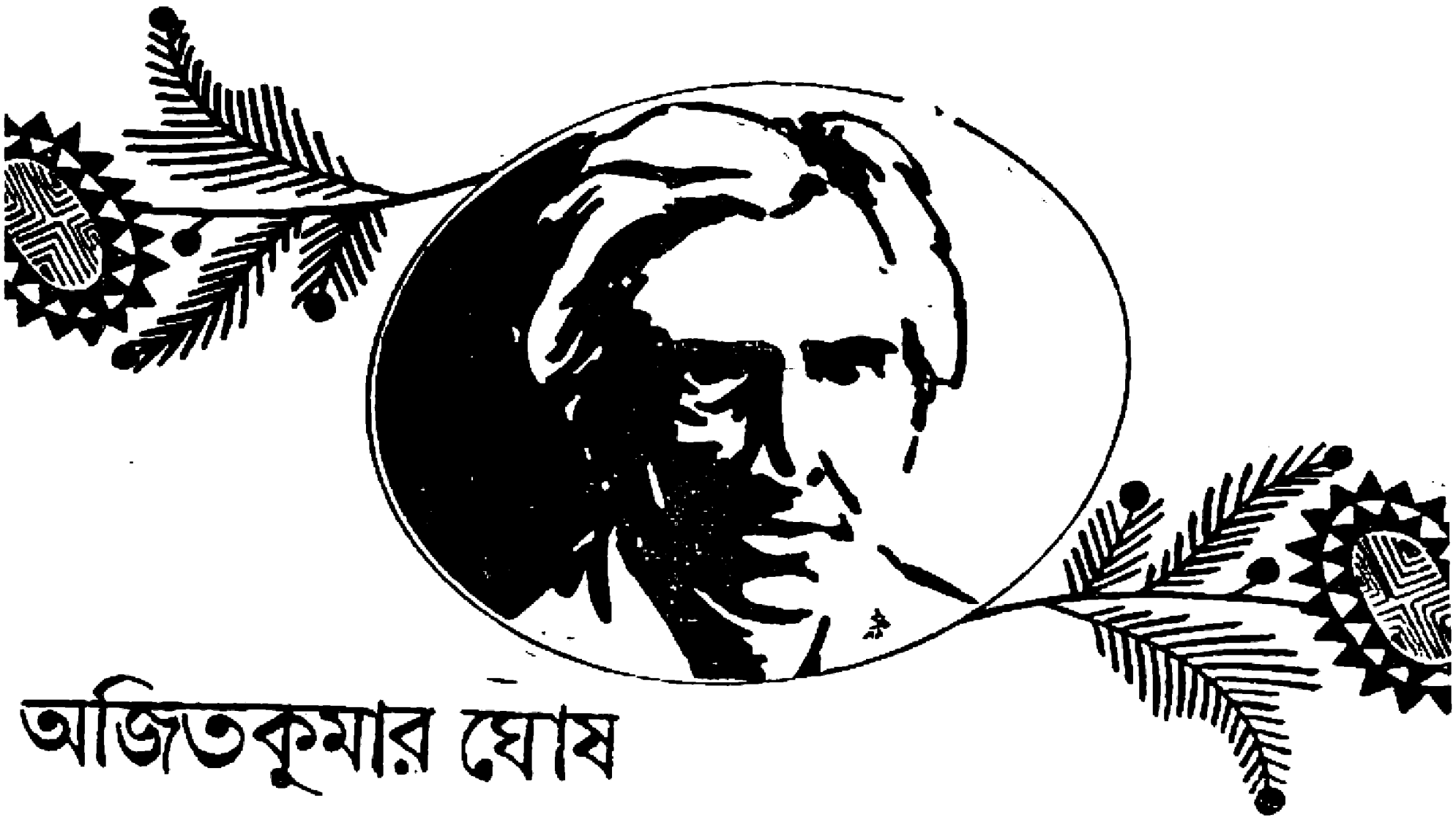

অজিতকুমার ঘোষ

শরৎচন্দ্র তাঁর নায়িকাদের চরিত্রগুলিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নারীচরিত্রগুলিও কোনো কল্পবর্তী রোমান্সের স্বর্ণরৌদ্রালোকমণ্ডিত জগতের অধিবাসিনী নয়, কিংবা আদর্শমণ্ডিত কোনো কল্পলোকবিহারিণী নয়, তারা পরিচিত বাস্তব জগতের সামাজিক বিধিবিধান, পারিবারিক আচার ও আচরণ এবং অর্থনৈতিক বাধা ও বন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোটামুটি উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে সুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বাংলার মধ্যবিত্তসমাজের সর্বাঙ্গীণ অবস্থা ও মনোভাব করলে শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলির পটভূমি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।

যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত শরৎ সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে তা হল ভূমিসম্পর্কভিত্তিক পারিবারকেন্দ্রিক পল্লী সমাজ। এখনও শিল্পের প্রসার হয়নি, সেজন্য শিল্পভিত্তিক নাগরিক জীবন যেমন সঙ্কুচিত ছিল, তেমনি বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনজনিত আর্থিক প্রাচুর্য এবং শিল্পের অধীন বিচিত্র বৃত্তি গ্রহণের জন্যে বহু লোকের সচ্ছল জীবনযাপনের সুযোগ সমাজের মধ্যে ছিল না। জমিদার-ভূস্বামীর সমাজে বিত্ত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুঞ্জীভূত হয়েছিল জমিদারবংশীয় কয়েকটি জমিদার পরিবারের মধ্যে। বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বিনা পরিশ্রমে লব্ধ সম্পত্তির ফলে এই শ্রেণীর অধিকাংশ পুরুষ ছিল অকর্মণ্য, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত ও অত্যাচারী। অবশ্য সাহিত্যে এ শ্রেণীর ভালো চরিত্র পাওয়া গেছে বিরাজ বৌ, দেবদাস, জীবানন্দ, সতীশ ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে। মধ্যবিত্তের ভদ্রলোক শ্রেণী ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ ছিল স্বল্পবিত্তভোগী কৃষিজীবী, জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী, ছোটখাটো উপজীবিকাশ্রয়ী ব্যবসায়ী, পুরোহিত ও জ্যোতিষী, স্কুল মাস্টার, ডাক্তার এবং গ্রামের কৃষিজীবী শ্রেণীর লোকজন। এরা দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে বাস করত। 'পাথুরে কাঁদুনে' ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা, ঘরে ঘরে সওদা বিক্রয়কারী ফেরিওয়ালা, ঘাটে ঘাটে ভিক্ষাজীবী ভিক্ষুক, বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে ফেরা বৈষ্ণবী, ভিক্ষা উপলক্ষে এবং গ্রামে বসবাসকারী ভিক্ষাজীবী ভদ্রলোক, যাত্রা, কবিগান, কীর্তনগান ইত্যাদি লোকরঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ভিক্ষাজীবী, ভূমিহীন কৃষক, কামার ও কোদালিয়াড় অধিবাসী। এই হতভাগ্য মানবশ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায় পল্লী সমাজ, পরিণীতা, অরক্ষণীয়া ইত্যাদির মেয়ে দলপতিদের পরিচয়ে। ভূমিসম্পর্কভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের মধ্যে যেসব বিশিষ্ট আচার-সংস্কার, সর্বজনীন সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, অন্যের দুঃখে-সুখে আন্তরিকতা এবং সমাজ-নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নারকেল বরণ করে সমাজ-জীবনের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল। এখন সমস্ত ভদ্রলোক সমাজের মধ্যে এবং সমস্ত সমাজের মধ্যে একটা বড় অংশের কেন্দ্র করে গড়ে উঠে-ছিল যে সমাজ-সংস্কারের প্রভাব ছিল না, তা সংকীর্ণ ও সংকটপূর্ণ ঈর্ষাদ্বেষ কলহ ও বাদ-বিসংবাদ অহরহ দেখা দিয়ে জীবনকে বিষাক্ত করে তুলছিল। একদিকে অহরহ-দেখা ঘরোয়া ঈর্ষা-বিদ্বেষ পল্লীগ্রামের ভূমিক্ষুধ্র আবহাওয়ার উপর নিত্যকালের ছাপ দিয়েছে। কেরোসিন, কাপড়, ঔষধ-পত্রের মত অনেক জিনিসই পল্লীর উৎপাদনের উপর নির্ভর করে বাজারের বিনিময়ক্ষেত্রে কেনা-বেচা হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও সংকীর্ণ বেতনভোগী চাকরী ও অল্প বেতনভোগী উপার্জনের মধ্যে ঘরোয়া ও প্রাচীন দোষ ছিল। কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ীরা ঘরোয়া ও প্রাচীন ধরনের সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করত। বর্ণ-ভিত্তির কঠোর নিয়ম ও চিকিৎসা, পূজা ও অন্যান্য ব্যবসায়, জীবনযাত্রার প্রণালী পুরো এইভাবে পুরনো ও প্রাচীন ধরনের ছিল।

ঐশ্বর্য ও বিত্তের সমাজের যেসব মধ্যবর্তী নারীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, যাদের নিয়ে আমাদের সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই শ্রেণ

CENTRAL LIBRARY

দিতে চাইত না কিছুই। সে কি পরিমাণে পটুত্বতা, সহিষ্ণু ও সেবাপরায়ণা তার উপরেই তার মূল্য নির্ভর করত। পরংতু এ-সম্পর্কে কথা হচ্ছে, নারীর মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি স্নেহশালিনী, স্নেহশীলা সতী এবং দুঃখ কষ্টে ধৈর্যা। অর্থাৎ, তাঁহাকে লইয়া মানুষের কি পরিমাণে সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে নিজে সুখী। অর্থাৎ সুখের আশায় ও প্রত্যাশায় কতটা পরিমাণে তিনি নিজের ও দুঃখ বাঁচাইতে পারিবেন।" (নারীর মূল্য)। মমতা ও বিচক্ষণতা মণ্ডিত আত্মবিশ্বাসী নারী তখন সমাজে বেশি ছিলনা। মনে রাখতে হবে এই দুটি নারীচরিত্রের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চেতনা দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে হাজার বছরের নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের নিয়ত আঘাতে নারীর প্রতিটি পেশীর ক্রীতদাসত্ব যে কিভাবে খসে পড়তে পারে তার দৃষ্টান্ত মেলে বিরাজ, অভয়, কল্যাণী প্রভৃতি চরিত্রে মধ্যে। লক্ষণীয় যে, মাতৃত্বের চরিত্রে অপরিসীম স্নেহসুষমার সঙ্গে অন্যান্য গুণের সমন্বয় হয়ে দৃঢ়চেতা হয়ে ওঠ

বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন, নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসর্গের জন্য ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ার লাভ নাই।' (শ্রীকান্ত ১ম)। অন্নদা দিদির মত অনেক নারীই আসলে মোটেই কলঙ্কিনী নয়, কিন্তু চিরকাল তারা পুরুষের কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে চলে। যেখানে নারী সহায় কলঙ্কিত হয় সেখানেই সেই কলঙ্কের জন্য দায়ী সামাজিকদেরোজন্য প্রভাবক পুরুষ সমাজ। জানদা (বাঈজীর মেয়ে), সাবিত্রী কমললতার মত কত সরল ও অনুগত মেয়ে পুরুষের সর্বগ্রাসী লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করে চিরকলঙ্কের টীকা কপালে নিয়ে সমাজ থেকে বিচ্যুতির অন্ধকারে ছিটকে পড়েছে। নারীর এই ধরনের কলঙ্ককে অবশ্য কখনও কখনও বিশ্বাস করেননি। সমাজের যে নীতিবোধ ও ধর্মবোধের দৃষ্টিতে নারীর এই ধরনের দুর্ভাগ্য কলঙ্করূপে প্রতিভাত হয় সেই নীতিবোধ ও ধর্মবোধ সম্বন্ধেই তিনি প্রশ্ন ও প্রতিবাদ তুলেছেন। নীতিবোধ তো পরিবর্তনীয়, 'আজ যেটা নীতি, কালকের যে মাপকাঠি নিয়ে তাকে বিচার করা হচ্ছে, কাল সে সে বলে যাবে না তাই বা কে জানে?' (প্রেসিডেন্সী কলেজের সাহিত্য সভায় ভাষণ)।

নারী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক বক্তব্য হল এই যে তিনি সতীত্ব অপেক্ষা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে শ্রেষ্ঠতর বলেছিলেন। 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম।...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একদিনও প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সভা কোথা থাকবে বোধায়?' (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)। হিন্দুসমাজে নারীর পুনর্বিবাহ স্বীকৃত নয় বলে শাস্ত্রে সমাজে ও সাহিত্যে নারীর সতীত্বকেই তার শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রই বোধহয় সর্বপ্রথম নারীর সব অবস্থাতেই তার সতীত্বই একমাত্র অত্যাজ্য ধর্ম কিনা সে সম্বন্ধে তীব্র সংশয় ও বিদ্রোহ মত প্রকাশ করেছেন। অভয়া কিরণময়ী ও কমলের মধ্য দিয়ে এই দুঃসাহসিক অভ্যুত্থানবাদের মতবাদই ব্যক্ত করেছেন। অভয়া এক জায়গায় বলেছে: 'একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারেই মিথ্যা? এত বড় অন্যায় এত বড় মিথ্যের অত্যাচার কিছুই একেবারে আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পরিত্যাগের অধিকার নেই আমার না গ্রহণ করার অধিকার নেই—সমাজ সংসার আমার কিছুতেই কিছু বলার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্লজ্জ মিথ্যাচারী বদমায়েস স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে কেবলই কি তার সমস্ত নারীর মার্জনা পাওয়া চাই। এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?' (শ্রীকান্ত ২য়)।

নিষিদ্ধ নারীচরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ যেন ছিল বেশী কিন্তু তাঁর কোনো গোঁড়ামি কিংবা একপেশে মনোভাব ছিল না। তাই তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহের অগ্নি-সঞ্চারবাহী নারী চরিত্রের পাশে সনাতন আদর্শসর্বস্ব নারীকে দেখতে পাই। সংসারের সীমানার মধ্যে যে নারী সুখে-দুঃখে কাজে-কর্মে এবং সহজ সেবাপরায়ণতার মধ্য দিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপন করে এবং যে নারী সংসারচ্যুত ও সমাজত্যাগ অপমানে লাঞ্ছনায় যেমনায় অশ্রুজলেভরা কলঙ্কিত বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি—উভয়কেই তিনি সমান সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। নীরদ কন্টেস্টাণ্টাকে কেউ জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছে অনির্বাণ দহনজ্বালায় কেউ অহরহ দগ্ধ হয়েছে অপমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেউ বজ্রাগ্নিশিখার বেগ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁরা সকলেই এসে ভিড় করেছে শরৎ সাহিত্যের আঙিনায়। বিচিত্রবর্ণিনী নারীকে সেখানে দেখলাম—কন্যা প্রেয়সী জায়া জননী স্নেহহীনা স্বাধীনভর্তৃকা বারবধূ ইত্যাদি। সকলের প্রতিই সেখকের সমান কৌতূহল সমান আকর্ষণ সমান দরদ।

শরৎ সাহিত্যে যে নারীচরিত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম আলোচনা করা যেতে সেই শ্রেণীর নারীদের নিয়ে যারা সমাজের নিয়মিত আদর্শ থেকে দূরে বিচ্যুত হয়ে আছে। বিরাজ অন্নদা সুরেন্দ্রবালা মহাশ্বেতা প্রভৃতি চরিত্রকে শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এরা পরিস্থিতির পরম্পরায় স্বরূপে প্রকট করেছে, স্বামী এ কারো জীবনের অংশীদার নয় তা নয়, তবুও; এদের সুখ-দুঃখ, কল্পনা-কামনা কিছু স্বামীর সোহাগ ও পরিচর্যার জন্য উৎসর্গীকৃত কিছু করা নয় হওয়ার জন্য এদের জীবন নিবেদিত। সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের অনেক কাঙ্ক্ষিত সমাবেশ করা কিন্তু এই সব চরিত্রচিত্রণে তিনিও প্রচলিত সমাজনীতি রক্ষা করে চলেছেন। সামান্য ভুলের জন্য বিরাজকে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তা ইন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা কঠোর নয়। উপন্যাসের সর্বশেষে ছবি মোহিনী বিরাজের যে ভয়াবহ পরিণতের আভাস তাতেও নৈতিকতার অনুশাসনের চিহ্নই ফুটে উঠে। অন্নদাদিদির জীবনও আত্মবিলোপী স্বামীর ভক্তির মহিমায় প্রদীপ্ত কিন্তু পাপিষ্ঠা নারী স্বামীর জন্য তার সর্বস্ব ভালোবাসার মূল্য কোথায়' এ প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে। নারী যে কতখানি সতীত্বের পরীক্ষা কমললতায় ও পতিব্রতা হতে তার দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র অন্নদা চরিত্রের মধ্যে রেখেছেন। অথচ সমাজের চোখে সে ত্যাগিনী ভ্রষ্টা নারী ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজের বিচার কতখানি ভ্রান্ত ও অসঙ্গতির ধারণা কতখানি অযৌক্তিক তা চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সুরেন্দ্রবালা চরিত্রটির মধ্যে সহজ বিশ্বাস

সাহিত্যিক বর্ষবরণীয় ৫ম বর্ষ ৭ম খণ্ড—

শরৎ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক-সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ৩১শে ভাদ্র ১৩৮২

আনুমানিক ৬০০ পৃষ্ঠার বই, মূল্য আনুমানিক ২৫-০০। ৫-০০ টাকার দিলে ২০% ছাড় ও এখনি একটি শরৎ বিষয়ক গ্রন্থ বিনামূল্যে পাবেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে আছে—শরৎসাহিত্যের চরিত্রগুলির বর্ণানুক্রমিক আলোচনা, শরৎবিষয়ক গ্রন্থ-তালিকা, শরৎসম্বন্ধীয় শরৎ-সমালোচনার পঞ্জিকা প্রভৃতি।

প্রবন্ধিকদের মধ্যে আছেন—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ অমিয়কুমার সেন, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, ডঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুধাময় দাস, ডঃ ভবানীগোপাল সিংহরায়, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ অরুণকুমার মিত্র, ডঃ অরুণকুমার বসু, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ডঃ রবীন্দ্রনাথ সাহানা, ডঃ নিতাই বসু, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চৌধুরানী, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক বীরেন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক মনোরঞ্জন মিত্র, অধ্যাপক মণীন্দ্রলাল হালদার, অসিমাংশু রায়চৌধুরী, শ্রীমতী সুরমা গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মজলা ভট্টাচার্য, রঞ্জনকুমার কর প্রমুখ।

পুস্তক-বিপণি। ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯।

অটল শক্তি ঐকান্তিক স্বামীভক্তির অবিচল আত্মতৃপ্তি এবং অকাতরীত নিষ্ঠার এক পরম শান্তি ফুটে উঠেছে। চরিত্রহীন উপন্যাসে অনন্যসাধারণ অগ্নিশিখাবর্ষিণী কিরণময়ীর পাশে চিরসাধারণ নীতি ও আদর্শের বেদীতে নিবেদিতা সুরেখাকে কিভাবে শরৎচন্দ্র এতখানি আকর্ষণীয় চরিত্ররূপে গড়ে তুললেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। গৃহদাহের মহিমের চিত্তে অচিন্ত সম্পর্কে শুধু কেবল নির্মোহ স্নেহের ভাবই ছিল না তার হাসা-পরিহাসের গভীরে কোনো অবদমিত কামনার অস্তিত্ব ছিল তা উপন্যাসে স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু সেও বাঙালী ঘরের অধিকাংশ ছেলের মতই পরিবারে প্রয়োজনে নিজে শুন্য করে দিয়েছে। তাই তার ভেসে আসা নেই ভাঙা নেই। স্বামী তার কাছে রক্তমাংসের মানুষ নয় ভাবের বিগ্রহ। তাই বন্ধু স্বামীতে তার ভোক নেই স্বামীর মৃত্যুতে ব্যক্তিগত অভাববোধের ভাঁড়ার নেই। সে শুধু সংসারের কাজে গৃহকর্মের সেবায় এই বৈধব্যের কর্তব্যপালনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এই চরিত্রটির প্রতি সকলের যেন একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। গৃহদাহ উপন্যাসে সে যেন একখণ্ড ঘনীভূত বাষ্পের মত বিবাদের জমাট ভূমিকাটুকুকে বারে বারে বিগলিত করে ফেলেছে। স্বামী গল্পের সৌদামিনীও অনেকটা বিরাজের মত, অর্থাৎ সামরিক মানসিক বিপর্যয়ের পর এখানেও সতীধর্মের সোজার ঘোষণা। তবে বিরাজের গৃহত্যাগের মূলে ছিল স্বামীর প্রতি সামরিক অভিমান পরপুরুষের প্রতি আসক্তি নয় কিন্তু সৌদামিনী তার প্রণয়ী নরেনকে বিবাহের পূর্বে ভালোবাসত এবং বিবাহের পরেও তাকে ভুলতে পারেনি। হঠাৎ কিভাবে নরেন তার কাছে নরেনদাদা হয়ে পড়ল এবং সে স্বামীকে কোনোদিন সে ভালোবাসেনি তার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠল তা সত্যই দুর্বোধ্য বিষয়। এখানে লেখক অনিবার্য মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি উপেক্ষা করে সতী-ধর্মের চলতি জনাকেই মুখ্য করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য এর ফলে গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে।

শরৎ সাহিত্যের দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর নারী চরিত্রের আলোচনা এবার করব। একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনে স্নেহ ও মমতার অবলম্বনে যে রস ও মাধুর্যের সৃষ্টি হয় তারই একান্ত প্রীতি-রস ঝিরে পাওয়া যায় কয়েকটি নারী চরিত্রে। প্রথম শ্রেণীর নারীদের মত বিন্দুর ছেলের হিরণ, ষোড়শীর হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে। পারিবারিক সুখের সম্পর্কের মূলে স্নেহ-ভালোবাসার ধারা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত

শরৎচন্দ্র সেদিকের দিকে আগ্রহ বোধ করেননি, কিন্তু যেসব চরিত্রের মধ্যে স্নেহ-বাৎসল্যের ধারা অপ্রত্যাশিত সেই সব ক্ষেত্রেই স্নেহ-বাৎসল্যের উৎস আবিষ্কার করে পাঠকচিত্তের সবেকৃত আনন্দ বিধান করেছেন। মাতৃহীন দেবরের প্রতি নারায়ণীর যে অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে তা সচরাচর চোখে পড়ে না। নারায়ণীর স্বামী মৃত এবং মা থাকা সত্ত্বেও তার অন্তরের সবটুকু স্নেহই এই দুর্বাসন্ত ও সকলের তিরস্কৃত বালকটির উপর উপচে পড়েছে। এই স্নেহবৃত্তি মানবিক করুণার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে এতে এক দুর্লভ মহিমার আরোপ হয়েছে। অমূল্যর প্রতি কিরণের যে স্নেহ তা আপন সন্তানের প্রতি মায়ের জৈবিক স্নেহবৃত্তি নয় তা মায়ের সন্তানের প্রতি সঙ্কোচের অন্তে প্রবল বাৎসল্য বা আমাদের চমৎকৃত কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে-রাখে। বিন্দুর অভিমান ক্রোধ কলহ অসহিষ্ণু আচরণ সবই অপরের গর্ভ-জাত সন্তানকে কেন্দ্র করে সেজন্য তার সংযমহীন অধৈর্য মাতৃসুলভ আতিশয্য ও বিদ্বেষপূর্ণ কথা ও আচরণ সব কিছুই আমরা কৌতূহলসিক্ত অনুকূল দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করি। পল্লী সমাজের মধ্যে আপন পুত্রের প্রতিপক্ষ রমেশের প্রতি রমেশজননীর অপার স্নেহ স্বাভাবিক জৈব বৃত্তির উপরে এক উদার ও নির্বিশেষ মাতৃত্বের মহিমায় চরিত্রটিকে ভূষিত করেছে। মেজদিদি গল্পে বহু স্নেহের পাত্র থাকা সত্ত্বেও এক অভাগা কাঙাল ছেলে কেষ্টর জন্য তার হৃদয়ের উৎস থেকে সবটুকু স্নেহই বর্ষিত হচ্ছে। তার করুণামিশ্রিত বাধাবিজয়ী স্নেহ এবং কেষ্টর নীরব প্রকাশ ভীরু মনের প্রবল আকর্ষণ লেখক কয়েকটি তুচ্ছ ঘটনা, বিষয় আচরণ ও মৌন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে একান্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

শরৎ সাহিত্যের তৃতীয় আর এক শ্রেণীর নারীচরিত্রের কথা এবার আলোচনা করা যেতে পারে। এরা নাগরিক সমাজের আধুনিকা, ব্যক্তিমমরী ও স্বাতন্ত্র্যবাদিনী নারী। এদের বাক্যে ও আচরণে একটা অকুণ্ঠিত ও অনাড়ষ্ট ভঙ্গি লক্ষ্যণীয়, এদের বুদ্ধি ও চিন্তা কোনো সামাজিক শাসনের কাছে নতি স্বীকার করে না এবং এদের হৃদয়বৃত্তির স্পষ্ট ও সাহসিক প্রকাশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ললিতা বিজয়া সরোজিনী কমলা ভারতী প্রভৃতি চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে। এদের প্রত্যেকটিকেই আমরা দেখেছি। এদের মধ্যে ললিতা ও বিজয়ার প্রথম যৌবনের বিচিত্র রঙে রঙিন হয়ে স্নিগ্ধ কমনীয় রসে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ললিতার দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতার জন্য তার ভালোবাসা নীরব অন্তর্মুখীন ও সামাজিক বিধানের ছায়ায় একটু ম্রিয়মান। কিন্তু বিজয়া নিজেই সম্পত্তির অধিকারিণী সুজনা তার ভালোবাসাও কিছুটা প্রকাশ্য ও আত্মনির্ভরশীল। তবে শরৎচন্দ্র তার চরিত্রেও বাঙালী নারীসুলভ লজ্জা, কম্পমান আত্ম-নিরাশার মধ্যে অকারণ অভিমান ও গোপন বেদনা সঞ্চার করেছেন। বিজয়া অসাধারণ শক্তিমান রাসবিহারীর কাছে অসঙ্কোচিতা কিন্তু পঙ্গুপদের কাছে সে লজ্জিতা এবং এই পরাজয়ের মধ্যেই তার সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিহিত। কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কোমল নারীত্বের এই সুন্দর মিশ্রণের ফলেই চরিত্রটি এত আকর্ষণীয় হয়েছে। সরোজিনীও রোমান্টিক প্রণয়িনী, কিন্তু সতীশের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্বন্ধটি তেমন গভীর ও বিস্তার লাভ করেনি। সরোজিনীর মত কমলাও ইণ্ডো-বঙ্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার উৎকট সাহেবীয়ানার পরিবর্তন হয়েছে। তবে শুধু কেবল বাহ্য কথা ও আচরণে তার বাস্তিত্বময় ও আত্মনির্ভরশীল সত্তা যতখানি প্রকাশ পেয়েছে তার অন্তর সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত ও গাঢ় অনুভূতি ততখানি প্রকাশ পায়নি। তার প্রণয়ের পথ অকণ্টক ও সতত পরিবর্তনশীল। সেজন্য চরিত্রটি পাঠকের মনে কোনো স্থায়ী রস সৃষ্টি করতে পারে না। ভারতী বিজাতীয় খৃস্টান সমাজের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও স্নেহে প্রেমে সেবায় সহিষ্ণুতায় শরৎচন্দ্র তাকে বাঙালী ঘরের চির-পরিচিতা মেয়ের রূপে সৃষ্টি করে তুলেছেন। অপূর্বর মত ভীরু দুর্বল অপটু ও পরনির্ভরশীল একটি চরিত্রের প্রতি তার সীমাহীন ও অপরিসীম প্রেমের মহিমায় সে মহীয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু কেবল সেবা, সহিষ্ণু প্রেমের মধ্যেই তার চরিত্র নিঃশেষ হয়ে যায় নি, রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে তার অংশগ্রহণ এবং নিজের স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের বলিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের সক্রিয় স্বাবলম্বী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুমিত্রা বিপ্লবের অগ্নিবাহী নায়িকা বটে, কিন্তু তার চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ দেখা যায় নি। নায়িকা হয়েও সে যেন একটু নেপথ্য-বর্তিনী। তার চরিত্রের প্রত্যাশিত সম্ভাবনা যথাযথ পরিস্ফুট হয়নি।

শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট নারী চরিত্রগুলির আলোচনা এবার আমরা করব। নারী চরিত্রের চতুর্থ শ্রেণীতে আমরা সেই সব প্রতিবন্ধ চরিত্রের আলোচনা করব যারা নিষিদ্ধ ভালোবাসার বেদনা ও অভিশাপ নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। এদের চরিত্রচিত্রণেই শরৎচন্দ্র তাঁর সবটুকু সহানুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন এবং তাঁর সাহিত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় দিয়েছেন। ভালোবাসা কোথাও কোথাও সমাজের চোখে নিষিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তার মাধুর্য, শক্তি ও মহিমা কখনো ছোটো হবার নয়। অবনারীর ভালোবাসার প্রতি সমাজের হৃদয়হীন অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি অনেক জায়গায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, সমাজ জিনিসটাকে আমি-আমি,

মশার কামড়ে
প্রাণ যায়!

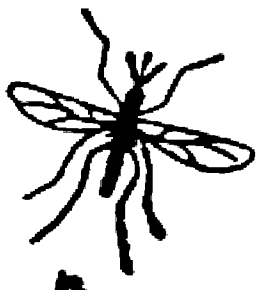

তাহলে ব্যবহার করুন
ওডোমস

লক্ষ লক্ষ লোক এর ওপর নির্ভর করেন যারা এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
BALSARA

কিন্তু দেবতা বলে মানেনি। বহুদিনের পঙ্কীভূত, নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়। কিন্তু এর একান্ত নির্দয়মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসায়—বেদনায়, সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সুস্পষ্ট এই খানে...পুরুষের উদ্যত মুষ্টিমেয় নিষ্ঠুর ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কেন সেই বাঁধ নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী।' (সাহিত্যে অশ্লীল ও দুর্নীতি)। শরৎ সাহিত্যে নারীর এই তথাকথিত নিষিদ্ধ ভালোবাসা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, বিধবার ভালোবাসা, বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি ভালোবাসা এবং পতিতার ভালোবাসা। আজ বিধবার ভালোবাসা সমাজের মধ্যে কোনো বড় সমস্যা নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময়ে এই ভালোবাসা নিষিদ্ধ ছিল, আইনের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু দেশাচারের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি শরৎ চন্দ্রের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনীতির দিক দিয়ে বিধবার ভালোবাসার সমস্যাটি দেখেছিলেন, সেজন্য সেই ভালোবাসার বেদনা অপেক্ষা তার নীতিভ্রষ্টতাই তিনি বড় করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর ভালোবাসার মধ্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটি দেখেন নি, ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণই তিনি তাঁর লেখনীকে নিয়োজিত রেখেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই ভালোবাসার বেদনা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য অপরূপ শিল্পরূপের মাধ্যমে ফুটে ধরেছেন এবং যে সমাজ ও দেশাচার এই ভালোবাসা স্বীকার করে না তার বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বিধবার বিবাহ দিয়ে এই ভালোবাসার সহজ সমাধান করতে চাননি, তিনি সমাজ-সংস্কারক নন, শিল্পী, শিল্পীর কাজ কোনো নিশ্চিন্ত সমাধান ঘটানো নয়, সেই সমাধানের দিকে বিচলিত পাঠকের মনকে উন্মুখ করে দেওয়া। সেই কাজই শরৎ-চন্দ্র করেছেন। তাঁর বিধবা নায়িকারা সচেতন সংস্কার ও অবচেতন হৃদয়ের দুর্বার প্রেমের দ্বন্দ্বে অসহায়ভাবে পীড়িত। মাধবী, রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী সকলেই এই দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এই দ্বন্দ্বের জ্বালা, অবসাদ, শূন্যতা ও অশ্রুর মন্দাকিনীধারা শরৎ সাহিত্যে অমৃতত্ব লাভ করেছে। বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষে আসক্তির চিত্র অচলা, অভয়া, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। অভয়া ও কিরণময়ীর কথা পরে আলোচনা করা হবে। এখানে অচলার কথাই শুধু আলোচনা করা যাক। অচলার মুখে কোনো তাত্ত্বিক বিতর্ক কিংবা কোনো মননশীল প্রতিবাদ আমরা শুনিনি। দুই বিপরীতমুখী হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ড আকর্ষণ-বিকর্ষণে তার চরিত্র যে অনিবার্য ট্র্যাজেডির পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়েছে তারই সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ এই উপন্যাসে পাই। অচলার চরিত্রচিত্রণে শরৎ-চন্দ্র নৈতিকতার প্রশ্নটি গৌণ রেখেছেন, মুখ্য করে তুলেছেন মানবের হৃদয়বৃত্তির অনিবার্য, অলঙ্ঘ্য ক্রিয়াকলাপ। শরৎচন্দ্র পতিতার ভালোবাসার চিত্র আঁকবার সময় দুটি বস্তুকে তুলে ধরেছেন। পতিতা হলেও যে ভালোবাসার পরশমণির পরশে অন্তর সোনা হয়ে যেতে পারে তার চিত্র পাই অন্ধকারে আলোর বিজলী ও দেবদাসের বেদনামুখীর মধ্যে। এই দুটি উপন্যাসই গোড়ার দিকে লেখা বলে বিজলী ও বেদনামুখীর চরিত্র একটু বেশি রকমের আদর্শায়িত হয়ে পড়েছে। পতিতা-জীবনের কামনাপঙ্কিল রূপ এদের মধ্যে দেখা যায় না, কামগন্ধহীন নিষ্কলুষিত প্রেম-সনৃশ প্রেমের দীপ্তিতে তাদের চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শরৎ সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর তথাকথিত পতিতা চরিত্র আছে যারা পতিতবৃত্তি অবলম্বন করেনি, কিন্তু সমাজের চোখে তারা পতিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা হল সাবিত্রী, ষোড়শী, রাজলক্ষ্মী, কমললতা ইত্যাদি। এরা হয়তো জীবনে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করেছে, যেমন, সাবিত্রী মেসের কি, ষোড়শী মন্দিরের ভৈরবী, রাজলক্ষ্মী মোহিনী বাইজী এবং কমললতা নিবেদিতা বৈষ্ণবী। শরৎচন্দ্র দেখালেন, এদের বিচারে সমাজ কতখানি ভ্রান্ত, অন্ধ ও হৃদয়-হীন। এরা কেউ কেউ পুরুষের বিকৃত কামনার শিকার হয়ে পতিতার কলঙ্কিত আখ্যা লাভ করেছে, যেমন সাবিত্রী ও কমললতা, কেউ ধর্মের সেবার আত্ম-নিয়োগ করেও কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয়, যেমন ষোড়শী এবং কেউ বা নিরুপায় হয়ে পতিতার মনোরঞ্জনী বৃত্তি গ্রহণ করেছে, যেমন রাজলক্ষ্মী। আসলে পতিতার কলঙ্ক এদের কপালে লেপে দেওয়া একটা বাহ্য চিহ্ন মাত্র, মনের গভীরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এদের সমস্যা অন্যত্র। সমাজের দেওয়া কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেড়াবার অর্থে তারা যে সামাজিক অবস্থায় জীবন যাপন করত তার বিশ্বাস, সংস্কার, বেদনা ও কল্পনাই তাদের মনকে অধিকার করে থাকে। সেই সমাজবশা নারীসত্তার সঙ্গে শাশ্বত প্রেমের আবেগে আলোড়িত নারীসত্তার অন্তর্হীন দ্বন্দ্বের রূপই এদের মধ্যে দেখা গেছে। এই দ্বন্দ্ব বিধবা সাবিত্রীর সঙ্গে পুনর্নবিনী সাবিত্রীর, বিধবা ও মৃতা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী রাজলক্ষ্মীর, ভৈরবী ষোড়শীর সঙ্গে বঞ্চিতা পত্নী অন্নদার।

শরৎচন্দ্রের পঞ্চম শ্রেণীর নায়িকাচরিত্রের মধ্যেও সমকালনিরপেক্ষ প্রেমের অবতারণা দেখতে পাই। কিন্তু এখানে প্রেমের নীরব বেদনা, নির্বাক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্রান্দিত পরিণতি নয়, প্রেমের স্বরূপ আবিষ্কার, যুক্তিনিশ্চিত কলহাসি ও প্রতিবাদমুখর প্রতিষ্ঠাই দেখতে পাই। অভয়া, কিরণময়ী, কমল—এরা এই একটি শৃঙ্খলা তুলোয়ার, যেন গড়িয়ে এসে একটি আগুনের গোলক। তবে কমললতা নিবেদিতা সাধ্বী, কিন্তু বৈষ্ণবের ও বার্নার্ড শ-এর নায়িকাদের মতই এরা বিবাহের অন্তর্নিহিত ফাঁকি, অসঙ্গতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর। এদের মধ্যে অভয়া ও কিরণময়ী বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবনের তিক্ত ব্যর্থতা থেকেই বিদ্রোহের তীক্ষ্ণ ভাষা লাভ করেছে। অভয়া তার বঞ্চিত নারীজীবনে রোহিণীকে অবলম্বন করে ভালোবাসার স্বপ্নলোক রচনা করেছে। কিন্তু তবুও স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে সে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হল যখন নির্দয় অত্যাচার সহ্য করে সে তার নরপশু স্বামীর স্বাধ্বী বিতাড়িত হল। তখনই সে পুনরায় রোহিণীদার কাছে ফিরে এল এবং প্রকাশ্যে তাকেই তার যথার্থ স্বামীরূপে গ্রহণ করল। বিবাহের কতকগুলো প্রাণহীন মন্ত্র দিয়ে ফাঁকিভরা পাওয়ার চেয়ে হৃদয়ের ভালোবাসার সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে হৃদয় নিঙড়ানো পাওয়া যে অনেক বড়, অভয়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। কিরণময়ী চরিত্রের গভীরতা ও বিস্তৃতি অনেক বেশি। আমার মতে কিরণময়ী শরৎসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা। সে অসামান্যা সুন্দরী। বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী ও জেবউন্নিসার মত তার রূপের আগুন অপ্রতিহতভাবে আকর্ষণ করে এবং অনিবার্যভাবে দগ্ধ করে। তার অতৃপ্ত কামনার আগ্রাসী ক্ষুধা অবশেষে অকৃত্রিম প্রেমের অমৃতধারায় শান্ত হল। জ্ঞানবত্তা ও মননশীলতার দিক দিয়েও তার সঙ্গে অপর কোনো নায়িকার তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে হৃদয় ও মননের এরূপ বিস্ময়-কর মিলন শরৎ সাহিত্যে দুর্লভ। সে প্রতি মুহূর্তে যেমন অপরিজ্ঞাত রহস্যের দিকে আমাদের সম্মোহিত চিত্তকে আকর্ষণ করে, তেমনি অচিন্তিত কোনো তত্ত্বের প্রতি আমাদের উদ্দীপ্ত বুদ্ধিকে কৌতূহলী করে রাখে। কমলের বিদ্রোহ সবচেয়ে জোরালো, সবচেয়ে ধারালো, সবচেয়ে শাণালো। তবে সে যেন তর্ক-বিতর্কের একটি শুষ্ক ঝরাপিকণ্ঠ, বেদনা ও আকৃতির স্পর্শে সবুজ কোনো প্রাণস্পন্দনময়ী লতা নয়। বহুদিন ধরে শরৎচন্দ্রকে নারীজীবনের যে সব প্রশ্ন ও সমস্যা ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করেছে সেগুলি কমলের মুখে শাণিত যুক্তি ও তর্কের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তা থেকে তাত্ত্বিক সত্তাই বড় হয়ে উঠেছে।

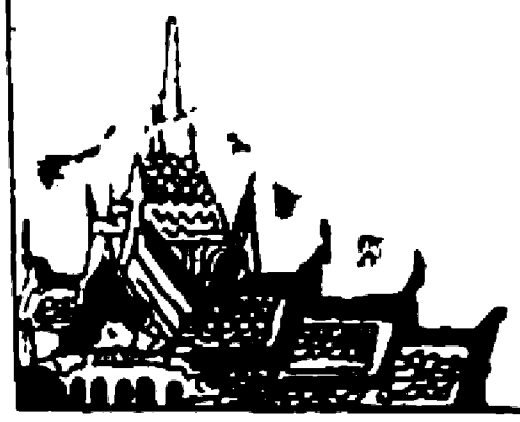

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র

পূর্ণাঙ্গ নাটক

মন্মথ রায়

প্রবেশানুক্রমিক চরিত্রলিপি

— পুরুষ —

১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২। বা-খিন (বর্মি চিত্রকর)

৩। বর্মি নর্তকী (লোকসঙ্গীতের দল)

৪। উ-নু (বর্মি জমিদার)

৫। কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় (রেঙ্গুনের বিখ্যাত বাঙালী অ্যাডভোকেট)

৬। কেষ্ট (কুঞ্জবাবুর গৃহ-ভৃত্য)

৭। যজ্ঞেশ্বর দে (রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গী)

৮। গিরীন্দ্রনাথ সরকার (রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের বন্ধু)

৯। হরিহর চক্রবর্তী (শান্তির পিতা)

১০। সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতজ্ঞ প্রতিবেশী)

১১। রায়সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১২। নগেন্দ্রলাল রায় (কলিকাতা হইতে আগত যুবক)

১৩। পাঁচকড়ি দাস (কলিকাতা হইতে আগত যুবক)

১৪। নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (রেঙ্গুনের বাঙালী ধনী ব্যবসায়ী)

১৫। তোলা (শরৎচন্দ্রের বিলাতের গৃহ-ভৃত্য)

১৬। কৃষ্ণদাস অধিকারী (মোকদ্দমার পেশী ও সঙ্গীতজ্ঞ)

১৭। মাধব মিস্ত্রি

১৮। ভোলানাথ (ধনী যুবক)

১৯। কীর্তনীয়া বালকগণ

২০। ডাক্তার

— স্ত্রী —

১। ইরাবতী (রেঙ্গুনের বিখ্যাত বর্মি নর্তকী ও বা-খিনের ভাবী পত্নী)

২। গায়ত্রী (বালবিধবা তরুণী)

৩। শান্তি (শরৎচন্দ্রের প্রথমা পত্নী)

৪। হেমাঙ্গিনী (শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী)

৫। মাধবীর ছায়ামূর্তি (বড়দিদি উপন্যাসের বিধবা নায়িকা)

।। উদ্বোধন দৃশ্য ।।

(১৯০১ খৃষ্টাব্দ। রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে সমুদ্রতীর। বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধ্যা। যবনিকোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর হইতে লোকসঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিল। সঙ্গীতের মধ্যে চিত্রকর বা-খিন ও শরৎচন্দ্র। সঙ্গীত লোকসঙ্গীত ছাড়িয়া গেলে সঙ্গীতজ্ঞও ঐ চলমান মিছিলে যোগ দিয়া চলিয়া গেল। রহিলেন শুধু বা-খিন ও শরৎচন্দ্র।)

শরৎ : বা-খিন!

বা-খিন : মি শরৎ?

শরৎ : বিদেশী এই বাঙালীর চোখে যদি পূর্ণিমার এই রূপই লোকসঙ্গীত আজ এই ১৯০১ খৃষ্টাব্দেও ব্রহ্মের একটি কথাই মুখর হইয়া আবহমানকাল আর হৃদয়বাসী, তাহারা সবাই একই মহান সভ্যতার সন্তান।

বা-খিন : শরৎ, সেটা মন-প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বলিয়াই তো আপনি আজ এখানে। নতুবা আমার ঘরে নয়। ঘরে আমার স্ত্রী আছে।

(উচ্চহাস্য)

CENTRAL LIBRARY

।। প্রথম কাণ্ড ।।

(বা-থিনের অধ্যয়ন-কক্ষ। কাল : সকাল)
(বা-থিন ও শরৎচন্দ্রের প্রবেশ)

বা-থিন : এস শরৎদা, এই আমার নতুন গরীবখানা। এই ঘরে আমি ছবি আঁকি, পাশে শোবার ঘর। পিছনটায় রান্নাঘর, খাবার ঘর, স্নানের ঘর, সবই অ্যাটাচ্‌ড আছে। আমার একজনের পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। ভাড়াও খুব বেশী নয়। সবচেয়ে ভাল লাগে এই জন্য যে, এখান থেকে ইরাবতী নদীটা দেখা যায়।

শরৎ : আমার আরও ভাল লাগছে এইজন্য যে, তোমার এই বাসা আমার বাসার এত কাছে। ছবি আঁকা শিখছি, যখন-তখন তোমার কাছে এসে জ্বালাতন করতে পারব তোমাকে। ইরাবতী নামে যে মেয়েটি তোমার মডেল তার নাম কি সত্যিই ইরাবতী, না তাকে ভালবেসে মনের মত ঐ ইরাবতী নামটা তুমিই তাকে দিয়েছ?

বা-থিন : তোমার অনুমান সত্যিই শরৎদা। ইরাবতী নদীকে আমি সত্যিই ভালবাসি। তাই আমার ঐ ভালবাসার মেয়েটিকেও ঐ নামেই ছবি আঁকি। আর, নামটা খুব পছন্দ হওয়ায়, ঐ ইরাবতী নামটাই ও নিয়েছে। এই মগ্‌গ নামকরা নর্তকী হয়ে পড়ায় ওর নামের চুক্তিটুক্তির সব ও এখন ঐ নামেই করে। রেঙ্গুনে নাচের বায়না ওর ঐ নামেই চলছে। ইরাবতীর নাচ হবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে নানা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনও দেখি। ইরাবতী অবশ্য বলে, তোমার ঐ দেওয়া নামটাতেই আমার কপাল ফিরে গেছে।

শরৎ : বাঃ, এটা শুনে খুব ভাল লাগছে। ইরাবতীকে তো আজ দুপুরে এখানে নিমন্ত্রণ রইল।

বা-থিন : হ্যাঁ শরৎদা, তুমি আসবে বলেই ওকে আসতে বলেছি। গেল বছর কলকাতা থেকে দুজনে জাহাজে রেঙ্গুনে ফেরার সময় তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। জাহাজের সেই চারদিনের পরিচয়েই কি করে আমাদের দুজনের মধ্যে এত বড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, সে-কথা ইরাবতীকে বলার সে-ও তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। বুদ্ধ-পূর্ণিমার পুজো-টুজো সেরে ওর এখানে আসবার সময় হয়ে গেছে। এলো বলে।

শরৎ : তুমি এখন কি ছবি আঁকছ বা-থিন?

বা-থিন : এই মাত্র একটা ছবি শেষ করেছি—গৌতম বুদ্ধের স্ত্রী গোপাদেবীর ছবি।

শরৎ : গোপা! বাঃ সুন্দর বিষয়টি তো! বোধহয় গৌতম বুদ্ধ রাজৈশ্বর্য ছেড়ে সত্যের সন্ধানে গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, গোপা অসহায়ভাবে তাঁকিয়ে স্বামীর এই গৃহত্যাগ দৃশ্য দেখছেন, তোমার ছবিটা কি এমনি একটা কিছু?

বা-থিন : তুমি ঠিকই অনুমান করেছ শরৎদা। আর তোমার এই অনুমানই বলে দিচ্ছে, তোমার ভেতরে কতবড় একজন চিত্রকর লুকিয়ে রয়েছে। দেখো, তুমি একদিন খুব বড় চিত্রকর হবে শরৎদা।

শরৎ : তাহলে বাঘ-মামা। গেল বছর তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরেই ছবি আঁকার প্রেরণা পেয়েছি। আমার ছবি আঁকা শেখাও পুরোই হচ্ছে তুমি। তবে যতটা কম তুমি আমাকে আমার বাড়ি নিয়ে অন্তত সত্তরটা মাস্টার ছবি আঁকা শিখিয়েছ, তাই না আমি ছবি আঁকতে সাহস পাচ্ছি। সে যাক, তোমার সেই গোপার ছবিটা দেখি?

বা-থিন : ছবিটা দেখবার কিছু নয় শরৎদা। কালই ছিলাম বেশ কিছুদিন। টেম্পেরা তাড়াতাড়ি শুকোয় না, প্রায় এই অবস্থা। এমন সময় শ্রীযুক্তের কাছ থেকে—উনি হলেন এক জমিদার এই বুদ্ধ-পূর্ণিমায় মঠে উৎসর্গ করার জন্য শ্রীবুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা অবলম্বন করে একটা ছবি আঁকবার জন্য আমাকে অর্ডার দেন। ছবিটা পছন্দ হলে তিনি হাজার টাকায় কিনবেন কথা হয়। ছবিটা পরশু শেষ হয়েছে, কাল ডেলিভারি দিয়েছি।

শরৎ : ছবিটা পছন্দ হয়েছে তো?

বা-থিন : তা হয়েছে। জমিদার মশাই তো ছবি দেখে একেবারে মুগ্ধ—অভিভূত। আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

শরৎ : বঃ—বাঃ—বাঃ—টাকা পেয়ে গেছ? কিন্তু হাজার?

বা-থিন : না শরৎদা, টাকাটা এখনো পাইনি।

শরৎ : পাওনি! কেন পাওনি? ছবি যখন জমিদারের মনের মত হয়েছে এবং ছবি যখন তিনি ডেলিভারিও নিয়েছেন, তখন টাকা না দেবার কারণ?

বা-থিন : ছবিটা তিনি আজ এই বুদ্ধ পূর্ণিমায় মঠে উৎসর্গ করবেন। কিন্তু উৎসর্গের পূর্বে মঠগুরুকে সেটা দেখাতে হবে। তিনি ছবিটা দেখে অনুমোদন করে অনুমতি দিলে তবে সেটা উৎসর্গ করা যাবে। জমিদার আমাকে কথা দিয়েছেন, ছবিটা উৎসর্গ হয়ে গেলেই তিনি আমার বাড়ি এসে ঐ তিন হাজার টাকা দিয়ে যাবেন। আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁর শুভাগমনের প্রতীক্ষা করছি। বরং বলব, তাঁর বিলম্ব দেখে এখন আমি অধীরই হয়ে পড়েছি শরৎদা। আজ তোমাকে আর ইরাবতীকে এখানে খেতে বলেছি। ঐ টাকা পেলে তবে বাজার হবে—রান্নাবান্না হবে। এ যে কি অস্বস্তিকর বিলম্ব, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ শরৎদা?

শরৎ : তা তুমি ভাবছ কেন বা-থিন? আমার বাসা তো কাছেই, আমি গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসছি।

বা-থিন : না না শরৎদা, প্রয়োজন নেই। লোকটিকে যতটা বুঝেছি, খাঁটি লোক বলেই মনে হচ্ছে। তবে বেশ কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে মনে হচ্ছে। আর এই বিলম্বটাই আমার শ্বাসরোধ করছে।

শরৎ : ইরাবতী তো এখনো এসে পড়েনি, তুমি ভাবছ কেন? তিনি এলে তবে না খাওয়া-দাওয়া! দরকার হলে তা লাঠাকুরের হোটেল থেকেও কিছু আনা যাবে। দরকার হলে আমিই গিয়ে নিয়ে আসব। তোমার লোকটিকে বরং বল আমাদের দু পেয়ালা চা করে দিক।

বা-থিন : সে-ও আমার কপাল দেখে, তার হয়েছে জ্বর। আজ দুদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। চা-আর কিছু খাবার আমি বাইরে থেকে কিনে আনছি। তুমি বরং যদি পার, আমাকে গোটা দশেক টাকা ধার দাও।

শরৎ : ধারের কথা বলে আমাকে লজ্জা দিওনা বা-থিন। সমুদ্রের বুকে বসে তুমি আমাকে বলেছ দাদা, আমি তোমাকে বলেছি ভাই। তোমার আমার মধ্যে ধারকর্জের কথা হলে সে-সম্বন্ধটা মিথ্যা হয়ে যাবে। এই নাও দশটা টাকা। তুমি চা নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ তোমার নতুন ছবির কাজ বসে বসে দেখছি।

(বা-থিনকে নোট দিলেন শরৎচন্দ্র)

বা-থিন : নতুন ছবি আমি এখনও ধরিনি শরৎদা, তবে শিগগিরই ধরব। আর তার নাম দেব—মরীচিকা।

শরৎ : মরীচিকা!

বা-থিন : হ্যাঁ, মরীচিকা। কেন যেন এখন মনে হয়, আমাদের জীবনটাই একটা মরীচিকা। আসছি।

(বা-থিন বাইরে গেল, এমন সময় নর্তকী ইরাবতীর প্রবেশ)

বা-থিন : শরৎদা, এই যে ইরাবতী এসে গেছে। ইরাবতী, এই আমার শরৎদা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জানো শরৎদা, ইরাবতী চট্টোপাধ্যায় নামটা উচ্চারণ করতে পারে না। তোমরা গল্প কর, আমি ছুটে যাচ্ছি আর আসছি। (বা-থিনের প্রস্থান)

ইরা : আপনি যখন বা-থিনের দাদা, তখন আমারও দাদা (শরৎকে অভিবাদন)

শরৎ : ভগবান তথাগত তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন। নর্তকী-রূপে তোমার আর চিত্রকররূপে বা-থিনের জয়-জয়কার হোক।

ইরা : বললেন বটে, কিন্তু আমার নাচ না দেখেই?

শরৎ : আজ একটু দেখব, সে আশা অবশ্যই করব। কিন্তু নিজের চোখে না দেখলেও বা-থিনের মুখে তোমার নাচের যে আভাস আমি পেয়েছি, মনের চোখে আমি তা দেখেছি—মুগ্ধ হয়েছি।

ইরা : বা-থিন তো খুব কম কথার মানুষ দাদা। আমার নাচের প্রশংসা অন্যের মুখেই শুনি, ওর মুখে আর কতটুকু শুনি! কথা বলতে এই কৃপণ আপনার ঐ বন্ধুটি।

শরৎ : তা মানি। কিন্তু ইরাবতী, চোখেরও তো একটা ভাষা আছে! সেটা সে ব্যবহারে কি করে?

ইরা : আমার কথা আপনাকে আর কি বলেছে দাদা?

শরৎ : তোমার মা-বাপ নেই। একটা বৌদ্ধমঠের দয়ায় তুমি লেখাপড়া আর নাচ-গান শিখে মানুষ হয়ে এখন নিজে বাসা করে নর্তকীর পেশায় নাম করেছ—এসব অবশ্যই বলেছে। কিন্তু আর কোন্ কথা সেটাও বলেছে।

ইরা : কি—কি বলেছে দাদা?

শরৎ : ও তোমাকে মডেল করে ছবি এঁকে চিত্রকর হিসাবে নাম করতে পেরেছে।

ইরা : বলেছে?

শরৎ : হ্যাঁ বলেছে। যা সত্য তা কেন বলবে না? কিন্তু এর চেয়েও বড় একটা কথা বলেছে।

ইরা : কি?

শরৎ : তোমার মডেলে ছবি আঁকতে আঁকতে ও নিজেই তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।

ইরা : এই দেখুন, এ-কথা কিন্তু আমাকে নিজ মুখে এখনও পর্যন্ত বলেনি।

শরৎ : মুখে হয়তো বলেনি, কিন্তু চোখের ভাষাতেও কি কোনদিন বলেনি ইরাবতী?

ইরা : (হাসোজ্জ্বল চোখে-মুখে) হ্যাঁ—না—তা—হ্যাঁ—

শরৎ : (হাসিয়া) বলেছে! কিন্তু সবচেয়ে বেটা বড় কথা সেটাও আমাকে বলেছে।

ইরা : কি! সেটা আবার কি?

শরৎ : তুমিও ওকে ভালবেসে ফেলেছ।

ইরা : (খিল খিল করিয়া হাসিয়া, তারপর হঠাৎ তাহা চাপিয়া) কিন্তু আমি তো তা ওকে এখনও বলিনি।

শরৎ : চোখের একটা ভাষা আছে—বলেছি তো।

ইরা : আপনি বেশ কথা বলেন কিন্তু! বা-থিন আমাকে বলেছেন, আপনি নিশ্চয়ই কবিতা-টবিতা কিছু লেখেন।

শরৎ : সেটা একেবারে সত্য নয়। আমার সম্বন্ধে এরূপ সব মিথ্যা আর কি কি বলেছে, বল দেখি শুনি?

ইরা : টাকার অভাবে আপনি কলেজে পড়া শেষ করতে পারেন নি, বা-বাপ মরে যেতে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে গিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়েছেন, দেশে ভাল কোন চাকরি-বাকরি না পেয়ে রেঙ্গুনে আপনার মেশোমশাই অঘোরবাবুর তরসায় ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসেছেন ছ' বছর আগে এই বর্মা মুলুকে। অঘোরবাবু মারা যাওয়ায় তাঁরই আপনার একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে যান। সেই থেকে আপনি সেই চাকরিতেই রয়েছেন। বাবসা-ট্যবসা, বিয়ে-থা কিছু করেননি, করার ইচ্ছাও নেই। খুব মজলিসি লোক, গান-বাজনার ওস্তাদ। রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে সবার খুব প্রিয়। কিন্তু ডাউনটাউনে না থেকে বাস করেন সহরতলিতে মিস্ত্রি পল্লীর একটা ছোট বাড়িতে—মাঠের মধ্যে—নদীর ধারে।

শরৎ : খোঁজ নেওয়া যে। আর?

ইরা : আর আবার কি! এই তো ঢের।

শরৎ : না না, আর কি কেমন, বল না।

ইরা : বই পড়তে খুব ভালবাসেন। কিন্তু হাত ভর্তি হওয়ায় তা ছেড়ে দিয়ে আজকাল ছবি আঁকা নিয়ে মেতেছেন। একটি মেয়ের অয়েল পেন্টিং ছবি এঁকেছেন, সেটা নাকি খুব ভাল হয়েছে। মেয়েটার নামও শুনেছিলাম, কিন্তু কটমটে নাম, মনে নেই। বলুন তো নামটা?

শরৎ : বা-থিন আমার একটা ছবিরই প্রশংসা করেছে—এক তপস্বিনী—যাকে তোমরা বল ভিক্ষুণী—নাম মহাদেবতা। আমাদের পুরাণের একটি চরিত্র—না না, সীতা নয়, এক রাজকন্যার সখি। তার গল্প পরে বলব। কিন্তু বা-থিন আর কি বলেছে?

ইরা : আর যা বলেছেন, সে আমি বলব না।

শরৎ : আমি খুব মদ খাই, বলেছে?

ইরা : (দুষ্টু হাসি হাসিয়া) হুঁ।

শরৎ : যেখানে-সেখানে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি করি, বলেছে?

ইরা : হুঁ, তা-ও বলেছেন।

শরৎ : বা-থিনের তো ওসব কিছু একেবারেই নেই।

ইরা : না, তা নেই।

শরৎ : তবুও আমার সঙ্গে ওর এত ভাব কেন তুমি জিজ্ঞাসা করনি?

ইরা : নিশ্চয় করেছি।

শরৎ : কি বলেছে?

ইরা : সেটা নাকি আপনার সঙ্গে একটু ভাল করে পরিচয় হলেই আমি জানতে পারব—বুঝতে পারব—ধরতে পারব। আপনার মধ্যে কি যেন একটা যাদু আছে, ও আমাকে বলেছে।

শরৎ : সাবধানে থাকতে বলেনি?

ইরা : না তো!

শরৎ : কেন! আমি যাদুকর, কখন মন্তরে বিদ্যে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাই।

ইরা : ও!

শরৎ : হ্যাঁ।

ইরা : না, তা আপনি পারবেন না।

শরৎ : কেন পারব না বল তো? আমি যা যাদু জানি?

ইরা : জানলেও আপনি পারবেন না। আপনার মনটা বাঁধা পড়ে রয়েছে আপনার দেশে। ১৪ বছর বয়েসে কোন একটী গুণী ছেলে বিধবা হয়েছে, আপনি তাঁরই প্রেমে পড়েছেন। সে প্রেম নাকি এমন প্রেম, যা বিয়ের চেয়েও অনেক বড়। যার কোন বাঁধন নেই, কিন্তু শাসন আছে। এটুই নাকি আপনার রক্ষা কবচ।

শরৎ : কে বলেছে?

ইরা : আপনার বন্ধু ঐ বা-থিন।

(হোটেলের একটা ছোকরা চাকরের হাতে চা-খাবার ইত্যাদি নিয়ে বা-থিনের প্রবেশ)

বা-থিন : জমিদার আসেনি?

শরৎ : না তো।

বা-থিন : (বয়কে) চা-টা আমাদের টেবিলে দিয়ে, খাবারটা খাবার-ঘরে রেখে দিয়ে চলে যা।

(বয় তাহাই পালন করিল)

বা-থিন : আলাপ-টালাপ হয়েছে তো?
ইরা : তা খুবই হয়েছে। কিন্তু যাদু-টাদু এখনো দেখান নি।
বা-থিন : মানে!
ইরা : তুমি বলেছিলে না, শরৎদা যাদু জানেন, তাঁকে যাদুকরই বলা চলে।

(সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

বা-থিন : কিন্তু জমিদার মশাই কি কাণ্ডটা করলেন-দেখছ?
ইরা : কেন, তোমাকে টাকা দিয়ে যান নি? আজই সকালে তো বাসায় এসে তোমাকে তিন হাজার টাকা দিয়ে যাওয়ার কথা!
বা-থিন : সকাল তো কখন হতে চলেছে, কিন্তু এলেন কই?
ইরা : আসবেন—আসবেন। ছবিটা তো তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে, বারবার তোমাকে বলেছেন। তাছাড়া, তুমি আমাকে বলেছিলে লোকটি আর আর জমিদারদের মত নিরেট নন। টাকা আছে—রুচিও আছে। আর, বেশ ভদ্রলোক!
বা-থিন : মিথ্যা নয়। আমিও তো তাই ভাবছি। এ রকমটা যে হবে তা আশাই করিনি। তবে কি মঠগুরু ছবিটা পছন্দ করেননি!
ইরা : না-না, ঐ মঠগুরুকে তো আমি জানি। ঐ মঠে একদিন আমি শ্রীবুদ্ধের সামনে প্রণামের নাচ নেচেছি। দেখে খুবই খুশি হয়ে আমাকে কত আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর কথাতে স্পষ্ট বুঝেছিলাম, তিনি নাচ খুব ভাল বোঝেন, তাঁর আশীর্বাদের এমনি গুণ যে সেই দিনই নাচের খুব বড় একটা বায়না পেয়েছিলাম। সেদিন আমার খুব টাকার দরকার ছিল। মনে-প্রাণে শ্রীবুদ্ধকে ডেকেছিলাম সেদিন, ঐ বিপদ থেকে যাতে উদ্ধার পাই।
শরৎ : এখানেও তো শ্রীবুদ্ধের মূর্তি দেখছি। তা সেই প্রণামের নাচটি এখানে নাচলে বোধ করি সকলের মনস্কামনাই পূর্ণ হয়।
ইরা : আমি নাচব।

(ইরাবতী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য সুরু করিল। অপরূপ সেই নৃত্যের শেষভাগে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পূর্বোক্ত জমিদার উ-নু আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং নৃত্যটি দেখিতে লাগিলেন। নৃত্য শেষ হইল।)

ইরা : ঐ দেখ জমিদার মশাই এসে গেছেন।

(জমিদার ইতিমধ্যে তার হাতের ছবিটির কাগজের মোড়ক খুলিয়া ফেলিয়াছেন এবং ছবিতে গোপার মুখের সহিত ইরাবতীর মুখের সাদৃশ্য মিলাইয়া দেখিতেছেন।)

বা-থিন : ছবিটা আপনার হাতে কেন! মঠে দেননি?
উ-নু : কি করে দেব? ওরে নরাধম পাপিষ্ঠ, তুমি কি মহাপাপ করেছ জানো? তোমাকে আমি অর্ডার দিয়েছিলাম, শ্রীবুদ্ধ-জায়া লোকমাতা গোপা দেবীর ছবি আঁকতে। তা না, একে তুমি এঁকেছ তোমার প্রেয়সী এই নর্তকীর মুখখানি। মঠগুরুর কাছে আজ এই ছবি দিতেই তিনি ক্রোধে আগুন হয়ে জ্বলে উঠলেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন—এ কি সর্বনাশ! লোকমাতা গোপা দেবীর মুখ আঁকতে গিয়ে এঁকেছে তুমি নর্তকী ইরাবতীর মুখ? এই মঠ থেকে এখনি দূর হ। মঠের বাইরে গিয়ে এই অপ্রদ্ধেয় ছবি এখনি ভস্মীভূত কর।

(কণিক নিস্তব্ধতা)

শরৎ : ছবিখানি আমি একবার দেখতে পাই?
উ-নু : দেখুন। ঐ নর্তকীর মুখের বদলে ঐটা বুদ্ধমাতার মুখ। —আপনি কে মশাই আমি জানিনা, কিন্তু আপনি সাক্ষী থাকুন। (ছবিটি শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়া) কি, দেখেছেন?
শরৎ : দেখেছি।
উ-নু : মিলছে?
শরৎ : হুবহু মিলছে।
উ-নু : আপনার নাম?
শরৎ : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
উ-নু : কি করা হয়?
শরৎ : সরকারী চাকরি করি।
উ-নু : ছবিটা মশাই এই বাড়ির পথের উপর আপনাদের চোখের সমক্ষে আমি আগুনে জ্বেলে পোড়াব। আপনারা দেখবেন আসুন।
বা-থিন : না খুশি করতে পারেন। কিন্তু তার আগে আমার প্রাপ্য তিন হাজার টাকা দিতে হবে। দিন।
উ-নু : টাকা! ধর্মের কল বাতাসে নড়ছে আপনি, আবার চাইছ টাকা?
বা-থিন : সে-সব আমি জানি না। আপনি বলেছিলেন, ছবিটা আপনার পছন্দ হলে আপনি আমাকে তিন হাজার টাকা দেবেন। বলেছিলেন কিনা?
উ-নু : বলেছিলাম—কিন্তু—
বা-থিন : দাঁড়ান। ছবি আমি আপনাকে দিলে, আপনি বলেছিলেন কিনা, ছবিটা আপনার খুব পছন্দ হয়েছে? যদি আপনি বোদ্ধ হন, তবে এই বুদ্ধ-পূর্ণিমার পুণ্যদিনে মিথ্যা বলবেন না। মিথ্যা বললে, নরকেও আপনার স্থান হবে না মনে রাখবেন। বলুন, বলেছিলেন কিনা?
উ-নু : বলেছিলাম। কিন্তু মঠগুরুর অনুমোদন হলে টাকা দেব, তাও বলেছিলাম।

বা-থিন : কিন্তু যেদিন ছবি তৈরি করার অর্ডার আমাকে দেন, সেদিন ওসব কথা একেবারেই হয়নি। আপনার পছন্দ হওয়াটাই ছিল একমাত্র সর্ত। কাজেই, আপনি আমাকে টাকা দিতে বাধ্য।
উ-নু : না! আমি টাকা দেব না। শুধু তাই নয়, এই ছবি এই বাড়ির সামনের ঐ পথে নিয়ে গিয়ে লোক জড়ো করে ঐ নাচ-ওয়ালিকে দেখিয়ে দেব—আর সেই সঙ্গে এই ছবির মুখটিও দেখাব। ছবি তো আগুনে পোড়ানই হবে, নাচওয়ালিও হয়তো বাদ যাবে না। কে আমাকে কে বাধা দেয়। ধর্মের হবে এতবড় অপমান?
শরৎ : কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা দয়া করে শুনুন জমিদার মশাই।
উ-নু : না, আমি কোন কথা শুনব না।
শরৎ : (রুখিয়া গিয়া) আপনাকে শুনতেই হবে। এই ছবিটাতে স্বয়ং শ্রীবুদ্ধ অঙ্কিত রয়েছেন—দেখছেন? আপনি আজ এই বুদ্ধ-পূর্ণিমার পুণ্য দিনে শ্রীবুদ্ধকেও কি আগুনে পোড়াতে চান?
উ-নু : হ্যাঁ!
শরৎ : হ্যাঁ। ধর্মের উন্মত্ততায় কত বড় অধর্ম করতে আপনি উদ্যত হয়েছেন, সেটা কি একবার ভেবে দেখবেন?
উ-নু : হ্যাঁ।
শরৎ : হ্যাঁ। আর আজ এই পূর্ণিমার প্রতিটি সঙ্ঘে, প্রতিটি মঠে, শ্রীবুদ্ধের কোন মন্ত্রটি সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে? অহিংসা পরম ধর্ম। শ্রীবুদ্ধের এই মূল মন্ত্রটিই কি নয়?
উ-নু : হ্যাঁ।
শরৎ : তা যদি হয়, তবে আপনার কর্তব্য-অকর্তব্য আপনি নিজেই ঠিক করুন। (কণিক নিস্তব্ধতা)
উ-নু : বাঙালীবাবু, আপনি আমার অভিবাদন নিন। আপনি আজ আমাকে এক মহাপাপ থেকে রক্ষা করেছেন। ছবিটি আমি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারলাম না, এ বোধ আমার থাকলে মন্দ, কিন্তু ছবিটি আমার চোখে আশ্চর্য সুন্দর লেগেছে। আমার ইচ্ছা

হচ্ছে. ছবিটি আমার বৈঠকখানায় টাঙিয়ে রাখি। কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। আমাদের ধর্মগুরুরা যদি বিরক্ত হন।

শরৎ : আপনি ঐ মঠগুরুকেই জিজ্ঞাসা করে আসুন. ঐ মঠেই শ্রীবুদ্ধের সম্মুখে এই নর্তকী ইরাবতীর প্রণাম-নৃত্য দেখে তিনি পরম সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে আশীর্বাদ করেছেন কিনা?

উ-নু : হ্যাঁ করেছেন। ছবিটা দেখেই এই ইরাবতীর কথাই তাঁর সর্বপ্রথম স্মরণ হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন—ইরাবতী তাঁর আশীর্বাদধন্যা হলেও, পরমপূজ্যা লোকমাতা গোপা দেবীর শ্রীমুখে প্রতিফলিত হতে পারে না। সেটা হবে অনাচার—সেটা হবে পাপ।

শরৎ : আমি যদি বলি, লোকমাতা গোপা দেবীর শ্রীমুখখানি দেখতে ঠিক এই ইরাবতীর মতই ছিল। কে কি করে প্রমাণ করবেন, আমার এই কথা মিথ্যা? বৌদ্ধশাস্ত্র আমিও কিছু পাঠ করেছি জমিদার মশাই। বুদ্ধদেব মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁদের কোন চিত্র বা মূর্তি তৈরি হয়নি। ওটা ধর্মের নিষেধই ছিল। গৌতম বুদ্ধ বা গোপাদেবীর দেহাবসানের বহু যুগ পরে চিত্রকরের কল্পনায় অঙ্কিত হয় তাঁদের চিত্র। ভাস্করের কল্পনায় খোদিত হয় তাঁদের মূর্তি। শ্রীবুদ্ধের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর ভক্তরা সেইসব কল্পিত চিত্র আর মূর্তিরই পূজো করে আসছেন। তাই আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন—গোপাদেবীর মুখখানি যে এই ইরাবতীর মুখখানির মত ছিল না, আজ এই বুদ্ধ-পূর্ণিমায় একথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন?

উ-নু : ধন্যবাদ বন্ধু, আমার তোমায় অভিবাদন জানাচ্ছি। ও আমার মনে আর কোন দ্বিধা নেই—কোন সন্দেহ নেই—কোন শঙ্কা নেই। এই ছবিই আমার গৃহদেবীতে আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজা করব—তা যে যাই বলুক আজ সপ্তাহ আমার হাতে তোমাদের পরীক্ষার পরীক্ষিত হল আমি হব। বা-থিন: এই নাও তোমার দক্ষিণা—পুরো হাজার টা (টুকরো হাজার টাকার নোট সর্বসমক্ষে হস্তান্তর করা) স্বয়ং ম গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

(বলিতে বলিতে জমিদার উ-নু প্রস্থান করিল

ইরা : তুমি—তুমি—যাদু জানো অরবিন্দ—সত্যিই তুমি যাদু জানো

অরবিন্দ : যাদু আমি জানি না ইরাবতী—জানো তুমি। আমি বলি—হাজার বছর পূর্বে এক লোকমাতা গোপাদেবী একদা গ্রহণ করেছিলেন, সেই গোপাদেবীই জন্মান্তরে পুরণ করতে এ আমার বন্ধু এই বা-থিনের তপস্যায় আজ আবির্ভূতা এই ইরা রূপে। কার সাধ্য আছে, আমার এই সিদ্ধান্তকে প্রতিপন্ন করে?

ইরা : শরদো. এসব আপনি কি বলছেন?

বা-থিন : শরদো. মেয়েটার মাথা খারাপ করে দেও না। বন্ধু যে খাবার আজ এসেছে, আমরা সকলে তার সদ্ব্যবহার করি। এস, আর দেরী নয়।

(বা-থিন দুই হাতে দুইজনের ধরিয়া লইয়া ঘরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন)

নির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা : রবীন্দ্র- প্রসঙ্গ; সাহিত্য-সমালোচনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ৫-৫০; অজিত চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ২৫-০০; সুধাকান্ত রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্মৃতিকথা ৬-০০; ডঃ সুশীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০-০০; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি ১৬-০০; সীতা দেবী : পুণ্যস্মৃতি ১০-০০; চম্পা মজুমদার : রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস ৩২-০০; ডঃ সত্যব্রত দে : রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা ২২-০০; ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ : রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায় ৮-০০; গৌরীপ্রসাদ ঘোষ : রবীন্দ্র কাব্যের শিল্পরূপ ৭-০০; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-স্মৃতিকথা ৪-০০; হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব ৮-০০ দুই রবীন্দ্র ৬-০০; ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : পদাবলীর রসতাৎপর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ ৫-০০; সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ১০-০০; সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয়তা ৩-০০; ধীরেন্দ্র দেবনাথ : রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন যাত্রা ৬-০০; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্র সম্বন্ধে ১০-০০; শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : শিশু ও রবীন্দ্রনাথ ৩২-০০

প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্র-সংগীত চয়নিকা ১/২ ৭-৫০ / ১০-০০; রবীন্দ্র-সংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা ১/২/৩ ৪-০০/ ৭-০০/৭-০০; শুভ গ্রন্থপ্রকাশ : রবীন্দ্র সংগীতের ধারা ৪-০০

ডঃ ভবতোষ দত্ত : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন-চরিত ও কবিত্ব (বঙ্কিমচন্দ্র) ২০-০০ অবনীন্দ্র ১০-০০ বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সং) ৮-০০; নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : রামকমল রজনীকান্ত ১০-০০; ডঃ নরেশ গুহ : পদাতিকের ডায়েরীর পাতা ও মোহিতলাল ১৭-০০; প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দ জিজ্ঞাসা ৩৫-০০; অমলেন্দুলাল ঠাকুর প্রমুখ সম্পাদিত (ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সংকলিত) ১০-০০; ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রকৃতি চেতনা ১২-০০; প্রমিলা সরকার ভট্টাচার্য : বঙ্গে চণ্ডীদাসের স্বীকারোক্তি ১০-০০; রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন ১১-৭৫; বঙ্গ ভাষালোচনা : বঙ্গদর্শন ও বাঙালির জনন-সাধনা ১৬-০০; ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ-কবিত্ব ও সাধনা ৮৭-০০; ডঃ অরুণ কোলে : রাজনারায়ণ বসু—জীবন ও সাধনা ৩০-০০; ডঃ সুবোধচন্দ্র সেন : বাংলা উপন্যাসের ইতিকথা ১২-৭০; মণি বাগচি : আচার্য রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাধনা ১৬-০০। অমলেন্দু বসু : রবীন্দ্রনাথ ১৮-০০; গৌরহরি সেন : শরৎচন্দ্র—বেদ ও সমাজ ৫-০০ ॥

জিজ্ঞাসা

কলিকাতা ১ ॥ কলিকাতা ২৯

।। দ্বিতীয় কান্ড ।।

(রেঙ্গুনের বিখ্যাত এ্যাডভোকেট ব্রজবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠকখানা। কাল : সন্ধ্যা। কৃষ্ণবাবু আসিয়া বসিলেন. ভৃত্য কেষ্টধন তামাক দিল। কৃষ্ণবাবু তামাক সেবন করিতে করিতে একটি মামলার-ব্রিফ দেখিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণ : (ভৃত্যকে) বাবুরা সব হলঘরে বসেছেন?

ভৃত্য : হাঁ বাবুমশাই, বসেছেন।

কৃষ্ণ : কজন?

ভৃত্য : তা নতুন জামাইবাবু আর তার সঙ্গীটি—শালাবাবু-ই হবেন বোধ করি, এদের দুজনকে নিয়ে সাত-আটজন হবেন বাবুমশাই।

কৃষ্ণ : ওদের চা-জলখাবার দিবি।

ভৃত্য : কি জলখাবার দিতে হবে বাবুমশাই?

কৃষ্ণ : আরে সে-ও কি আমাকে বলতে হবে। তোর মা-মশাইকে জিগ্যেস কর।

ভৃত্য : মা-মশাই তো এখানে নেই বাবুমশাই।

কৃষ্ণ : ওহো, এই দেখ! এ যে কি বিপদ হয়েছে, মামলার কথা ভাবতে গেলে বাড়ির কথা কিছুই মনে থাকে না। আবার বাড়ির কথা ভাবতে গেলে মামলার কথা কিছুই মনে পড়ে না। তা তোমার মা-মশাই তো মান্দালে থেকে আজই ফিরবেন কথা ছিল না?

ভৃত্য : না বাবুমশাই। শনিবারই ফিরবেন করে গেছেন। তবে এ শনিবার নয়, পরের শনিবার।

কৃষ্ণ : দেখ মাধি, আমার ঘাড়ে অতিথি সেবার সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে তিনি চলে গেলেন সমাজসেবার কাজে মান্দালেতে! এক-ডোড়া বরকনে আর এক নিতম্বের আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কি ফাঁসাতেই না আমায় ফেলে গেছেন! ওরে, কলকাতার সেই যে নতুন বর-কনে এসে অতিথি হয়ে রয়েছে, ওদের একটু ভাল করে দেখাশোনা করছিস তো?

ভৃত্য : সে আপনি কিছু ভাববেন নাবাবুমশাই। আমরাও ওঁদের দেখা-শোনা করছি, ওঁরাও আমাদের দেখা-শোনা করছেন।

কৃষ্ণ : সে কি রে!

ভৃত্য : হ্যাঁ বাবুমশাই। আজ ঐ নতুন জামাইবাবুই তো আমার সঙ্গে বাজারে গিয়ে কইমাছ কিনে, এটা কেনো—সেটা কেনো। পাঁচ টাকার কাঁচা বাজারে দশ টাকা লেগে গেছে। আর বউ-ঠাকরুণটি তো মা-মশাই-এর সব কাজ হাতে নিয়ে ফেলেছেন। তরকারি কোটা, রান্নাবান্না থেকে সুরু করে ঘর-দোর গোছানোর সব কাজ নিজে হাতে করছেন। বাধা দিতে গেলে কইলেন, বসে থাকতে পারি না কেষ্ট। মাসিমা যখন নেই, এসব তো আমারই কাজ।

কৃষ্ণ : ভাল—ভাল। তা হলঘরের চা-জলখাবারটা তোর ঐ মোটাবুদ্ধিকেই দিতে বল না—কেষ্টধন।

কেষ্ট : ঐ যে তিনি স্বয়ং এসে গেছেন। আপনি-ই যা কইবার কয়ে দিন।

(গায়ত্রীর প্রবেশ। তার হাতে একটি থলে মকরধ্বজ ও এক গ্লাস দুধ)

গায়ত্রী : মেসোমশায়, মাসিমা আমাকে বলে গেছেন, সন্ধ্যায় আপনাকে মকরধ্বজ আর দুধ দিতে।

কৃষ্ণ : দাও।

(গায়ত্রী মকরধ্বজের থলে ও দুধের গ্লাস দিল দিল)

কৃষ্ণ : এই দেখ, তোমার নামটাও আমি ভুলে গেছি।

গায়ত্রী : আমার নাম গায়ত্রী।

কৃষ্ণ : আরে গায়ত্রী নাম তো আমি রোজ জপ করি। এ নাম তো আমার ভোলা উচিত ছিল না মা। বত বুড়ো হচ্ছি তত ভুল বাড়ছে। আর, তোমার স্বামীর নামটি যেন কি?

গায়ত্রী : সে আমি বলতে পারব না মেসোমশাই।

কৃষ্ণ : ও হাঁ, তাও তো বটে।

কেষ্ট : নন্দদুলালবাবু। নামটি বড় ভাল। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম-এর একটি। যেতই গোরুবেলায় গান গাই।

কৃষ্ণ : তবে আর কি, তুই তো তবে গেলি। কিন্তু শোন মা। হলঘরে কয়েকজন বাঙালীবাবু এসে বসে আছেন। আমাদের একটা মিটিং হবে। ওদের চা-জলখাবার দেওয়া একটা রেওয়াজ আছে এ বাড়িতে।

গায়ত্রী : মাসিমা আমাকে সব বলে গেছেন। নারকেল কোরা আর চিঁড়ে ভাজা চা আর জল-খাবার বর্মি চাকরটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

কেষ্ট : এটা আপনার ভুল হয়েছেন বৌ-ঠান। হলঘরের চা-টা, তামাক-টামাক আমিই দিয়ে থাকি।

গায়ত্রী : এখন থেকে তোমাকে দিয়েই পাঠাব। মেসোমশায়, আপনাকে একটু দেব?

কৃষ্ণ : না মা, তোমার মাসিমার হুকুম আমার খাওয়া একেবারে মাপা। আচ্ছা কেষ্ট, তুই হলঘরে ওদের তামাক-টামাক যা দেবার দে।

কেষ্ট : ও আমাকে কইতে হবেনি। সেজেই রেখেছি, গিয়ে দিচ্ছি।

(কেষ্ট প্রস্থান করিতেছিল, এমন সময় শরৎচন্দ্র আসিতেছিলেন)

কেষ্ট : (শরৎকে) না না, এ ঘরে না। আপনাদের সবাই বসেছেন, ঐ হলঘরে ঐ ঘরেই আপনাদের এখন তামাক দেওয়া হবে।

শরৎ : আঃ, কেষ্ট।

(কেষ্টর প্রস্থান)

কৃষ্ণ : এই যে, কি যেন তোমার সেই নামটা?

শরৎ : আজ্ঞে শরৎচন্দ্র।

কৃষ্ণ : হ্যাঁ-হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র। তা শরৎ, আজ আসতে তোমার দেরী হল যে?

শরৎ : আমাদের বস্তিতে একটা চীনা মিস্ত্রি মারা গেছে, তার সৎকার করে এলাম। কিন্তু হঠাৎ এই জরুরী তলব কেন কৃষ্ণদা?

কৃষ্ণ : (গায়ত্রীকে দেখাইয়া) এই এদের জন্য।

গায়ত্রী : আমি ভেতরে যাচ্ছি মেসোমশায়।

কৃষ্ণ : না না, তুমি ভেতরে যাবে কেন? কি যেন তোমার নাম?

গায়ত্রী : গায়ত্রী।

কৃষ্ণ : হ্যাঁ হ্যাঁ, রোজ যা জপ করি। কি হে তুমিও তো কর?

শরৎ : বামনের ছেলে যখন, করাই উচিত। (গায়ত্রীর দিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ, তা করি। (গায়ত্রী মাথা নীচু করিল)

কৃষ্ণ : হ্যাঁ, এ হল গায়ত্রী আর এর স্বামী—কি নাম বললে—হ্যাঁ, ঐ যে কৃষ্ণের শত নামের এক নাম। আচ্ছা, সে পরে বলব এখন। আমার এই নাম নিয়েই যত বিপদ, কিন্তু মনে থাকে না। ফাঁক পেলেই তাই নিজের নামটা বার বার আওড়াই—কৃষ্ণবিহারী মুখার্জী কৃষ্ণবিহারী মুখার্জী—কৃষ্ণবিহারী মুখার্জী। তয় হয়, নিজের নামটাও ভুলে না যাই। তাহলেই তো গেছি। কিন্তু জানো, কোর্টে গেলেই আর কোন ভয় হয় না। মক্কেলদের নামগুলো তো হরিনামের মালা হয়ে থাকে। তা কি যেন বলছিলাম—

শরৎ : এরা স্বামী-স্ত্রী—

কুঞ্জ : হ্যাঁ এরা স্বামী-স্ত্রী, সদ্য-বিবাহিত-স্বামী-স্ত্রী। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রেঙ্গুনে এসেছেন। কার কাছে নাকি শুনেছেন, এখানে অঢেল চাকরি। তা সে একদিন ছিল বটে, যখন বাঙালীরা এখানে এলেই চাকরিবাকরি পেত। এই তুমিই তো কয়েক বছর আগে এক কাপড়ে, খালি পকেটে রেঙ্গুনে এসে তোমার এই মেসো অঘোর চাটুজ্যের বাড়িতে উঠে পড়ে গেলে। অঘোর চাটুজ্যে ছিল আমাদের বাঙালী সমাজের মাথা। সে মরা বেঁচে এখন সেই ভার-দায়িত্ব তোমরা চাপিয়েছ আমার ঘাড়ে। কিন্তু আমার হাত-পা তো তেমনই হে। তা এই নববিবাহিত দম্পতিটি তুলিয়ে দেবার জন্য তোমাদের আজ ডেকেছি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই লেখাপড়া মোটামুটি ভালই জানেন। বন্ধুটিও কেরানীগিরি করতে পারবেন। তবে একটু মুস্কিল : তিনজনে নাকি একই সঙ্গে ঘর-সংসার করবেন। তা এদের জন্য সবার আগে চাই একটা বাসা। সেখানে গিয়ে এখনি উঠতে পারে। আর চাকরি তো চাই-ই। বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে বল। কথাটা সর্বদা বলে থাকেন তোমার বৌদি। তা ঠিকই বলে থাকেন, কি বল হে নন্টচন্দ্র?

শরৎ : আজ্ঞে, আমার নাম শরৎচন্দ্র।

কুঞ্জ : হ্যাঁ হ্যাঁ শরৎচন্দ্র। ভুলে-ভালে থাকে তোমার অনেক নষ্টামিও শুনি কিনা। সেইটেই মনে পড়ে আগে। তা হলঘরে গিয়ে বস, আমি এই মামলার নথিটা দেখেই তোমাদের ডাকছি। তোমরা হলঘরে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা সুরু করে দাও। আচ্ছা, তুমিও যাও সাবিত্রী, তোমার কাজে যাও।

শরৎ : আজ্ঞে ওর নাম আপনি বলছিলেন, গায়ত্রী। যে নাম জপ করে থাকেন।

কুঞ্জ : ও হ্যাঁ গায়ত্রী। আর তুমি যখন নামটা তোলনি, তুমি তো কম নও! খুসি হলাম হে, খুসি হলাম। এস।

(শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু গায়ত্রী কুঞ্জবাবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)

কুঞ্জ : না না, তুমিও এখন যেতে পার। (কুঞ্জবাবু নথির কাগজটায় মন দিলেন এবং হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন) এটা দেখছি একেবারে ক্লিয়ার কেশ অব চিটিং—জলজ্যান্ত জোচ্চুরি।

গায়ত্রী : আমিও তাই বলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি বাবা।

কুঞ্জ : কি বলবার জন্য?

গায়ত্রী : এটা জলজ্যান্ত একটা জোচ্চুরি।

কুঞ্জ : আমার এই কেশটার কথা বলছিলাম। এ যা দেখছি, ঐ আসামীকে পাঁচ বছর আমি ঘানি টানিয়ে ছাড়ব। কিন্তু তুমি এই জোচ্চুরির কথা জানলে কি করে?

গায়ত্রী : আমি আপনার ও কেশ-টেশের কথা জানি না মেসোমশাই। আমি আমাদের নিজেদের কথাই বলছিলাম।

কুঞ্জ : নিজেদের কথা মানে?

গায়ত্রী : ঐ নন্দদুলাল রায়, ও কোনকালেই আমার স্বামী নয়। আমি কলকাতায় ভবানীপুরের এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা।

কুঞ্জ : বিধবা।

গায়ত্রী : হ্যাঁ মেসোমশাই। বিধবা হয়ে আমার বাপের বাড়িতে এসে যখন আশ্রয় নিই, তখন ঐ নন্দদুলাল আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।

কুঞ্জ : কি রকম, কি রকম অতিষ্ঠ, কতটা অতিষ্ঠ?

গায়ত্রী : নিজেই ওর সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে দুর্নাম রটিয়ে দেয়। আমার বাবা রেগে গিয়ে আমাকে একদিন দা নিয়ে কাটতে আসে। সেদিন ঐ নন্দদুলালের হাত ধরেই পালিয়ে গিয়ে আমাকে জীবন রক্ষা করতে হয়। তারপর ও আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে রেঙ্গুনে। আমাকে ওর স্ত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছে সর্বত্র। জাহাজে আলাপ হয়েছে ওই পাঁচকড়ির সঙ্গে। ছেলেটির হাতে কিছু টাকা আছে, তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। রেঙ্গুনে এসে শুনেছে, আপনি এখানে নবাগত বাঙালীদের আশ্রয় দেন। তাই আমাদের নিয়ে আপনার এখানে উঠেছে। আমরা আসতে না আসতেই মাসিমা চলে গেলেন হাসপাতালে। তাঁকে এসব কিছু বলবার সুযোগ না পেয়ে আজ আপনাকেই বলছি। আপনার এই বাড়িতে এই প্রথম একঘরে ও আমার সঙ্গে থাকতে দেবেছে। এ দুটো রাত যে আমার কিভাবে কেটেছে, সে বলবার নয়—সে বলবার নয়। আজও যদি ওর সঙ্গে একই ঘরে শুতে হয় বাবা—তবে আর আমার রক্ষা নেই—রক্ষা নেই।

কুঞ্জ : তুমি বলছ কি—তুমি বলছ কি মা? আমি তোমার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমার ঘরে এমন অনাচার। ঐ পাপিষ্ঠ নরপশুকে আমি শেষ করে দিচ্ছি। এমন আমি কোর্টের অ্যাডভোকেট। (চিৎকার করিয়া) কেষ্ট, কেষ্ট, শিগগির শুনে যা। এই হারামজাদা, শুনতে পাচ্ছিস না? শিগগির শুনে যা। কেষ্ট—কেষ্ট—

(ছুটিয়া আসিল কেষ্টধন)

কুঞ্জ : হলঘরের বাবুদের গিয়ে বল, এ ঘরে আগুন লেগেছে। শিগগির এখানে সবাইকে ছুটে আসতে বল।

কেষ্ট : আগুন! কোথায় আগুন?

কুঞ্জ : ওরে হারামজাদা, যা বলছি তাই কর। শিগগির ওদের ডেকে আন। তারপর দেখবি, কোথায় আগুন।

কেষ্ট : আগুন লেগেছে—আগুন লেগেছে—বাবুরা শিগগির এস—

(বলিতে বলিতে কেষ্ট ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কুঞ্জবাবু কাঁপিতে লাগিলেন।)

গায়ত্রী : বাবা—বাবা, আপনি এমন উত্তেজিত হবেন না বাবা। মাসিমা বলে গেছেন, আপনার শরীর ভাল নয়। আপনার জন্য আমার যে বড় ভয় করছে বাবা।

কুঞ্জ : না না, সরে দাঁড়াও। আমি এখন কারো বাবাও নই—মামাও নই। কোর্টে দাঁড়িয়ে যেমন বিচারের দাবি করি, আজ বাঙালী সমাজের কাছে সেই বিচারের দাবি করছি আমি।

ইতিমধ্যে হলঘর হইতে শরৎ, গিরিন সরকার, হরিহর চক্রবর্তী, নিবারণ মুখোপাধ্যায়, সরেন মান্না, শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়, বঙ্গচন্দ্র দে, নন্দদুলাল রায়, পাঁচকড়ি দাস, কেষ্ট সকলে হুড়মুড় করিয়া এখানে ছুটিয়া আসিলেন। সকলের মুখেই কিছু না কিছু চিৎকার—কোথায় আগুন—জল আনো—জিনিসপত্র সরাও—কি, আগুন লাগল—কেউ পোড়েনি তো—ইত্যাদি রব।)

শরৎ : এই তো আমি এইমাত্র এখান থেকে গেলাম। কোথায়—কি করে আগুন লাগল?

বঙ্গচন্দ্র : আগুনের কথা বওন যায় না। স্বর্ণলঙ্কাতেও আগুন লেগেছিল।

গিরিন : নির্ঘাৎ হুঁকো কলকে থেকে টিকের আগুন উড়ে গিয়ে সর্বনাশ করেছে।

কুঞ্জ : (টেবিল চাপড়াইয়া) সাইলেন্স—সাইলেন্স। আর কোন আগুন নয়। এ হচ্ছে পাপের আগুন। এ আগুন চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ঘর-সংসার ছারখার করে দেয়। তোমরা সব চুপ করে, আমি যা বলছি শোন। এই যে একটি মহিলা দেখছ, এর নাম

গায়ত্রী দেবী। (কেষ্টকে) কেষ্ট, এ ঘর থেকে বাইরে যাবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটা লাঠি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে থাক। আমার হুকুম না নিয়ে কাউকে বাইরে যেতে দিবি না।

বঙ্গচন্দ্র : এ বড় কড়া হুকুম দেখতে পাচ্ছি। ঘরে লাগছে আগুন, আমরা পলায়ন না করিয়া পুইড়া মরুম নাকি এহানে?

শরৎ : আঃ, থাম না বঙ্গচন্দ্র। কুঞ্জদা বলছেন, এটা পাপের আগুন, ব্যাপারটা কি শোনাই যাক না।

কুঞ্জ : হ্যাঁ, পাপের আগুন, আরও ভীষণ—আরও সাংঘাতিক। একটা ঘর-সংসার চিরকালের জন্য পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ধরুন আপনারা Gentlemen of the Jury ! জুরী মহোদয়গণ, একটি নিষ্পাপ বালবিধবা। শ্বশুরোদ্দেশ্যে ঠাঁই হল না। পিত্রালয়ে এসে আশ্রয় নিলে। একটি পাপমতি যুবক ঐ বালবিধবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললে—ক্রমে ক্রমে পাড়ায় দারুণ কলঙ্ক রটালে। মেয়েটির বাপ ফেলে গিয়ে মেয়েটিকে কাটতে যায়। প্রাণ বাঁচাতে মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আর শেষে তার জীবনের গ্লানি ওই যুবকটির ঘাড়েই গিয়ে পড়ে। যুবকটি মেয়েটিকে কুসলিয়ে কাজ হাসিলের আশা দিয়ে পাড়ি দেয় এই রেংগুনে। জাহাজে টাকা-পয়সাওয়ালা একটি বন্ধু জোটে। তিনজনে এসে আশ্রয় নেয়—

শরৎ : বুঝেছি। আশ্রয় নেন, অমৃতাবরণ বাঙালি-বান্ধব এই কুঞ্জবিহারী মুখার্জির আনন্দাশ্রমে।

কুঞ্জ : হ্যাঁ, আমার এখানে আশ্রয় নেয়। সেই তিনজন লোক এখানেই উপস্থিত। বালবিধবাটি ঐ গায়ত্রী দেবী। তাকে কলঙ্কিত করেছে যে শয়তান যুবকটি, সে ঐ নন্দদুলাল রায়। আর তিনের কলটি হচ্ছে তারই পাশে দাঁড়িয়ে ঐ পাঁচকড়ি দাস—

(সকলে হাসিয়া উঠিলেন)

কুঞ্জ : হ্যাঁ, তা তোমরা হাসতে পার। রেংগুনে এরকম ঘটনা আজ এই নতুন নয়।

গিরিন : রেংগুন তো এখন দেখছি একটা হানিমুন-এর আরগা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুঞ্জ : তা হোক, আমার বলবার কিছু নেই। সামাজিক অপরাধের এরা অপরাধী হলেও আইনত কোন অপরাধের ধারায় আমি এদের ফেলতে পারছি না এই জন্য যে, এরা তিনজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। আর গায়ত্রীকে নন্দদুলাল রেখে আনেনি। ভুল পথে পদক্ষেপ করলেও গায়ত্রী বেচ্ছতেই নন্দদুলালের সঙ্গে এসেছে। পাঁচকড়ির দোষারী ছাড়া আর কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না।

হরিহর : তবে পাপের আগুনটা জ্বলছে কোথায়? সেইটা বলুন স্যার।

বঙ্গচন্দ্র : হ। সেটা না কইয়া দিলে তো বোঝান যায় না। পাপের আগুন নিভতে হইলে পাপচক্ষু চাই। সেটা তো আমাগো নাই।

কুঞ্জ : সাইলেন্স—সাইলেন্স। পাপটা করেছে ঐ নন্দদুলাল। এখানে এসে আমাদের কাছে পরিচয় দিয়েছে—গায়ত্রী ওর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। আমাদের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদন করে গত দুই রাত্রি গায়ত্রীকে নিয়ে একই কক্ষে রাত্রিযাপন করেছে এই বাড়িতে। সবচেয়ে মারাত্মক কথা কিছুক্ষণ আগে এই গায়ত্রী ঐ নন্দদুলালের বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, ঐ নন্দদুলাল তাকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে সবার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সেটাও যদি বা ক্ষমা করা যায়, কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না তার শেষ অভিযোগ।

অনেকে : (উত্তেজিত কণ্ঠে) সেটা কি? বলুন—বলুন।

কুঞ্জ : ওই প্রথম সুযোগ পেয়ে নন্দদুলাল তার রুদ্ধ কক্ষে গায়ত্রীর উপর বলাৎকারের চেষ্টা করেছে। আমার স্ত্রী যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকতেন আর এই অভিযোগ শুনতেন, তবে ঐ নরাধমকে প্রথমেই জুতো পেটার হুকুম দিতেন।

সকলে : আমরা সে হুকুমের অপেক্ষা রাখি না।

সুরেন : ওকে খুন কর।

নিবারণ : ওকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে চল, আচ্ছা করে সবাই ধোলাই দিই।

শশাঙ্ক : কিন্তু তার আগে গায়ত্রী দেবীর নিজের মুখে অভিযোগটা আমাদের শোনা উচিত নয় কি?

শরৎ : শশাঙ্কদা, কোন নারীর মুখ থেকে এই কলঙ্কজনক কথাটা শোনার কি আর কোন প্রয়োজন আছে? যখন তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এই অভিযোগটা নীরব সমর্থন করছেন।

বঙ্গচন্দ্র : হ, মরার উপর অরে খাঁড়ার ঘা না মারনই উচিত। আরেন, খাঁড়ার ঘা যেখানে মরণ উচিত সেইখানেই মারি। (নন্দদুলালকে) ওরে শালা, তুই বুঝি ভাবছিলি এ দাশটা মগের মুলুক, যা খুসি করণ যায় এখানে? চল্ শালা বাইরে। একটু হাতের সুখ করিয়া লই।

হরিহর : দাঁড়ান মশাইরা—দাঁড়ান। আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন, এক হাতে তালি বাজে না। যিনি ধর্মাবতারের কাছে অভিযোগ করছেন, কুল ত্যাগ করে অপরাধ তিনিও কিছু কম করেন নি। বিচার যদি করতে হয়—ন্যায্য বিচার করুন। দণ্ড যদি দিতে হয় তাকেও দিন। যে গায়ত্রী দ্বি-সন্ধ্যা জপ করে থাকি, সেই গায়ত্রীতে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে মশাইরা, ঐ কুলত্যাগিনীর এই সব নির্লজ্জ আচরণে। এখন তো আর সতী-সাধ্বী সাজলে চলবে না!

শরৎ : দেখুন চক্কোত্তি মশাই, আমি যতদূর ব্যাপারটা বুঝেছি, গায়ত্রী দেবীর এই অভিযোগটা মূলতঃ এই নন্দদুলাল রায়ের বিরুদ্ধে হলেও, আসলে কিন্তু বর্তমান হিন্দু-সমাজের ওপরেই একটা তীব্র-তীক্ষ্ণ কষাঘাত। গায়ত্রী দেবী যে বয়সে বিধবা হয়েছেন, সেই বয়সে মেয়েরা তাদের সংসার যাত্রা সুরু করে থাকে। জীবনে কত আশা—কত আকাঙ্খা—কত স্বপ্ন নিয়ে। এই কচি বয়সে হঠাৎ যদি কালের রূঢ় আঘাতে তার বৈধব্যযোগ আসে, তার বাকী জীবনটা কি শুধু জপ-তপ আর উপবাসের মধ্য দিয়ে ব্যর্থ করে দিতে হবে? আর সেই জপ-তপ আর আচার-বিচারের কঠোর শৃংখলে তার সমস্ত জীবনটা শৃংখলিত রেখে আর হৃদয়টাকে—মনটাকে শুকিয়ে মারতে হবে? আমি বলব, সবচেয়ে বড় অপরাধী আমাদের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এই হৃদয়হীন অনুশাসন।

(অনেকের করতালি)

কুঞ্জ : সাইলেন্স—সাইলেন্স! আজ এখানে হিন্দু সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর এক্তিয়ার আমাদের নেই। শরৎ, তোমার ঐসব বক্তৃতা কলকাতার কোন পাবলিক মিটিং-এ কোরো। আমরা আপাততঃ এখানকার বাঙালী সমাজে এ সব অনাচার—এ সব ব্যভিচার সইব না।

নন্দ : শুনুন, দয়া করে শুনুন। পাপ আমি অনেক করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত আছি। বিধবা আইন অনুযায়ী গায়ত্রীকে আমি বিয়ে করতেও সম্মত আছি।

গায়ত্রী : না, আমি সম্মত নই।

কাশি তাড়ানোর চ্যাম্পিয়ন

Alembic

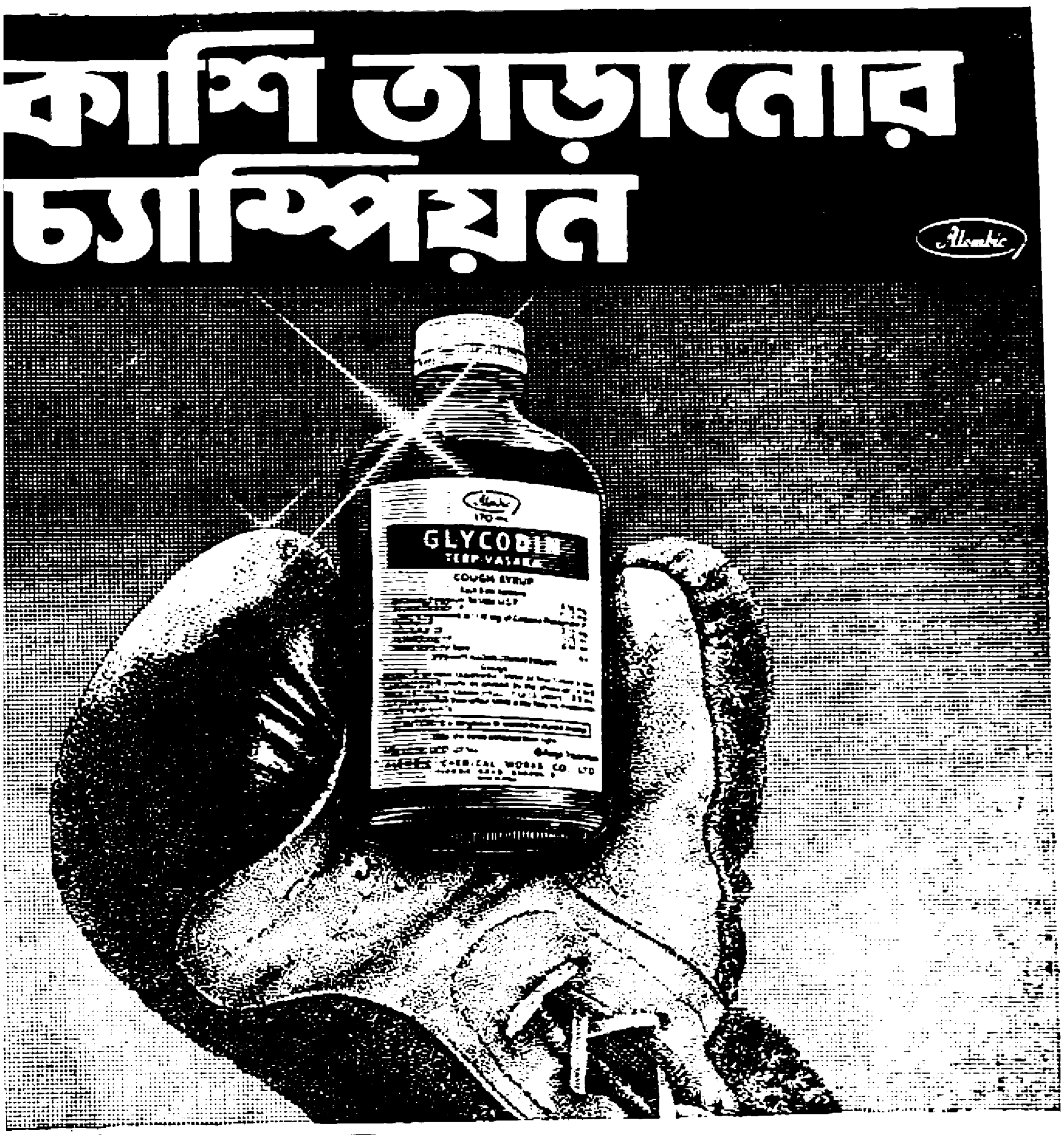

গ্লাইকোডিন লক্ষ লক্ষ ঘর থেকে কাশি তাড়ানোর ব্যাপারে গৃহস্থের সবচেয়ে বড় বন্ধু আর কাশির সবচেয়ে বড় শত্রু প্রমাণিত হয়েছে। □ গ্লাইকোডিন মস্তিষ্ক, গলা, বুক আর গ্লাইকোডিন মস্তিষ্ক, গলা, বুক আর ফুসফুস—কাশির চারটি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায় • দ্রুত কাজ করে • মিষ্টি স্বাদ • পয়সার সাশ্রয়

গ্লাইকোডিন — ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত গার্হস্থ্য কাশির চিকিৎসা

বঙ্গচন্দ্র : নাও, হইল তো? কেস তোমার ডিস্মিস্। এখন বধ্যভূমিতে পদার্পণ করাই তোমার পরম কাম।

(সকলের হাস্য)

কৃষ্ণ : সাইলেন্স, সাইলেন্স, Gentlemen of the Jury! —মানে, জুরী মহোদয়গণ, এইবার বলুন আসামী নন্দদুলাল রায় দোষী কী নির্দোষ?

অনেকে : দোষী—দোষী—দোষী।

নন্দ : আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

অনেকে : না, ক্ষমা নেই—এ ব্যাপারে ক্ষমা নেই।

নন্দ : শুনুন, আপনারা দয়া করে শুনুন। আমি এই কানমলা খাচ্ছি, নাকে খৎ দিচ্ছি। আমি পরের জাহাজে বেঙ্গুন ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছি। মা কালীর নামে শপথ করে বলছি—এমন কর্ম আমি আর জীবনে করব না। পরের জাহাজ ছেড়ে যাবার পরে যদি পাসেঞ্জার তালিকায় আমার নাম না পান, আপনারা আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন অথবা আমার নামে ফৌজদারী মকদ্দমা দায়ের করবেন। দয়া করে এ যাত্রা আমাকে ছেড়ে দিন।

কৃষ্ণ : তোমরা কি বল?

গিরিন : আমি বরং বলি, ব্যাপারটা ঐ গায়ত্রী দেবীর উপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। উনি যেরূপ বলেন, তাই করা হোক।

নন্দ : আমার আপত্তি নেই।

গিরিন : অভিযোগটা যখন উনিই করেছেন, আসামীর দণ্ডটাই উনি দান।

সুরেন : তা নয়তো কি? নইলে কোন মেয়ে তার কলঙ্ক এমনি করে প্রচার করে?

বঙ্গচন্দ্র : গায়ত্রী দেবী যখন বিচার চাইলেন—আর আসামীও যখন দোষী সাব্যস্ত হইছে, পাঁঠাটা বলি দেওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করেন

(সকলের হাস্য)

কৃষ্ণ : সাইলেন্স—সাইলেন্স। গায়ত্রী, আমাদের সাব্যস্ত হয়েছে, তুমি যা বলবে আমরা তাই করব। তোমার কি মত?

গায়ত্রী : যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি, তারপর ওকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মেসোমশাই।

কৃষ্ণ : কিন্তু গায়ত্রী, ঐ নন্দদুলাল যদি তোমাকে এখন একবার মা বলে ডাকে, তবু কি তোমার পক্ষে ওকে ক্ষমা করা সম্ভব নয় মা?

(নন্দলাল হাততালি দিলেন)

নন্দ : মা, আমি পাপ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

গায়ত্রী : অমন কুপুত্রের মা হতে আমি চাই না। আমি শুধু চাই ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি। ওকে ছেড়ে দিন—ওকে আপনারা ছেড়ে দিন। ও পালাক—আমি বাঁচি।

(কাঁদিতে কাঁদিতে গায়ত্রীর ছুটিয়া অন্দরে প্রস্থান)

বঙ্গ : নাও, আসামী বেকসুর খালাস।

কৃষ্ণ : কেস্ট, দরজা ছেড়ে চলে আয়। ওরা এখন চলে যাবে না। গিরিন, পাঁচকড়ির হেফাজতে এই মেয়েটিকে রাখার জন্য অল্প ভাড়ায় একটা বাসা খুঁজে দাও ওদের জন্য।

গিরিন : শরৎ, তোমার সহরতলীর ঐ মিল্কি পল্লীতে একটা বাসা খালি নাই?

কৃষ্ণ : তা যদি হয়, ভালই হবে। শরৎ তবে দেখা-শোনাও করতে পারবে। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। আর দরকার পাঁচকড়ির একটা চাকরি। তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কিছু না কিছু একটা জুটে যাবেই।

শশাঙ্ক : আমার বাটের গোলার জন্য একজন এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার খুঁজছি। তা আপনারা যখন বলছেন, ঐ পাঁচকড়ি বাবুকেই আমি কাজটা দেব। মাসিক বেতন কিন্তু ৬০৲ টাকার বেশি দিতে পারব না।

(সকলের করতালি)

শশাঙ্ক : পাঁচকড়িবাবু, কাল সকালে আমার সঙ্গে বাটের গোলায় দেখা করবেন।

পাঁচকড়ি : যে আজ্ঞে।

কৃষ্ণ : এ তো বেশ ভালই হোল। আর তা ছাড়া, আমার সমাজসেবিকা পত্নীটি মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলে গায়ত্রী মার জন্য কোন স্কুলে সেলাই বা গান-বাজনা শেখানোর একটা কাজটাজ যোগাড় করে দেবেন এখন। বেশ, তবে আজকের সভা শেষ। নন্দদুলাল যখন অনুতপ্ত হয়ে চলেই যাচ্ছে। চল, হলঘরে গিয়ে চা খেতে খেতে ওকে আমরা বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে দিই। কেষ্ট, হলঘরে চা দে—

বঙ্গচন্দ্র : আরে কেষ্ট, খালি চা-এ চলব না। চা-টাই দিবি। এটা হইতেছে একটা গ্রান্ড ফেয়ারওয়েল পার্টি।

(সকলের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

।। তৃতীয় দৃশ্য ।।

(বেঙ্গুনে মিস্কিপল্লীতে শরৎচন্দ্রের বাসা। কাল : সন্ধ্যা)

(গায়ত্রী ও পাঁচকড়ি আসিল)

পাঁচকড়ি : ভোলা—ভোলা—(বারবার চিৎকার)

(শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ভোলা আসিল)

ভোলা : ও, এই যে রাঙ্গাবাবু—রাঙ্গাদিদি এসেছেন? তা কর্তা তো আপিসে, এখনও বাড়ি ফেরেননি।

পাঁচকড়ি : তা অফিস তো ছুটি হয় চারটায়, এখনও ফিরলেন না?

ভোলা : কর্তার ইচ্ছের কর্ম, আমি কি করতে পারি কন।

পাঁচকড়ি : আমাদের যে খুব দরকার।

ভোলা : তা আপনারা বসুন। শান্তিদিদিকে ডেকে আনি, চা-টা করুক।

গায়ত্রী : শান্তিদিদিটি কে?

পাঁচকড়ি : ঐ যাকে শরৎদা অশান্তি বলেন—রাঁধুনি।

ভোলা : তা কর্তা ঠিকই কন। ওর রান্নাটা খেতে ভারী শান্তি। কিন্তু কথাবার্তা কইলেই—অশান্তি। যাই, আমি ডেকে আনি।

পাঁচকড়ি : না,-না, থাক। শরৎদা এলেই ডেকো।

ভোলা : বালন কি রাঙ্গাবাবু, তাহলে কি রক্ষে আছে: কর্তার হুকুম, লোকজন এলে, পান-তামাক-চা দিতেই হবে। তা তারা খান আর না খান। এই যে, বই-টই কাগজ-পত্তর আছে, আপনারা দেখুন।

(ভোলা ছুটিয়া ভিতরে গেল। গায়ত্রী ভারতী মাসিক পত্রিকাটি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল)

গায়ত্রী : এ কি, ভারতীর পত্রিকা রেঙ্গুনেও আসে দেখছি।

পাঁচকড়ি : শরৎদার সখের তো শেষ নেই। গান-বাজনা, ছবি আঁকা, মাছ ধরা, শিকার করা—বই পড়া। ভদ্রলোকের সঙ্গে দুদিন আলাপ করলেই বোঝা যায়, কি অদ্ভুত লোক উনি।

(ভোলার ছুটিয়া প্রবেশ, হাতে এক প্যাকেট [illegible])

ভোলা : সুরু করুন রাঙ্গাঝুরু। আমি যাচ্ছি। (বলিয়াই ছুটিল)
পাঁচকড়ি : (উচ্চকণ্ঠে) না না, কোথায় যাচ্ছ? আর অশান্তি কোরো না। (ঠিক মুহূর্তেই কিন্তু শান্তির প্রবেশ)
শান্তি : অশান্তি মানে!

ভোলা : ও'রা চা খাবেন না। খেলেই নাকি অশান্তি—মানে, খুব পেট গরম হয়, মাথা ধরে—বুক ধড়ফড় করে।
শান্তি : তবে সরবৎ দিচ্ছি। (গায়ত্রীকে) রাঙ্গাবাবু তো এ বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন, কিন্তু আপনি তো আসেননি। আপনিই তো সেই রাঙ্গাদি?

গায়ত্রী : কি জানি বাপু, আজই এখনে প্রথম এসেছি সত্যি; কিন্তু রাঙ্গাদি হচ্ছি কি সুবাদে তা তো জানি না।
শান্তি : বারে! দাদাঠাকুর ঐ বলতে বলেছেন যে। এই ভোলা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি শুনেছিস? উনুনটা জ্বালিয়ে তুই বিকেলের বাজারটা সেরে আয়। আপনারা বসুন, আমি একটু সরবৎ করে আনছি। (ভোলা ও শান্তি অন্দরে চলিয়া গেলেন)
গায়ত্রী : দেখুন—দেখুন পাঁচকড়িবাবু, আপনাদের শরৎবাবু এই ভারতী পত্রিকায় গল্প লিখেছেন—বড়দিদি।

পাঁচকড়ি : সে কি! কই দেখি? (পত্রিকাটি লইয়া দেখিয়া) তাইতো! আমি কলকাতায় থাকতে ঐ বড়দিদি গল্পটি পড়েছি। আশ্চর্য সুন্দর গল্প। কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যায় তো নাম দেখিনি। আমরা সবাই বলাবলি করতাম। যখন এত ভাল লেখা, নাম ঠাকুরই লিখে থাকবেন।

গায়ত্রী : কিন্তু ১৩১৪'র এই আষাঢ় সংখ্যাটাতে দেখছি, লেখকের নাম দিয়েছে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্পটাও এই সংখ্যায় শেষ হয়েছে। আমি কিন্তু সত্যিই অবাক হচ্ছি পাঁচকড়িবাবু, এতবড় লেখক রেঙ্গুনের এই খনিতে লুকিয়ে আছেন?
পাঁচকড়ি : শরৎদা এ কয়দিনে আমাদের কত কথাই না বলেছেন। বড়দিদি যদি উনি লিখা হোত, তিনি কি চুপ করে থাকতেন? খুব জাঁক করেই বলতেন।

গায়ত্রী : পাঁচকড়িবাবু, লোকটি একটু অসাধারণ বলেই সাধারণে যা করেন, তা তিনি করেন নি। কিন্তু গল্পটা আমায় পড়তেই হবে।
পাঁচকড়ি : গল্পটা উনি কি করে শেষ করেছেন, কলকাতা গিয়েই পড়বে। তুমি যখন থেকেই যাচ্ছ, শরৎদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ে নিও। দেখ, গল্পটাতে বিধবা যুবতী—মাধবীর চরিত্রটা দেখ। সেই যে বলে না—'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' মাধবীর চরিত্রটা হুবহু তাই।
গায়ত্রী : বিধবাদের ওছাড়া গতিই বা কি? কথা বলার স্বাধীনতা ওদের কোথায়?

(শান্তি দুই গ্লাস সরবৎ লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং ইহাদের দিতে গেলেন, পাঁচকড়ি গ্লাসটি লইলেন, কিন্তু গায়ত্রী লইলেন না)

গায়ত্রী : সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে আমি কিছু মুখে দিই না ভাই।
শান্তি : তবে আর জোর করব কি করে? ঢেকে রেখে দিচ্ছি, দাঠাকুর এলে খাবেন এখন।
গায়ত্রী : উনি বুঝি সন্ধ্যাআহ্নিক কিছু করেন না?
শান্তি : সন্ধ্যায় নাম-গান করেন, আর ফাঁক পেলেই গায়ত্রী জপেন। আপনার খুব সুবিধে রাঙ্গাদি।
গায়ত্রী : কি সুবিধে?
শান্তি : আপনার নামই গায়ত্রী। জপ করলেও গায়ত্রী— না করলেও গায়ত্রী। (সকলেই হাসিয়া উঠিলেন)

গায়ত্রী : নাম-গান তো করেন, একাই করেন না আরও লোকজন আসেন?
শান্তি : তারও কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কোন দিন করেন, কোন দিন করেন না। মানে, তাঁর খামখেয়ালী লোক। আপিস থেকে ফেরার পথে যেদিন বেলফুলের মালা কিনে আনেন, সেদিন মালাটি তুলসী গাছে চড়িয়ে দেন। আর আমাদের নীচের বস্তি থেকে আমার বাবা আর সব মিস্ত্রী বাবাদের ডেকে এনে নাম-গানের আসর বসিয়ে দেন। হরির লুটের সময় খুব হৈ-হুল্লোড় হয়। তারপর একটু বেশী রাতে বেসামাল হয়ে পড়েন অনেকে। আমার পিতা ঠাকুরটি তো এই সুযোগই খোঁজেন।
গায়ত্রী : তোমার মা নেই?

শান্তি : না রাঙ্গাদি, মা থাকলে আজ আমার এই দুর্গতি হয়। বামুনের মেয়ে হয়ে নিচের বস্তিতে অজাত-কুজাত মিস্ত্রিদের সঙ্গে ঘর নিয়ে বাস করতে হচ্ছে? আমার দুঃখের শেষ নেই রাঙ্গাদি। এই দাঠাকুরের রান্না-বান্না করে দিই, তাই ভাত-কাপড় জোটে। নইলে, আমার বাপের কীর্তি আর কি কম্মিন কালেও কোন ভদ্রলোকের ভদ্রস্থ উদ্ধার করতে পারত?

(হরির সরবতীয় প্রবেশ)

শান্তি : একি বাবা, তুমি এখন এখানে?
হরি : ওরে শান্তি, তোকে আমি সাবধান করে দিতে এলুম।
শান্তি : কি হয়েছে, কি সাবধান?
হরি : শরৎঠাকুর আজ এক কীর্তি করে বসেছেন।
শান্তি : বল না কি করেছেন।
হরি : এ'রা সব রয়েছেন, বলব?—তা বলাই ভাল, ও'দেরও সাবধান থাকাই উচিত। শরৎ-ঠাকুর আজ আপিসে যায় নি।
শান্তি : তবে কোথায় গেছেন?
হরি : সুরেন মালার কাছে খবর পেলাম, রেঙ্গুনের সেই সব নামকরা বাসন্তী বাইজী, সে কাল বসন্তে মারা গেছে।
শান্তি : আ-হা-হা-হা! এই তো কিছুদিন আগে এই বাড়িতে—এই ঘরেই এসে দা-ঠাকুরকে কি সুন্দর সব খেয়াল-ঠুংরী শুনিয়ে গেছে।
হরি : হলে কি হবে, বেরুদ্যো তো! সঙ্গের পায়রা নিয়ে কারবার। বসন্ত রোগে মারা যেতেই সব পায়রা ভয়ে উড়ে গেছে। এখন লাশটা পোড়ায় কে?

শান্তি : না-ঠাকুর বুঝি সেই বসন্তের মড়া পোড়াতে গেছেন?
হরি : যাবেনই। আমি তো বলি—শরৎঠাকুর, আমাদের নেশা একটা, কিন্তু তোমার দুটো নেশা। এক নম্বর নেশা—মদ খাওয়া, দু নম্বর নেশা—মড়া পোড়ানো। কিন্তু আজ যে ঐ মড়া পুড়িয়ে কি সর্বনাশ হয়, আমি ভাবতে পারছি নারে শান্তি। অমন ছোঁয়াচে রোগ তো আর দ্বিতীয় নেই! আর সুরেন বলছে—এ নাকি সেই জাতের বসন্ত, যা নাকি শিবেরও অসাধ্য! বুঝলি শান্তি, দিন সাতেক দেখতে হবে। এই দিন সাতেক তোর এ বাড়ির ছায়া মাড়ান চলবে না। আমি মিস্ত্রীদের এই কথাই বলে দিয়েছি, সবাই তো ভয়ে কাঁপছে। আপনারাও মশাই সরে পড়ুন। শ্মশান থেকে শরৎঠাকুরের বাড়ি ফেরবার সময় হয়ে গেছে। চল, ঘরে যাই চল।

শান্তি : দেখ বাবা সবার সামনেই তোমাকে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করে বলে রাখছি। দা-ঠাকুর যা করেছেন সেটা মানুষের মধ্যে যাঁরা দেবতা, শুধু তাঁরাই করে থাকেন। আমাকে যদি তুমি এমনি করে তাঁর কাজ ছেড়ে দিতে বল, তবে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমার অসুখ-বিসুখে আমি তোমার ত্রি-সীমানাতেও যাব না।
হরি : হ্যাঁ!

শান্তি : যাব না—যাব না—যাব না। এই তিন সত্যি রইল।

হরি : ওরে বাবা! না না, তুই থাক। আমার যা বলার বলেছি। এখন তুই যা ভাল বুঝিস—কর। থাকতে হয় থাক—বাঁচতে হয় বাঁচ—মরতে হয় মর। কিন্তু আমাকে অমন করে মাবিসনে মা।

(হাঁরহরের প্রস্থান। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। শান্তি বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াই হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

শান্তি : দা-ঠাকুর আসছেন। স্নান করে ভিজে কাপড়েই আসছেন। (ছুটিয়া আসিয়া) আপনারা বসবেন না চলে যাবেন?

গায়ত্রী : না আমরা থাকব। ও'র কি দরকার তুমি দেখ।

শান্তি : হাঁ দেখছি—

গায়ত্রী : এখন বোধ হয় একটু গরম দুধ বা চা—

শান্তি : দুধ উনি খান না। কিন্তু যদি মনে না করেন—ঐ যে, ঐ রান্নাঘরে চায়ের জল ফুটছে—

গায়ত্রী : আমি যাচ্ছি।

(গায়ত্রী রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। দ্বারপথে সিক্তবস্ত্রে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ, শান্তি ছুটিয়া গিয়া সামনে দাঁড়াইলেন।)

শরৎ : (হাসামুখে) এই যে, পাঁচকড়ি ভাই যে। একটা মড়ার মত মড়া পুড়িয়ে এলাম হে।

শান্তি : আমরা জানি, বাবা এসে সব জানিয়ে গেছেন।

শরৎ : হাঁ, আমি সুরেন মাস্টারকে তোমাদের সব খবর দিতে বলেছিলাম। তুমি বস পাঁচকড়ি, আমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসছি।

(শান্তির সহিত শরৎচন্দ্র ভিতরে চলিয়া গেলেন, পাঁচকড়ি অস্থিরচিত্তে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কীর্তন গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণদাস অধিকারীর

প্রবেশ।...কীর্তন শেষে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ।)

শরৎ : এ না হ'লে কৃষ্ণদাস অধিকারী? ঠিক এই আমার মনে যে ভাবটি উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, কি আশ্চর্য, আপনার ঐ গানটিতেই তা ভাষা পেল! রাতটা আজ এখানেই খেয়ে যান না।

কৃষ্ণদাস : না বাবাঠাকুর, আজ দুর্গাবাড়িতে গান হবে—প্রসাদও হবে। আমি শুধু এসেছিলাম জানতে, আমার কোন একটা গতি করতে পারবে বলাঠাকুর? কচি মেয়েটাকে নিয়ে এই বিদেশ-বিভূঁয়ে আর কদ্দিন ভবঘুরে হয়ে পথে থাকব!

শরৎ : ঘুরতে ঘুরতে এমনি করেই বেঁচে যাচ্ছে। আপনি তো জানী। মানুষের। আপনার জন্য আমরা চেষ্টা কিছু কম করছি না। ফলটা ধীরে ধীরে পাকছে। টুপ করে এরই মধ্যে হাতের মুঠোয় পড়বেই একদিন।

কৃষ্ণ : তা বাবাঠাকুর, তুমিও তো এই বয়েসে কম জানী নও। তাহলে চলি, আমার বেলা বোধই হয়ে গেছে। হরি হে, পার কর হে।

(বলিতে বলিতে কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।

শরৎ : এই শান্তি, দু পেয়ালা গরম চা।

(গায়ত্রী একটি ট্রেতে দুজনের উপযোগী চা-টা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

শরৎ : একি গায়ত্রী! ব্যাপার কি?

পাঁচকড়ি : আমরা খুব বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

শরৎ : গায়ত্রী, তোমার চা?

গায়ত্রী : আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক এখনও হয়নি শরৎদা।

শরৎ : ও। হাঁ, তা বিপদটা কি?

গায়ত্রী : চায়ে চিনি কম হয়নি তো?

শরৎ : না না, ঠিক হয়েছে—সুন্দর চা হয়েছে। চমৎকার। এমনি এক পেয়ালা চায়ের জন্যই প্রাণটা আই-ঢাই করছিল। তা শান্তিও কিন্তু খুব সুন্দর চা করে। এটাই শান্তি—আর সব অশান্তি।

গায়ত্রী : না না, দেখলাম তো শান্তি খুব ভাল মেয়ে।

শরৎ : ভাল তো নিশ্চয়ই। নইলে, এমন একটা খাপছাড়া লোকের সব অত্যাচার সয়ে চাকরি করে যাচ্ছে আজ কয়েক বছর? যাক গে, কি বিপদ পাঁচকড়ি?

পাঁচকড়ি : শরৎদা, আজ টেলিগ্রাম পেলাম—বাবা মৃত্যুশয্যায়। আমাকে পরের জাহাজেই চলে যেতে বলেছেন।

শরৎ : সত্যি দুঃসংবাদ। বিশেষ তোমার যখন একটা চাকরিও হয়ে গিয়েছিল এখানে। দেশে তো চাকরি-বাকরির মেলা ভার। সে যাক, তুমি কবে যাচ্ছ?

পাঁচকড়ি : কালই একটা জাহাজ ছাড়ছে। কিন্তু বিপদ হয়েছে গায়ত্রী দেবীকে নিয়ে। আমি চলে গেলে উনি একা ও বাড়ীতে থাকবেন কি করে?

শরৎ : হুঁ!...আচ্ছা, যদি কুঞ্জবাবুকে আমরা গিয়ে ধরি, তাঁর বাড়িতে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আশ্রয় দিতে?

পাঁচকড়ি : শরৎদা, টেলিগ্রাম পেয়েই আজ আমি কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি ভিতরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বাইরে এসে আমাকে জানালেন—পারবেন না। মনে হোল, তাঁর স্ত্রীর আপত্তি আছে।

শরৎ : হুঁ! তবে?...আচ্ছা গায়ত্রী, তুমি তো বেগুনে স্বেচ্ছায় আসনি, নন্দদুলাল তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে এনেছিল। দেশে ফিরে যেতে আজ কি তোমার কোন আপত্তি আছে?

(ক্ষণিক নিস্তব্ধতা)

পাঁচকড়ি : ঠিক এই কথাই আমি ওঁকে বলেছি।

শরৎ : উনি কি বলছেন?

গায়ত্রী : দেশে আমি আর যাব না। শ্বশুরবাড়িতে স্থান না পেয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বাপের বাড়িতেও আজ আমার স্থান নেই। এই কালামুখ দেশে আর আমি দেখাতে পারব না শরৎদা। (গায়ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন)

গায়ত্রী : আমি উচ্চ ডিগ্রি পরীক্ষা পাশ করেছি। সেলাইয়ের কাজ-কর্ম জানি, রান্না-বান্নাও জানি, ছোট ছেলে-মেয়েদের গান-বাজনাও শেখাতে পারি, কোন হাসপাতালে নার্সের কাজও চালিয়ে দিতে পারব এ ভরসা রাখি। এদেশ থেকে আমাকে তাড়াবেন না। দয়া করে আমাকে কোন একটা কাজ দিয়ে দুমুঠো মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই দিন।

শরৎ : আচ্ছা পাঁচকড়ি, শশাঙ্কবাবু তো সেদিন এক কথায় তোমাকে একটা চাকরি দিয়ে দিলেন। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তুমি ছেলেমেয়েদের পড়ান আর গান শেখানোর জন্য ওঁকে একটা কাজ দিতে পারেন না?

পাঁচকড়ি : টেলিগ্রামটা নিয়ে কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর সঙ্গেও আমি দেখা করেছি। কলকাতা যাবার ছুটি চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তিন মাসের ছুটি দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গায়ত্রী দেবীর কথা তুলে বললেন—ও বাড়িতে একা থাকা ওঁর চলবে না। ওঁকে আমার বাড়িতে এসে থাকতে বল। আমার স্ত্রী চির রুগ্না, চলাচলের শক্তিও নেই। গায়ত্রী এসে আমার ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনার ভার নিন। ভাল বেতনই আমি দেব।

শরৎ : তবে আর সমস্যাটা কি?

গায়ত্রী : পাঁচকড়িবাবু অফিস থেকে বেরার আগেই ঐ প্রস্তাবটা নিয়ে তিনি স্বয়ং ছুটে এসেছিলেন আমার বাসায় আজ বেলা দেড়টোয়। আমার ঘরে ঢুকে ঘুম থেকে আমাকে জাগিয়ে তুলে যে চোখে প্রস্তাবটা তিনি আমাকে দিয়েছেন, সেটা মানুষের চোখ নয় শরৎদা—ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। আমি চেঁচামেচি করে তাকে এরকম তাড়িয়েই দিয়েছি।

শরৎ : যাক্, ও ব্যাপারটা তবে শেষ হয়ে গেছে।

গায়ত্রী : না শরৎদা, শেষ আদৌই হয় নি। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন—কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় তবু একবার ভেবে দেখো গায়ত্রী। আজই রাতে তোমার কাছে আমি আবার আসব।—আমি চলি শরৎদা। (পাঁচকড়িকে) আসুন পাঁচকড়িবাবু। শরৎদা, একটা বেড়ার মড়া পোড়ানর চেয়ে একটা মানুষকে বেড়া হতে না দেওয়াটা কিছু কম কি? —ভেবে দেখুন।

(গায়ত্রী ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচকড়ি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হঠাৎ উচ্চস্বরে ভোলা এবং শান্তিকে ডাকিতে লাগিলেন)

শরৎ : (উচ্চৈস্বরে) ভোলা—ভোলা, শান্তি—শান্তি।

(উভয়েই ছুটিয়া আসিল)

শরৎ : শান্তি, একটুনি সুরেন মল্লাকে একবার ডেকে আনতে পারিস?

শান্তি : কেন পারব না ঠাকুর?

শরৎ : বলবি, খুব জরুরি দরকার। যা তো।

(শান্তি ছুটিয়া গেলেন)

শরৎ : ভোলা, আমার সেই গুঁপ্তি লাঠিটা খুঁজে বের কর দেখি। আরে, যে লাঠিটার পেটের ভেতর একটা তরোয়াল লুকোনো থাকে।

(ভোলা শুনিয়াই হাত দিয়া তরোয়াল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। সুরেন মাল্লাসহ শান্তির প্রবেশ।)

শান্তি : মাল্লামশাই আপনার কাছেই আসছিলেন ঠাকুর।

সুরেন : ব্যাপার কি শরৎদা?

শরৎ : আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি—ছোট্ট চিঠি। চিঠিটা নিয়ে তোমাকে এখুনি সাইকেলে ছুটে যেতে হবে শশাঙ্ক মোহনের কাছে চিঠিটা তাঁর হাতে দিতে। পারবে কি?

সুরেন : কেন পারব না? আপনার কোন কাজ করে দিতে পারলে আমার যে কি আনন্দ, সে তো আপনি জানেন।

শরৎ : এস।

(সুরেনসহ শরৎচন্দ্রের প্রস্থান)

শান্তি : ব্যাপার কি! এ যে দেখছি এক কুরুক্ষেত্র। গায়ত্রী জপ নিয়ে মেতেছে বামুনের যুদ্ধ। আমি তো দেখেই বলেছি, রূপ তো নয়—যেন আগুন। ঐ অশান্তির ভয়েই ভগবান আমাকে রূপ না দিয়ে নাম দিয়েছেন শান্তি।

(শান্তির প্রস্থান)

।। চতুর্থ কান্ড ।।

(পাঁচকড়ির বাসা। কাল—রাত্রি।)

(ঈষৎ মত্ত অবস্থায় সুশ্রুত হাতে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ)

শরৎ : একি, সব যে নিঝুম! (উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন) পাঁচকড়ি—ও পাঁচকড়ি।

(গায়ত্রীর প্রবেশ)

গায়ত্রী : যাক্, তবু ভাগ্যি আপনি এসে গেছেন। আমি তো একা একা বসে বসে ভয়ে কাঁপছিলাম।

শরৎ : কেন? পাঁচকড়ি—পাঁচকড়ি কোথায়?

গায়ত্রী : তার কথা আর বলেন কেন! একে তো শরীর খারাপ তার উপর বাপের ঐ খবর। সবার উপর আজ রাতে না জানি কি হয়, এই দুশ্চিন্তায়।

শরৎ : গায়ত্রী জপছে?

গায়ত্রী : আমার নামটাই হয়েছে দেখছি আমার কাল।

শরৎ : বল কি? আমি তো এখন ঐ একটি মন্ত্রই জপ করছি। একটিবার ডেকে আন তো পাঁচকড়িকে। দরকার আছে।

(কিন্তু দেখা গেল পাঁচকড়ি আসিতেছেন)

পাঁচকড়ি : এই যে শরৎদা, আপনি এসে গেছেন? আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কি সব দুঃস্বপন দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে ডাকছেন। আপনি বোধ হয়?

শরৎ : নাকি শশাঙ্কবাবু?

পাঁচকড়ি : (আতঙ্কে) ওরে বাবা! এসে গেছে নাকি, কোথায়?

শরৎ : আপাততঃ আমার পকেটে, এই নেখ।

(শরৎচন্দ্র পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া পাঁচকড়ির হাতে দিলেন।)

শরৎ : চিঠিটা বড় করে পড়তো। তোমার কর্তার হাতের লেখাটা তো তোমার চেনার কথা।

পাঁচকড়ি : হ্যাঁ শরৎদা, শশাঙ্কবাবুরই স্বহস্তে লেখা। চিঠিটি দেখছি আপনাকে লিখেছেন।

গায়ত্রী : আঃ, কি লিখেছেন পড়ুন না পাঁচকড়িবাবু।

পাঁচকড়ি : (পত্রপাঠ)—

প্রিয় শরৎবাবু,

সুরেন মাল্লার হাতে আপনার চিঠি পেলাম। সত্যিই আমার মতিভ্রম হয়েছিল। সাময়িক এই চিত্তবিকারের জন্য আমি এখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত। একথা খুবই সত্য, যে অভিযোগ আপনার কাছে করা হয়েছে, সে অভিযোগ কুঞ্জর কাছেও করা সম্ভব ছিল। আর তাহলে সমাজে শুধু আমার প্রতিষ্ঠাই নষ্ট হত না, আমার ব্যবসাটিরও গুরুতর ক্ষতি হত। তাই শরৎবাবু, আপনি আমাকে সময়মত সাবধান করে দিয়ে পরম বন্ধুর কাজই করেছেন। আমার এই কথাগুলি আপনার সঙ্গে দেখা করে মুখেও বলতে পারিতাম। কিন্তু আমার আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ এই স্বাক্ষরিত চিঠি দেওয়াই সমীচীন মনে করলাম। যিনি অভিযোগ করেছেন এই চিঠিখানি আপনি তাঁকে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন। আশা করি এব্যাপারটার এখানেই যবনিকা পড়বে এবং এটা চিরতরে গোপনই থাকবে।

ভবদীয়

শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়

গায়ত্রী : আপনি একটা পশুকে দেবতায় পরিণত করেছেন শরৎদা। সেজন্য আপনাকে একটিবার আমার প্রণাম করতে দিন। না না, বাধা দেবেন না। (প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) এই সঙ্গে সেই শশাঙ্কমোহনের উদ্দেশেও আমি আমার মস্তক প্রণত জানাই। (উদ্দেশে নমস্কার জানাইয়া) কিন্তু আপনাকে আরও একটি প্রণাম করতে চাই আমি—

শরৎ : (হাসিয়া) না না, এত প্রণামে আমার পা খোঁড়া হয়ে যাবে যে গায়ত্রী। ব্যাপার কি?

গায়ত্রী : আপনিই যে স্বনামধন্য লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এটা আবিষ্কার করেছি আজ সন্ধ্যায় আপনার বাড়িতে 'ভারতী' পত্রিকা দেখে।

পাঁচকড়ি : হ্যাঁ শরৎদা, আমি বর্ণপরিচয় প্রথম দুটি সংখ্যা পড়েছি। কি অদ্ভুত আপনার মননশীলতা আর মানবিকতা!

গায়ত্রী : আর তারই ফলেই দুরন্ত বসন্ত রোগে মৃত অন্যের অপত্যস্নেহ পরিত্যক্তা নারীর শবদাহ করেন আপনি।

পাঁচকড়ি : আর তারই ফলে শশাঙ্ক মোহনের মত কলঙ্কী চাঁদকেও নিষ্কলঙ্ক করতে পারেন আপনি।

(উভয়েই শরৎচন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন —বাধা মানিলেন না)

শরৎ : এ তো দেখছি আমাকে পালাতে হবে এখান থেকে।

পাঁচকড়ি : না না শরৎদা, পালাচ্ছ আমি। কাল ভোরেই আমাকে জাহাজ ধরতে ছুটতে হবে। আপনারা দুজনে আলোচনা করে ঠিক করুন, কাল থেকে গায়ত্রী দেবী কোথায় থাকবেন।

শরৎ : সে আলোচনায় তোমারও থাকা আবশ্যক পাঁচকড়ি।

পাঁচকড়ি : কিছুমাত্র না। আমি জানি আপনি যখন রয়েছেন তখন গায়ত্রী দেবী সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাঁকে দেখা-শোনার ভারটা আমি আপনাকে আজ দেওয়ার বহু আগে স্বয়ং কুবের সেদিনকার সেই সভাতে আপনাকেই দেন নি কি? নিন, আপনারা আলোচনা করুন। শরৎদা আমার বিছানার পাশে আপনার সেই বিছানা পাতা রয়েছে, দরজাও খোলা রইল। এই রাতে আর বাড়ি না গিয়ে শুতে হলে ওখানেই গিয়ে শোবেন। আচ্ছা চলি।

(পাঁচকড়ির প্রস্থান)

শরৎ : কিছু মনে কোরো না গায়ত্রী, মদ্যপান আমার জীবনের একটি অঙ্গ। নেশাটা শুরু হয়েছে বছর ষোল বয়স থেকে। কোন উপদেশ দেওয়া বৃথা। মা'র কথাই যখন রাখিনি, তোমার কথাও রাখতে পারব না। যদি আপত্তি কর, চলে যাচ্ছি।

গায়ত্রী : আমি আপত্তি তো করিনি শরৎদা।

শরৎ : (পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া এক ঢোক খাইয়া) বোতলটি আবার পকেটে রাখিলেন) নির্জলা খাওয়া কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু দেখ, বেসামাল আমি হই না। আমি মদ খাই, কিন্তু মদ আমাকে খেতে পারে না।

গায়ত্রী : কিন্তু শুনেছি লিভারটা খেয়ে ফেলে। কিন্তু এটাও আপনি কিছু নতুন শুনছেন না, হাজারও জনে হাজারও বার একথা আপনাকে বলে থাকবেন।

শরৎ : হ্যাঁ তা বলেছে। তাহলেই বুঝতে পারছ আজ পর্যন্ত আমার জীবনে এমন কোন লোক আসে নি, যে হয়তো একবার বললেই তার কথা না শুনে উপায় ছিল না। সে কথা যাক। এখন তোমাকে নিয়ে কি করা যায় বল?

গায়ত্রী : সেটা তো আজ আপনার বাড়িতে গিয়েই বলে এসেছি।

শরৎ : পাঁচকড়ির সঙ্গে তুমি সেদে ফিরবে না?

গায়ত্রী : না।

শরৎ : শশাঙ্কমোহনের প্রস্তাবে তুমি রাজীও হলে না?

গায়ত্রী : না। রাজী হলে কি আপনি খুশি হতেন শরৎদা?

শরৎ : না। খুশিই যদি হব, তবে তাকে ঠেকাতে যাব কেন? নাঃ, এ তো মহাবিপদ হোল। তোমাকে নিয়ে এখন আমি কি করি বল তো? (হঠাৎ) বিয়ে করবে?

গায়ত্রী : আবার বিয়ে!

শরৎ : হ্যাঁ গো, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দয়ায় বিধবা বিয়ে তো এখন আইনসম্মত।

গায়ত্রী : আইনসম্মত, কিন্তু সমাজে অচল।

শরৎ : (চটিয়া গিয়া) সমাজে অচল—সমাজে অচল—সমাজে অচল! যত সব ভীরু—কাপুরুষের দল। যাদের মুখ দেখে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হোল, সেই বালবিধবারাই যদি আইনের সুযোগ না নেয় আর কান্নাকাটি করে, আমার কি হবে গো! তার জন্য আর যার সহানুভূতিই থাক আমার কোন সহানুভূতি নেই।

গায়ত্রী : আপনি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন শরৎদা? আবার একটা বিয়ে করাই বিধবাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এ আপনাকে কে বলেছে? অন্ততঃ আমার তা নয়।

শরৎ : হুঁ।

গায়ত্রী : হ্যাঁ। তাছাড়া বিয়ে যে আমি না করেছি তাও তো নয়। এমনও তো হতে পারে—(হঠাৎ থামিয়া গেলেন)।

শরৎ : কি হতে পারে—বলতে বলতে থেমে গেলে কেন?

গায়ত্রী : না, থামবই বা কেন? বলতে আমার ভয়টাই বা কি?

শরৎ : হ্যাঁ, বল।

গায়ত্রী : এমনও তো হতে পারে, আমি বিধবা বিবাহ চাই না। আইন আছে বলেও চাই না—সমাজে চালু থাকলেও চাইতাম না।

শরৎ : তবে নন্দদুলালের সঙ্গে ঘর ছেড়ে রেঙ্গুনে এসেছিলে কেন? গায়ত্রী?

গায়ত্রী : রেঙ্গুনের হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে দেবে কথা দেওয়াতেই তার হাত ধরে এসেছিলাম।

শরৎ : কিন্তু চাকরিই যে তোমাকে করতে হবে, একথাটা আঁকড়ে ধরে আছ কেন?

গায়ত্রী : বিয়ে করতে যখন রাজী নই চাকরি ছাড়া আমার গতি কি? আপনিই বলুন না শরৎদা।

শরৎ : হুঁ, তাও তো বটে। শশাঙ্ক যে প্রস্তাব দিয়েছিল, সেটা প্রকারান্তরে রক্ষিতা হয়ে থাকার কথাই বলেছিল। তা দেখলাম—রক্ষিতা হয়ে থাকতেও তো তোমার নিদারুণ আপত্তি। বরং বলব, নন্দদুলালই স্বার্থহীন অবাধ বিধবা বিবাহ আইনে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সেও তো তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ। নন্দদুলালের সমস্ত আচরণটাই কুৎসিৎ—কদর্য ছিল। (আবেগে) গায়ত্রী—গায়ত্রী—কিন্তু এমন যদি কোন লোক তোমাকে আজ বিয়ে করতে চায়, যাকে তুমি শ্রদ্ধাভরে বার বার প্রণাম কর।

(গায়ত্রী দুই কান হাতে ঢাকিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন)

গায়ত্রী : আঃ—!

শরৎ : গায়ত্রী—গায়ত্রী—তোমাকে দেখা অবধি আমি উদ্ভ্রান্ত হয়ে রয়েছি। প্রথম জীবনে একটি মেয়েকে আমি উন্মাদের মত ভালবেসেছিলাম, কিন্তু তাকে পাই নি। না পেয়ে ভালবাসা যে কি তাই ভুলে ডুবিয়েছিলাম। সে-ই ভালবাসা হঠাৎ জেগে উঠেছে তোমাকে দেখে। আমাকে তুমি নিরাশ কোরো না—হতাশ করো না গায়ত্রী।

গায়ত্রী : তবে শুনুন শরৎদা। প্রথম জীবনে আমিও একটি ছেলেকে ভালবেসেছিলাম। আমি কিন্তু তাকে পেয়েছিলাম। আর আমি

য়া বুঝি কেউ পায় না। অনেক কিছু ঐশ্বর্য ছিল তার। এই দরিদ্র মেয়েটিকে বিয়ে করতে সব ঐশ্বর্য তাকে ত্যাগ করতে ছিল। নিঃস্ব হয়েই ঘর বেঁধেছিলাম আমরা। কিন্তু প্রেমের র্য আমাদের স্বর্গসুখে রেখেছিল। আমাদের অমন সুখ বোধ বিধাতার সইল না। সর্পাঘাতে মারা গেল আমার সেই প্রিয়তমা। ীর সেই অক্ষয় স্মৃতি—সেই অনন্ত প্রেম, আজও এই বাল-বার বুকে ধন হয়ে রয়েছে। আমার কাছে তাই নন্দদুলালের ন দাম নেই, পলাশমোহনের কোন দাম নেই, আর অমন যে ামধন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারও কোন দাম নেই।

(কাঁদিতে কাঁদিতে গায়ত্রী ছুটিয়া চলিয়া গেলেন)

ং : গায়ত্রী—গায়ত্রী—তুমি আমাকে বারবার প্রণাম করেছ। এবার ম করবার পালা তোমাকে আমার। আমার প্রেমের এই অপবিত্র ি নিয়ে তোমার স্বর্গীয় প্রেমের এই পলা-মন্দিরে দাঁড়িয়ে তে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি পালাই—আমি াই—

(শরৎচন্দ্রের প্রস্থান)

।পঞ্চম দৃশ্য।।

(শরৎচন্দ্রের বাসা। কাল :—শেষ রাত্র)

(মত্তাবস্থায় শরৎচন্দ্র প্রবেশ করিলেন)

ং : ভাগ্যিস জ্যোৎস্নাটা এখনও আছে, তাই পথ চিনে তো াম। কিন্তু আমার ঘরে ফিরতে পেরেছি কি?—হ্যাঁ, আমার ঘর ই তো মনে হচ্ছে। এই শান্তি—এই অশান্তি—ওহো-হো—ও-স তো আবার এই বস্তিতে নীচে বাপের ঘরে শোয়।—ওরে ব্যাটা লা, তুই কোথায় মরে আছিস রে হতভাগা—থাক বাবা—থাক, রা সব সুখে-শান্তিতে থাক।...হ্যাঁ, হ্যাঁ-হ্যাঁ—আবণের চিতাটা ে আমার বুকেই জ্বলুক। আচ্ছা মা—আচ্ছা বাবা, তোমরা নাকি র্গ থেকে সব দেখতে পাও?

(শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।)

কণ্ঠ : পাইবইকি বাবা শরৎ। এখনো ভুলতে পারিস নি বলেই মিও যে তোকে ভুলতে পারছি না বাবা।

রৎ : মা—কত দিন পর আজ তোমার ঐ মিষ্টি গলাটা শুনছি মা। গলাটা জড়িয়ে ধরে আমি তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে থাকতুম। ঠাৎ আতঙ্কিত হইয়া) না-না-না, এ আমি স্বপ্ন দেখছি। এত মদ খেয়েছি যে আমি খোয়াব দেখছি। তা নয় তো কি? তাই নয় মা? সব স্বপ্ন, কি বল মা?

তৃকণ্ঠ : না বাবা, স্বপ্ন হবে কেন? তোকে যারা ভালবেসেছে যাদের ভালবেসেছিস—দেখবি, তোর বুকের ভেতর কিন্তু তারা চে আছে।

রৎ : ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ মা।—আমি সেটা বেশ টের পাই। াজ তোমাকে বলতে হবে, এই লক্ষ্মীছাড়াকে তুমি জন্ম দিয়েছিলে ন?

তৃকণ্ঠ : কে বলে তুই লক্ষ্মীছাড়া বাবা? নিজের দোষে তুই নষ্ট ছিস। একটা বিয়ে-থা করে জীবনটাকে সংযত কর।

রৎ : কিন্তু আমি যাকে চাই, তাকে তো পাই না মা। কাকে আমি য়ে করব?

তৃকণ্ঠ : শরৎ বাবা! যাকে তুই চাস তার ভেতরেই সব গুণ আর ছে তুই চিনিস না বা জানিস না, তার ভেতরে কোন গুণ নেই, কথা তুই কেন ভাবিস? জগৎটাকে এত ছোট করে দেখিস না বাবা! পথের ধুলোতেও দেখবি কত হীরা-মাণিক পড়ে আছে। তুই মানুষের মত মানুষ হ শরৎ। তোর ওপর তোর মায়ের কত আশা ছিল, ভেবে দেখ।

শরৎ : বাবা!—আমার ওপর বাবার আশা!—ছিল নাকি?

(পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল)

পিতৃকণ্ঠ : হ্যাঁ বাবা, ছিল—এখনও আছে। বড় গরিব ছিলাম আমি বাবা। ছেলে টিকতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে সুদূরে ভাগলপুরে গিয়ে তোদের মামার বাড়ির গলগ্রহ হয়ে আমরা সবাই কোন মতে জীবন ধারণ করেছি। অবশ্য তোর মা গৃহকর্ম করে যতটা পারে শোধ দিয়েছেন। তোর মার তুলনা নেই রে, তোর মা-র তুলনা নেই। আমার লেখার অভ্যাস ছিল। তোর মা স্বপ্ন দেখতেন, আমি খুব বড় লেখক হয়ে তাঁর সব দুঃখ দূর করব। কিন্তু আজও কোন লেখাই আমি শেষ করতে পারি নি। হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমি একদিন দেখি তুই লিখতে পারিস—খুব ভাল লিখতে পারিস—অপূর্ব লিখতে পারিস। আর তা যে পারিস, তার প্রমাণও তো দিয়েছিস দেশের লোককে—বর্ষদিনি, কাশীনাথ, আর, আরও কিছু গল্প লিখে। জন্ম হোল তোর হুগলীর দেবানন্দপুরে—বড় মানুষ হলি তুই বিহারের ভাগলপুরে—সাম্রাজ্য একটা দখলিস্ত অশোকের শেষটায় চলে এলি এই মগধ মুলুকে। চাকরি তোকে করতে হবে না। লাখো টাকা তোর রোজগার হবে বই লিখে। বিয়ে-থা কর—শান্ত সংযত হয়ে—তুই শুধু লিখে যা, লিখে যা শরৎ।

শরৎ : (উচ্চহাস্যে) হঃ-হাঃ-হাঃ—বিয়ে-থা করে—বিয়ে-থা করে।

(অদূরে একটি কম্বল আচ্ছাদনে বা-থিন ঘুমাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের অট্টহাস্যে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বা-থিন চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

বা-থিন : কে—কে ওখানে?

শরৎ : তুমিই বা কে বাপধন?

বা-থিন : শরৎদা!

শরৎ : বা-থিন!...এখানে মরতে এসেছ কেন? আমি মৃতদের সঙ্গে কথা কইছিলাম বাবা।—তা তুমিও কি মরে গেছ?

বা-থিন : বুঝেছি। আজকে বোধহয় মাত্রাটা ছাড়িয়ে গেছে। বাড়িতে তো ছিলে না, কখন ফিরলে?

শরৎ : দুর্গামন্দিরে গিয়েছিলাম। পুজো করলাম—প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরছি। কিন্তু তুমি—তুমি এখানে কেন?

বা-থিন : আমার প্রতিমাও বিসর্জন হয়ে গেছে দাদা।

শরৎ : (আঁকাইয়া উঠিয়া) কে সি বা-থিন! ইরাবতী—ইরাবতী কোথায়?

বা-থিন : তোমার বিছানায় ঘুমাচ্ছে।

শরৎ : আমার বিছানায় ঘুমাচ্ছে। যাঃ বাবা, সব গুলোট পালট করে দিলে। তোমাকে বিয়ের বাগদান করে এ স্পর্ধা তার এল কোত্থেকে?

বা-থিন : তোমাকে সে ভালবেসে ফেলেছে হয়তো এই অধিকারে।

শরৎ : আমাকে সে ভালবাসে! কই, বুঝিনি তো কোনদিন?

বা-থিন : আমাকে যে সে ভালবাসে, এও তো আমি বুঝিনি কোনদিন।

শরৎ : তবে বাগদানটা হোল কি করে?

বা-থিন : ভালটা আমিই তাকে বেসেছিলাম শরৎদা। আর তা বেসেছিলাম, ওর যখন কোন নামই হয়নি নর্তকী রূপে। ওকে মঙ্গল করে আঁকা আমার ছবি বাজারে ছাড়িয়ে পড়তেই ওর নর্তকী জীবনের শুভ সূচনা হোল। বুঝে কৃতজ্ঞতায় ও আমাকে করল

বরদা—করুণ বাগবাদ। কিন্তু আমার সেই ইরাবতীর আজ কত নাম। তাকে ঘিরে আজ মোসাহিবের ভিড়।

শরৎ : কিন্তু তাতে তুমি বাধা দাও নি?

বা-থিন : আজ সেই ভিড়ে আমি হারিয়ে গেছি শরৎদা।

শরৎ : তুমি যে ওকে কতটা ভালবাসো, ও কি তা জানে বা-থিন?

বা-থিন : যে ভালবাসায় গোপার মুখ আঁকতে গিয়ে ইরাবতীর মুখ হয়ে যায় সেটা যদি ওর জানা থাকে—তবে তা জানে।

শরৎ : তাতে তোমার তিন হাজার টাকা মাথা যাচ্ছিল, সে দুঃখের চেয়ে ওর আনন্দই হয়েছিল বেশি। কারণ তুমি গোপার মুখ আঁকতে গিয়ে, তোমার মনেও অলক্ষ্যে ওর মুখখানা এঁকে ফেলেছিলে। হাঁ, ইরাবতী আমাকে এসব খুব গর্বের সঙ্গেই চুপি চুপি বলেছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না বা-থিন, ইরাবতী আমার বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে কেন? আর তুমি তাতে বাধাই বা দিলে না কেন?

বা-থিন : আজ আমার সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছে।

শরৎ : ঝগড়া! কেন?

বা-থিন : হঠাৎ ওর কি খেয়াল হোল, গার্ডেনিং হাউসে জুয়া খেলতে যাবে, আর সঙ্গে যেতে হবে আমাকে। আমি বললাম—আমার হাতে জরুরী কাজ আছে, আমি যেতে পারব না। তাছাড়া জুয়া খেলা আমি পছন্দও করি না। শুনে আগুনের মত জ্বলে উঠল সে। বলল—তুমি না গেলেও আমার লোকের অভাব হবে না। জেনে রেখো, এই যে যাচ্ছি, আর আমি ফিরছিও না। তোমার মত সন্ন্যাসী সঙ্গী নিয়ে ঘর করা আমার চলবে না। এই বলে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল সে।

শরৎ : কষ্ট।

বা-থিন : হ্যাঁ। সেইটার আমি যেমন ভয় পেয়ে গেলাম। খামখেয়ালী মেয়ে, না জানি কোথায় কি করে বসে! সাইকেল নিয়ে আমিও পিছু নিলাম। দেখলাম, শেষটায় তোমার বাড়িতে ঢুকে গাড়িটা ছেড়ে দিলে: ভেবে কাল, তুমি বাড়ি নেই। ইরাবতী সোজা তোমার ঘরে ঢুকে তোমারই বিছানাতে শুয়ে পড়েছে।

শরৎ : বাঃ, এতো আর মজার রাগ! আমি তো এই মাত্র বাড়ি ফিরছি। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোল। নইলে আমি সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেই—হয়েছিল আর কি। একেবারে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। কি কাণ্ডটা হোতো বলতো? একেই তো আমার কলঙ্কের সীমা নেই। ভাগ্যিস তুমি ছিলে, নইলে কাল আমি তোমাকে মুখ দেখাতাম কি করে বা-থিন? আর তুমিই বা কেমন! রাগ ছেড়ে দিয়ে বসে আছ। জান বা-থিন, ও হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে যারা প্রেমের উদাসীন বা উদাসতা চায় না, প্রেমের শাসন বা পীড়ন চায়। বিজিত হতেই ওদের আনন্দ। পরখ করে দেখবে? তুমি যেখানে শুয়ে ছিলে ওখানেই মুখ ঢেকে শুয়ে থাক। ও জানে না তুমি এখানে আছ। তোমার কথা ও কি বলে নিজের কানেই শুনে যেও। আমি ওকে এখনি এখানে টেনে নিয়ে আসছি।

(শরৎচন্দ্রের প্রস্থান। কণিক বাদে। শরতের নির্দেশ অনুযায়ী বা-থিন পূর্ববৎ মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলেন।...শরৎ ইরাবতীকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন)

শরৎ : হি-হি-হি, এ তোমার কি কাণ্ড বল দেখি ইরাবতী? এরপর আমি বা-থিনের কাছে মুখ দেখাতাম কি করে?

ইরা : সে আমি জানি না শরৎদা। লোকটাকে আমার বিয়ে করবার কথা। কিন্তু ওর আগে লোকটা সত্যিই আমাকে ভালবাসে কিনা—ভালবাসলে কতটা ভালবাসে, আমার জানা দরকার। ওকে তো আমি বলে এসেছি জুয়া খেলতে যদি আমার সঙ্গে না যাও, আমি বাব কিন্তু। আমার সঙ্গে যাওয়ার লোকেরও অভাব হবে না—তোমার ওরেও ফিরে আসব না আর। ওর চোখের উপর দিয়ে—ওর নাকের উপর দিয়ে—রাতের বেলা আমি বেরিয়ে এসেছি। (প্রায় কাঁদিয়া) তা একটিবার আমাকে আটকাতে এল? জোর করে ধরে বেঁধে রাখল? সামনে দিয়ে একটা চড়ুই পাখি উড়ে গেলে লোকে তবু আকিয়ে দেখে। আমি চলে এলাম, ও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এ হোল প্রথম রাতের কথা। রাত শেষ হতে চলল—ও আমার কোন খোঁজ করল? আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি শরৎদা, ও যদি ভোর বেলায় তোমার এখানে এসে দেখে আমি তোমার বিছানায় শুয়ে আছি, ও হয়তো বড় জোর আমাকে জিগেস করবে—ভাল ঘুম হয়েছে তো? পরখ করে দেখবে? ডেকে পাঠাও ওকে।

শরৎ : না না, ডেকে পাঠাতে হবে না। কেনো ইরাবতী ওর মন-প্রাণ তোমার কাছেই পড়ে আছে।

ইরা : (চোটিয়া গিয়া) রাখ তোমার ওসব পাণ্ডিত্য কথা। আমার কি হবে শরৎদা? এমনি একটা উদাসীন নিষ্প্রাণ সন্ন্যাসীকে নিয়ে আমার চিরকাল ঘর করতে হবে?

শরৎ : কিন্তু ইরাবতী, গোপার ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে ওর ভালবাসার অতবড় একটা প্রমাণ পেয়েও কি করে বল ও তোমাকে ভালবাসে না?

ইরা : (উত্তেজিত হইয়া) বল না—বল না, সেকথা আর বল না। শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। জাতক পুঁথিতে আছে—গোপা ছিল পরমা সুন্দরী। বা-থিন তো আর গোপাকে স্বচক্ষে দেখেনি। সোনা সুন্দরী মনে হওয়াতেই আমাকে করেছিল তার সব ছবির মডেল। কল্পনাসুন্দরী গোপার মুখ আঁকতে গিয়ে আমার মুখ না এঁকে ওর উপায় ছিল শরৎদা? নিজের স্বার্থেই বা-থিন মশাই আমার মুখখানা এঁকেছিল।

শরৎ : তাইতো! তবে যে তুমি চুপিচুপি সেদিন আমাকে বলেছিলে—পৃথিবীতে প্রেমের ইতিহাসে এই ছবি আঁকার ব্যাপারটি অমর হয়ে থাকবে।

ইরা : তখন তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ কি মনে হচ্ছে জান শরৎদা—

শরৎ : কি?

ইরা : তুমি যদি আমাকে তুমি করে ভারতবর্ষে বেড়াতে নিয়ে যাও। আমি তোমার বলে রাখছি ও পুলিশেও খবর দেবে না।

শরৎ : হ্যাঁ, এখন যা বুঝছি তাতে তাই মনে হচ্ছে। তা আমার খুব লোভ হচ্ছে ইরা। কিন্তু আমার তো টাকা নেই।

ইরা : আমার টাকা আছে শরৎদা। কথা হয়েছিল আমি কথাকলি নাচ শিখব, আর বা-থিন অজন্তা-ইলোরা আর তাজমহলের শিল্পকলা দেখবে। এই ছিল আমাদের এতদিনের স্বপ্ন। তা আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় যখন ওর নেই, তুমি আমায় নিয়ে চল শরৎদা।

শরৎ : কিন্তু আমার এখানকার চাকরি?

ইরা : রেখে দাও তোমার চাকরি। কটাকা মাইনে পাও? আমি দেব।

শরৎ : বাঃ, তবে তো আর কথাই নেই। ইরাবতী, আজই জাহাজ ছাড়ছে; বা-থিন যখন তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, কোন উচ্চবাচ্যই করছে না, তবে চল আমরা আজই বেরিয়ে পড়ি। (চিৎকার করিয়া) বা-থিন, তুমি জানছ না, কি রত্ন আজ তুমি হারাচ্ছ।

(আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বা-থিন গর্জন করিয়া উঠিলেন)

বা-থিন : খবরদার!

ইরা : একি বা-থিন! এখানে?

শরৎ : সর্বনাশ!

(বীরবিক্রমে বা-থিন উহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

১লা আগষ্ট দেবীর মর্ত্তলোকে শুভ আবির্ভাব

সর্বদুঃখ ত্রাতা "সন্তোষী মা'র" পূর্ণ জীবনলেখ্য

পরিচালনা **বিজয় শর্মা** • সংগীত **সি. অর্জুন** • পরিবেশনা **পারশনাথ পিকচার্স**

বিজলীবালা - মনোলাইট - কালিকা ছায়া - বঙ্গবাসী - পিকাডিলি শৈলশ্রী - পিয়ালী - রাখাল্লী
চন্দন (শিলচর) লক্ষ্মী (টিটাগড়) - শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) - ভাটপাড়া (ভদ্রেশ্বর)
অন্নপূর্ণা (ব্যান্ডেল) - চিত্রা (আসানসোল)।

বা-থিন : শরৎদা, আমার মনে এ সন্দেহ ছিল, তাই সারারাত এখানে পাহারা দিয়ে বসে আছি। তোমাকে আমি গুলি করে মারব। (পকেটে হাত দিয়া যেন রিভলবার না পাইয়া) রিভলবারটা নেই তাই বেঁচে গেলে। (চিৎকার করিয়া) পালাও।

(শরৎচন্দ্র প্রাণটা যেন খুব বাঁচিয়া গেল এবং তজ্জন্য বা-থিনকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার অভিনয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পলায়ন করিলেন)

বা-থিন : (বজ্রকণ্ঠে সগর্জনে) ইরাবতী!

ইরা : (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমাকে ক্ষমা কর বা-থিন। ছবি আঁকতে আঁকতে এমনি মজে থাক যে আমাকে একটু আদর করতেও ভুলে যাও।

বা-থিন : (বজ্রকণ্ঠে) আর ভুলব না। আমার বুকে এসো।

(অনন্দাশ্রু পরিপ্লাবিত ইরাবতী বা-থিনের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন)

বা-থিন : (মৃদুকণ্ঠে) নিজের ঘরে চল।

(বলিয়া ইরাবতীকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন)

।। ষষ্ঠ কাণ্ড ।।

(শরৎচন্দ্রের বাসা। কাল:—সকাল।)

(দৃশ্যটি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। একতলার কোন বাসিন্দা প্রভাতী গান 'হরে কৃষ্ণ' নাম গান গাহিতেছে এবং একতলার বাসিন্দা মিস্ত্রি হরিহর চক্রবর্তীর একমাত্র কুমারী কন্যা শান্তি একটি পাত্রে কিছু ফুল লইয়া গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে গাহিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন যে, এই বাসার সকলে এখনও নিদ্রিত, সেই মুহূর্তে তাহার কণ্ঠের সুর স্তব্ধ হইয়া গেল)

শান্তি : বাঃ চমৎকার! এ রাজ্যে দেখছি এখনও ভোর হয়নি! মুনিবটি ঘুমোচ্ছেন তো চাকরটিরও ওঠবার নাম নেই। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) ভোলা—এই ভোলা। —এরা সব আছে বেশ! কাল রাতে মদ খেয়ে এখনে খুব চলাচলি হয়েছে নিশ্চয়ই। আমি আছি বেশ, নীচে রাত দুপুর পর্যন্ত চলে বাপের গালা-ভাঙের আড্ডা, আর ওপরে মনিবের এই মদের কোয়ারা। আমি এখানে থাকব না—আমি এখানে থাকব না, আমি কলকাতা পালাব। লোকে কোলকাতা থেকে পালিয়ে এখনে আসে—আমি এখান থেকে কোলকাতায় পালাব। শহর থেকে দুমাইল দূরে মিস্ত্রিদের এই বস্তিতে কোন বামুনের মেয়ে টিঁকতে পারে? মাকে লিখে পাঠিয়েছি—টাকার জোগাড় হলেই আমি পালাব। যাঃ বাবা, ভোলাটা এখনও এলো না! এই লাট সাহেবের নাতি—খেয়াল আছে যে সূর্যিঠাকুর মাথায় চড়েছেন। তোর কালকর্ম সব করবে কে শুনি। এই ভোলা—ভোলা—

(চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ভোলার প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া শান্তি বলিলেন)

শান্তি : এই যে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে দেখছি। তা কাল রাতে বুঝি খুব চলেছে?

(ভোলা নীরবে মাথা নাড়িয়া সমর্থন জানাইল)

শান্তি : দলবল এসেছিল?

(ভোলা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না')

শান্তি : তবে?

ভোলা : একাই একশো—

শান্তি : খাওয়া-দাওয়া?

ভোলা : ঐ মদই খেয়েছেন—আর কিছু নয়।

শান্তি : তুমি?

ভোলা : উনি না খেলে আমি কি করে খাই?

শান্তি : কেন, উনি যা খেলেন-তার একটু পেসাদ—গিলসেই তো হোত।

ভোলা : (লজ্জায় জিভ কাটিল)

শান্তি : ওঃ, লজ্জার বহর দেখে বাঁচিনে। তা এখন মনিবটির ঘুম ভাঙাও। ধরাধরি করে কুয়োতলায় নিয়ে যাও—চান করাও। যাও।

ভোলা : ওরে বাবা! ও আমি পারব না। লাথি খাবে কে?

শান্তি : তবে কে পারবে শুনি?

ভোলা : পারলে তুমিই পারবে শান্তি দিদি। আমি বরং উনুনটা ধরিয়ে দিই গে, চা করতে হবে তো।

শান্তি : আপ খোরাক পাঁচ টাকা মাইনেতে আমি তোর বাবুর রান্নার কাজ করি। ঘুম ভাঙাতে গিয়ে লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে এমন কোন কথা নেই। সেহাৎ পাড়ার দাদাঠাকুর—সবাই মান্যগান্য করে, ভালবাসে, তাই আমিও একটু মাঝে মাঝে রান্নার খাটি। নইলে আমার কি? মদ গিলে উনি যদি এ বস্তির আর দশজনের মত গোল্লায় যান, আমার কি বলবার আছে? তবে হ্যাঁ, পাঁচজনের উপকার করে বেড়ান, সেইটে বন্ধ হবে। তাই একটু দেখা-শোনা করতে হয়।

(কথার মাঝে ভোলা চলিয়া গেল। কথার শেষাংশে শরৎচন্দ্র নিদ্রাজড়িতভাবে বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন)

শরৎ : কোর, বক্ বক্ করে শেষ রাতের কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি? ও, সাত-সকালেই অশান্তি! ও বাবা! রোদ উঠে গেছে দেখছি। তা উঠুক। আমি এখন উঠতে পারব না—আবার শোব। (ইজি-চেয়ারে শুইয়া) ওরে আমার অশান্তির শান্তি, তুই একটু গা-হাত-পা টিপে দেতো। খোঁয়াড়িটা ভাঙুক, তবে তো উঠতে পারব।

শান্তি : সে আমি পারব না দাদাঠাকুর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি—সে বামুন নারায়ণকে করি, মাতাল নারায়ণকে তো না। ভাত ফুটিয়ে দেওয়া আমার কাজ, আমি সেই কাজেই চললুম।

শরৎ : আরে শোন-শোন, রাগ করছিস কেন? তুই ভাত রাঁধলে খাবে কে, আমি যদি উঠতেই না পারি?

শান্তি : বেশ, পা টিপছি। সে আমি নারায়ণের পা টিপছি জেনে রাখবেন—সে আপনার পা নয়। বলিয়া পা টিপতে টিপতে গাহিতে লাগিলেন) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে'—(ইত্যাদি)

শরৎ : ওরে বাবা, একি বিপদ!—তারক ব্রহ্ম নাম। এ নাম-গান তো আর সহ্য করতে পারছি না। থাক্—থাক্। (শান্তিকে) এ অশান্তি থাক্। এইবার আমাকে একটু তুলে ধর দেখি বাপু।

শান্তি : আচ্ছা দাদাঠাকুর, একি আমার কাজ! এসব ছাই-পাঁস আপনি গেলেন কেন?

শরৎ : কি, যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

শান্তি : যাচ্ছি—এখুনি যাচ্ছি। দেখব ভাতের হাড়ি ঠেলে কে। এ তল্লাটে বামুনের মেয়ে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাও কুলীন বামুনের মেয়ে। বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি।

শরৎ : ওঃ, তারী যে তেমাক দেখছি! তোর বাপে এসে সাধা-সাধি করে গেছে, তাই তোকে রাঁধুনীর কাজ দিয়েছি। নইলে আমিতো বামুন ঠাকুরের হোটেলেই খেতুম। তা সে হতভাগা কোথায়—ভোলা?

শান্তি : তিনি তো লাট সাহেবের নাতি। তাঁর মনিব যতক্ষণ ঘুমোবেন তিনিও ততক্ষণ ঘুমোবেন। তাঁর মনিব খাবেন তো তিনিও খাবেন। কাল রাতে তিনিও খাননি।

শরৎ : ও তাইতো! কাল রাতে কিছু খাওয়া হয়নি, তাই এই সাত-সকালেই এত খিদে পেয়েছে। তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?—চলে যাবে বলছিলে—যাও চলে। কে তোমাকে ধরে রেখেছে?

শান্তি : যখন যাব—তখন যাবই। একেবারেই যাব। কারও বাধা হবে না ঠেকাতে। আজ যখন এসে কাজে হাত দিয়েছি, পুরো কাজ করেই যাব। এ দিনটায় মাইনে কাটতে দেব না। কিন্তু আজই শেষ। একতলায় বাপের হাতে এমন যন্ত্রণা, আর দোতলায় মনিবের মুখে এমন গঞ্জনা। এতে প্রাণ বাঁচে! আপনার কাছে আমার জমানো টাকার যে খাম রয়েছে—তা আমি ফেরত চাই। চলে যাব, ভ্যাং ভ্যাং করে চলে যাব কোলকাতায়। মা মরে গেলে কি হবে, এখনও মামা বেঁচে রয়েছে। ভাবনাটা কি?

(বলিয়াই কাজে যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন শান্তি)

শরৎ : দাঁড়া, টাকার খামটা নিয়ে যা।

শান্তি : সেতো আমি এখন চাইনি, যখন আমার নেবার দরকার হবে তখন নেব।

শরৎ : শোন্ অশান্তি।

শান্তি : আপনি আমার অশান্তি বলে ডাকবেন না। আপনাকে আমি অনেকবার বলেছি, আমার নাম অশান্তি নয়—শান্তি।

শরৎ : তা হ্যাঁ, এখন শান্তি। হ্যাঁ রে শান্তি, চায়ের কতদূর?

শান্তি : সবে উনুনে ধরিয়েছে। এখনও তো দুধই আসেনি।

শরৎ : আমার ভোলানন্দ মহারাজটি কোথায়?

(দুধ লইয়া ভোলার প্রবেশ)

শান্তি : ঐ যে এতক্ষণে দুধ নিয়ে এলেন। (ভোলাকে) এসো—রান্নাঘরে এসো।

(শান্তির রান্নাঘরে গমন)

শরৎ : হ্যাঁরে, কাল রাতে তুইও খাসনি?

ভোলা : না কর্তা—হাঁ কর্তা—

শরৎ : না কর্তা—হাঁ কর্তা। শোন কর্তা, আমি কুয়োতলা থেকে চান করে আসছি। দুধ রেখে কাপড়, গামছা, তেলের বাটি চট করে নীচে দিয়ে আয় দেখি।

(ভোলা আদেশ পালন করিতে গেল। একতলা হইতে শান্তির পিতা হরিহর চক্রবর্তীর প্রবেশ। বয়স্ক লোক, টাক মাথা, খর্বকায় গোলগাল চেহারা। স্নান সারিয়া খালি গায়ে পা টিপিয়া-টিপিয়া অনেকটা চোরের মত এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

হরিহর : (চুপিচুপি) হতচ্ছাড়াটা কোথায়?

শরৎ : রান্নাঘরে চা জলখাবার করছে।

হরিহর : বুঝলেন দাঁঠাকুর, এখন আমার পকেট কাটা সুরু করেছে। কেমন উড়ু উড়ু ভাব দেখছি। ওই মা-মরা মেয়েটার একটা গতি করার জন্যই এ বয়েসেও মান-মর্যাদা খইয়ে কল-কারখানায় মিস্তির কাজ করছি। তা এতটুকু পিতৃভক্তি আছে? কি কাল পড়েছে বলুন দাঁঠাকুর। মেয়ে হয়ে বাপের পকেট কাটছে! আর সে পয়সা যে রাখে কোথায়, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বের করতে পারছি না। নিশ্চয়ই মানুষ জুটিয়েছে মশাই—মানুষ জুটিয়েছে।

শরৎ : রান্নাঘরেই রয়েছে কিন্তু। শুনতে পেলেই এখানে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। তখন কিন্তু আমি কাউকেই ছেড়ে কথা কইব না।

হরিহর : ও হ্যাঁ, তাইতো। আমার টাকার খামটা? এই ফাঁকে কিছু রেখে যাচ্ছি। নইলে পকেটে থাকবে না—মেরে দেবে।

(শরৎচন্দ্র ড্রয়ার খুলিয়া খামটি বাহির করিলেন)

শরৎ : (খামের শিরোনামাটি পড়িয়া) হ্যাঁ, এই তো হরিহর চক্রবর্তী। নিন।

(খামটি হরিহর চক্রবর্তীর হাতে শরৎচন্দ্র দিলেন। হরিহর খামটি লইয়া তাহার মধ্যে কিছু নোট ঢুকাইয়া পুরোপুরি ভর্তি খামটা শরৎচন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দিলেন)

শরৎ : খামটায় পেটে আর জায়গা নেই দেখছি। আর কিছু জমা পড়লে ফেটে যাবে। একটা বড় নম্বর খাম আনবেন।

হরিহর : না, আর বোধ হয় লাগবে না। ঐ ঘোষাল বুড়ো এসেছে—মেয়েটাকে মনে ধরেছে। বিয়ে করতেই চাইছে। আমার ঘর-খরচা বাবদ এতদিন কিছু কিছু দিচ্ছিল, আজই ওর শেষ দেওয়া। এই শেষ দেওয়াটাই জমা রেখে গেলাম।

শরৎ : ও!

হরিহর : আচ্ছা চলি। বুড়ো আবার নীচে বসে রয়েছে—চলি।

(হরিহর নীচে চলিয়া যাইতেছিলেন)

শরৎ : শুনুন।

(হরিহর দাঁড়াইলেন)

শরৎ : আচ্ছা যান।

হরিহর : কিছু বলবেন মনে হচ্ছিল?

শরৎ : না, কি আর বলব? আপনার পাঁঠা আপনি নিজেই কাটুন আর মাথাতেই কাটুন, আমার কি বলবার আছে?—আচ্ছা আসুন।

হরিহর : ও। হতচ্ছাড়িকে একবার নীচে পাঠিয়ে দেবেন তো। নইলে ওই ঘোষালবুড়ো আবার আপনার এখানে উঠে না আসে—

শরৎ : (ক্রুদ্ধমূর্তিতে) খবরদার।

হরিহর : এই দেখুন। এই কি বিপদে আমি পড়েছি মা তারাই জানেন।

তারা—তারা! বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!

(হরিহর কাঁদিতে কাঁদিতে নীচে নামিয়া গেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মাধব মিস্তির প্রবেশ)

মাধব : দাঁঠাকুর!

শরৎ : কি রে মাধব? কি হয়েছে?—কাঁদছিস কেন?

মাধব : দাঁঠাকুর আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমার ছোট ছেলেটা থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে—

শরৎ : কেন?

মাধব : কি করে বলব দাঁঠাকুর? থেকে থেকে চমকে উঠছে—সারা গা কাঁপছে—মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—গোঁ গোঁ শব্দ করছে—

শরৎ : মনে হচ্ছে তড়কা হয়েছে। আচ্ছা, আমি ওষুধ দিচ্ছি। বেলেডোনা—থ্রি এক্স। (দিতে গিয়া) আচ্ছা, কোন জন্তুর পেয়েছিল?—এই ধর—কুকুর তাড়া করেছিল, কি কেউ ছুতের বর দেখিয়েছিল?

মাধব : না দাঁঠাকুর।

শরৎ : ছেলেটা কেমন রে?—হাসিখুসি না খিট্‌খিটে?

মাধব : খিট্‌খিটে। একেবারে মায়ের স্বভাব। কথায় কথায়-রেগে গিয়ে আমার গায়ে থুথু দেয়। মানে——যেমন দেখেছে, তেমনি শিখেছে।

শরৎ : এই তো বেশ মিলে যাচ্ছে। এইবার শেষ প্রশ্ন—একটা গাল লাল, আর অপরটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে? মানে—ক্যামোমিলা—থ্রি এক্স।

মাধব : একটা গাল লাল, অপরটা ফ্যাকাশে? সেটা তো দেখে আসিনি দাঁঠাকুর। এই তো পাশেই আমার ঘর। দয়া করে তুমিই একবার চল দাঁঠাকুর। (শরতের পদধারণ)

শরৎ : আরে ছাড়ু—ছাড়ু। লক্ষণ না মিলিয়ে তো আমি ওষুধ দিতে পারি না মাধব। বেশ, তবে চল্ আমিই যাই। নে, ওষুধের ব্যাগটা নে।

(মাধব ওষুধের ব্যাগটা হাতে লইলেন এবং শরতের সহিত দ্রুত পদে চলিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় একটি ট্রে-তে করিয়া চা ও জলখাবার লইয়া দ্রুতপদে শান্তির প্রবেশ। পিছনে ভোলার প্রবেশ এবং হাতে তেল-গামছা ও ধুতি)

শান্তি : গ টা—এই সব গ টা—

শরৎ : (চলিতে চলিতে) ভোলা—ঐ ছোকরাটা—কাল রাত থেকে কিছু না খেয়ে আছে। ওকে খাইয়ে দাও। আমি রোগী দেখে ফিরে এসেবার ভাত খেয়ে আফিসে যাব।

ভোলা : গলটা সেরে দেবেন না কর্তা?

শরৎ : গল আজ আর হবে না। ছোকরাটাকে বাঁচাতে হবে তো।

(শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন, সংগে ভাবব। শান্তি কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—পরে ভোলা কহিলেন)

শান্তি : নাঃ, আর কেন? তুমিই চলটা সেরে এসে দয়া করে এগুলো সব মিলে আমাকে উদ্ধার কর।

(শান্তি প্লেট-টা ভোলার দিকে আগাইয়া ধরিলেন)

ভোলা : প্রভুর যখন তাই ইচ্ছা—দাও।

(শান্তির হাত হইতে ভোলা প্লেট-টি লইল)

শান্তি : ও—চক্ষুর কি বরাত! ওগুলো গিলে বাজারটা চট করে আন দেখি। এখনি তো আবার বাড়া ভাত চাই; তা খাবার সময় ছোক আর না ছোক। চই কি রোগীর বাড়ি থেকেই হয়তো ছুটে আসবেন আপিসে। এমন পাগলের সংসারে আর কিছুদিন বাস করলে আমিই পাগল হয়ে যাব। এসব আর আমার চলবে না, আমি কালই কোলকাতা চলে যাব। মামার বাড়িতে কি-পিরি করে খাব সেও ভাল—কিন্তু এখানে আর নয়।

(শান্তি ভিতরে প্রস্থান করিলেন। এই সময় দেখা গেল হরিহর চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। তাঁর অনুগমনকারী ঘোষাল বুড়োর উদ্দেশ্য বলিতেছেন)

হরিহর : ঘোষালমশাই শিগগির আসুন। যে বাড়িতে রুগী দেখতে গেছেন, সে খুব কাছেই, যখন-তখন ফিরে আসতে পারেন। আপনার যা বলবার আছে এই ফাঁকে বলে যান। চাকরটাও বাজারে গেছে।

(মদমত্ত অবস্থায় ঘোষাল বুড়োর প্রবেশ)

ঘোষাল : হাঁ—হাঁ, শাস্ত্রেই বলেছে—শুভস্য শীঘ্রম্। তা এখানে তো অশান্তি দেখছি—শান্তি কই?

হরিহর : শান্তি—এই শান্তি। বাইরে এসে একটু শুনে যা মা। ঘোষালমশাই কি বলবেন। (শান্তি প্রবেশ করিলেন)

শান্তি : (সবিস্ময়ে) কি সাহস তোমাদের! চৌরাস্ত করতে শেষে তোমরা এখানে এসে গেছ?

ঘোষাল : ঘরের বৌ ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। এতে কার কি কইবার আছে? অপিসটাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে যত্নেরক্ষা করতে ধর্মতঃ কর্মতঃ, এর চাইতে বড় ধর্ম আর কি আছে? (শান্তির দিকে অগ্রসর হইয়া) গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমার হাত দুখানি ধরে ঘুপটি-ঘুপটি বলে চলে এসো। বকেলে হরিহর, এ সময়ে একটু উলু দিতে হয়। কেউ যখন নেই, তুমিই সেটা দাও।

শান্তি : ওরে বুড়ো শয়তান! আজ তোমার এত সাহস? আসছি—

(বলিয়া ছুটিয়া শরৎচন্দ্রের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন শান্তি এবং ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন)

ঘোষাল : অ চক্রবর্তী, এটা কি রকম হোল! এ কি অশান্তি বল দেখি।

হরিহর : দাঠাকুরের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলে, শব্দ শুনলে না? বেটির পেটে পেটে শয়তানি। তোমরা ঘর ভরুন দেখি, এক পলকে খেয়ে নিয়ে ভেবে দেখা যাক—এখন কি করা যায়—

(ঘোষাল পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া নিজে এক ঢোক খাইলেন, চক্রবর্তীকে বোতলটি দিলেন এবং চক্রবর্তীও এক ঢোক মদ্য পান করিয়া বোতলটি ঘোষালকে ফেরত দিলেন)

হরিহর : দাঠাকুর এসে পড়লেই আগুন জ্বলে উঠবে। এখন থাক্। চলুন আমরা কেটে পড়ি। হতচ্ছাড়ি নীচে না নেমে আর কোন চুলোয় যাবে? নীচেই আপনাদের দুহাত এক করে দেবোখন।

ঘোষাল : না-না—না, ও আর নীচে নামবে না। তোমাদের ওই দাঠাকুরই ওকে মজিয়েছে। তামাকও খাচ্ছে ডুডুও খাচ্ছে।

হরিহর : দেখুন ঘোষালমশাই, আর যাই বলুন, ঐ কথাটি বলবেন না। আমাদের ওই দাঠাকুরটি মদ-টদ খায়, ইয়ার-বন্ধু নিয়ে গান-বাজনা, খানা-পিনাও করে। কিন্তু চরিত্তির দোষটি কোনদিন নেই। ওঁর নামে এ কলঙ্ক দিলে পাপ হবে ঘোষালমশাই। দাঠাকুরকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, চলুন নামি।

(শরৎচন্দ্রের গলা শোনা গেল)

নেপথ্যে শরৎ : কামোমিলা—এক ডোজ কামোমিলা—কি ডোজ খেলব!

হরিহর : এই রে, আপনার আমার যম এসে গেছে!

(শরৎচন্দ্রের প্রবেশ)

শরৎ : সিকস একস এক ডোজ কামোমিলা কি ডোজটাই—(ইহাদের দেখিয়া) এ কি! আপনারা মশাইরা এখানে কেন?

হরিহর : (ঘোষালকে) বলুন না ঘোষাল মশাই, কি বলবেন বলুন। আপনার ব্যাপারটা কি?

ঘোষাল : আরে বাবা কন্যাদায় তোমার, যা বলবার তুমিই বল।

শরৎ : কিন্তু এখন কিছু শোনবার আমার সময় নেই, আমার অফিসের তাড়া আছে। (সোজা শয়নকক্ষের দরজায় গিয়া) একি! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কেন? (ভিতরের দিকে তাকাইয়া উচ্চৈস্বরে) ঘরের ভেতরে কে? দরজা খুলে শিগগির বাইরে এসো বলছি।

ঘোষাল : (চিৎকার করিয়া) আমার বিয়ে করা বউকে মশাই আপনি আপনার ঘরের মধ্যে কিডন্যাপ করে রেখেছেন।

(দরজা খুলিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শান্তি ছুটিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্রের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন)

শান্তি : আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে রক্ষা করুন দাঠাকুর।

শরৎ : কি হয়েছে শান্তি? স্থির হয়ে বল। কান্নাকাটি আমি ভালবাসি না।

শান্তি : ওই দুই শয়তান নেশার ঝোঁকে এখানে ঢুকে পড়েছে। এই ঘাটের মড়া বুড়োটা নেশার ঝোঁকে দাবি করছে, আমি নাকি ওর বউ। কেমন বউ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। (অদূরে একটি কাটা পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ঘোষালের সামনে ঘুরিয়া গিয়া) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে আমি তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করব।

শরৎ : আঃ শান্তি। এ সব কি হচ্ছে? তুমি সরে এসো, যা করবার আমি করছি। (শান্তি সরিয়া আসিলে হরিহরকে) আজ সকালে আপনি যে পাত্রের সংগে শান্তির বিয়ে দেবেন বলেছিলেন, ইনিই বুঝি সেই পাত্র?

হরিহর : হাঁ দাঠাকুর।

শরৎ : তা এর মধ্যে বিয়েটা হোল কখন?

হরিহর : হয়নি, আজই হবে।

ঘোষাল : আজ সকালেই একশ' টাকার কড়কড়ে নোট হরিহরের হাতে ঘর-খরচা বাবদ ধরিয়ে দিয়েছি। বিয়েটা তো তখনই হয়ে গেছে। বাকি আছে শুধু ঘরকন্না—রংরক্ষা—

শান্তি : (কাটা তুলিয়া) ঘুরিয়া সেটা এই আমার হাতে—দেখাচ্ছি—

শরৎ : আঃ শান্তি, এ সব ভাল হচ্ছে না কিন্তু। এটা তোমার বাপের ঘর নয় যে কাটা হাতে যখন-তখন—যাকে-তাকে—

ঘোষাল : ওরে বাবা! এই বউ ঘরে তুলতে হবে? থাক্ বাবা। চক্কোত্তী, আমার টাকাটা ফেরত দাও। এখানে আমার দম আটকে আসছে। আমি নীচেই যাই—

হরিহর : হাঁ, সেই ভাল। আপনি নীচে গিয়ে আমার ঘরে বসুন ঘোষালমশাই। আমি হতচ্ছাড়ীর চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আপনার হাতে সম্প্রদান করছি। বন্ধুজনের সামনে মালাবদল করে আজই বিয়েটা হয়ে যাক।

ঘোষাল : সেখ। জয় গুরু—জয় গুরু। (ঘোষাল চলিয়া গেলেন)

শরৎ : শান্তি ঠিকই বলেছে—দাতের মতো ঐ দাতের মতোর সঙ্গে এই মা-মরা মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দেবেন চক্কোত্তি-মশাই?

(চক্রবর্তী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন)

হরিহর : (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি বড় গরীব। নেশা-টেশা করি। যা রোজগার করি, তাতেই যায়। মেয়েটাকে দু বেলা পেট ভরে খেতেও দিতে পারি না। তার ওপরে মেয়েটার তো ঐ চেহারা। না খেতে পেয়ে দিন দিন হাড্ডিসার হচ্ছে। বিয়ের বয়েস উৎরে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে-কষ্টে ঘোষালকে বিয়েতে রাজী করিয়েছি। আজ সকালে একশ টাকা ঘর-খরচাও গুণে দিয়েছি।

শরৎ : সেটা কিছু বড় কথা নয়, সে টাকা এখনই ফেরত দেওয়া যায়।

হরিহর : কেন দেব—বলি কেন দেব? এই বিদেশে স্বজাতির মধ্যে ওর চেয়ে ভাল পাত্তর আমি পাব কোথায়? লোকটা টাকার কুমীর। মামলা মেয়েটা তবু দুটো খেয়ে-পরে বাঁচবে। তবে হাঁ, ঘোষাল নেশা-ভাঙ করে। সে এখানে কে না করে? আমিও করছি—তুমিও করছ। আর যদি বয়েসের কথা তোল, তবে আমি বলব, পুরুষ মানুষের আবার বয়েস কি?

শরৎ : তবু আমি বলব, বড় ভুল করছেন আপনি। মা-মরা মেয়েটাকে বলি দিতে চলেছেন।

হরিহর : আহা—হা, কি আমার দয়া রে! অতই যদি দয়া, করবে তুমি আমার এই মা-মরা মেয়েটাকে বিয়ে করে উদ্ধার? (চিৎকার করিয়া) করবে, বল করবে?

শরৎ : (সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতভাবে) করব—করব আমি বিয়ে তোমার এই মেয়েটাকে।

হরিহর : য়্যাঁ।

শরৎ : হাঁ।

হরিহর : আমার টাকার খামটা—টাকার খামটা দাও। টাকাগুলো ঐ ঘোষাল বুড়োর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসছি।

(শরৎ চট করিয়া হরিহরের টাকার খামটা তাহার হাতে দিলেন। হরিহর উহা লইয়া নীচে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় বাজার করিয়া ফিরিল ভোলা। শরৎচন্দ্র শান্তির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন ভাবাবেগে কম্পিত শান্তি পড়িয়া গিয়া মূর্ছিত হইলেন)

শরৎ : শান্তি—শান্তি, মূর্ছা গেছে। ওরে ভোলা, জল দে—পাখা আন।

(শুশ্রূষায় শান্তির চৈতন্য ফিরিল। তৎক্ষণে চক্রবর্তীও ফিরিয়া আসিয়াছেন)

হরিহর : চুকে গেছে, সব ঝঞ্ঝাট-গণ্ডগোল চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এ কি!

শরৎ : না না, এই তো জ্ঞান ফিরেছে।

হরিহর : মূর্ছা গিয়েছিল? তা এতে ঘাবড়াবার কি আছে? ওরে ভোলা, ওরে ভোলা, ওরে ভোলা—

ভোলা : আজ্ঞে।

হরিহর : ওরে বাবা! এই বউ ঘরে তুলতে হবে? থাক্ বাবা। চক্কোত্তী, আমার টাকাটা ফেরত দাও। এখানে আমার দম আটকে আসছে। আমি নীচেই যাই—

হরিহর : হাঁ, সেই ভাল। আপনি নীচে গিয়ে আমার ঘরে বসুন ঘোষালমশাই। আমি হতচ্ছাড়ীর চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আপনার হাতে সম্প্রদান করছি। বন্ধুজনের সামনে মালাবদল করে আজই বিয়েটা হয়ে যাক।

ঘোষাল : সেখ। জয় গুরু—জয় গুরু। (ঘোষাল চলিয়া গেলেন)

শরৎ : শান্তি ঠিকই বলেছে—দাতের মতো ঐ দাতের মতোর সঙ্গে এই মা-মরা মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দেবেন চক্কোত্তি-মশাই?

(চক্রবর্তী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন)

হরিহর : (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি বড় গরীব। নেশা-টেশা করি। যা রোজগার করি, তাতেই যায়। মেয়েটাকে দু বেলা পেট ভরে খেতেও দিতে পারি না। তার ওপরে মেয়েটার তো ঐ চেহারা। না খেতে পেয়ে দিন দিন হাড্ডিসার হচ্ছে। বিয়ের বয়েস উৎরে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে-কষ্টে ঘোষালকে বিয়েতে রাজী করিয়েছি। আজ সকালে একশ টাকা ঘর-খরচাও গুণে দিয়েছি।

শরৎ : সেটা কিছু বড় কথা নয়, সে টাকা এখনই ফেরত দেওয়া যায়।

হরিহর : কেন দেব—বলি কেন দেব? এই বিদেশে স্বজাতির মধ্যে ওর চেয়ে ভাল পাত্তর আমি পাব কোথায়? লোকটা টাকার কুমীর। মামলা মেয়েটা তবু দুটো খেয়ে-পরে বাঁচবে। তবে হাঁ, ঘোষাল নেশা-ভাঙ করে। সে এখানে কে না করে? আমিও করছি—তুমিও করছ। আর যদি বয়েসের কথা তোল, তবে আমি বলব, পুরুষ মানুষের আবার বয়েস কি?

শরৎ : তবু আমি বলব, বড় ভুল করছেন আপনি। মা-মরা মেয়েটাকে বলি দিতে চলেছেন।

হরিহর : আহা—হা, কি আমার দয়া রে! অতই যদি দয়া, করবে তুমি আমার এই মা-মরা মেয়েটাকে বিয়ে করে উদ্ধার? (চিৎকার করিয়া) করবে, বল করবে?

শরৎ : (সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতভাবে) করব—করব আমি বিয়ে তোমার এই মেয়েটাকে।

হরিহর : য়্যাঁ।

শরৎ : হাঁ।

হরিহর : আমার টাকার খামটা—টাকার খামটা দাও। টাকাগুলো ঐ ঘোষাল বুড়োর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসছি।

(শরৎ চট করিয়া হরিহরের টাকার খামটা তাহার হাতে দিলেন। হরিহর উহা লইয়া নীচে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় বাজার করিয়া ফিরিল ভোলা। শরৎচন্দ্র শান্তির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন ভাবাবেগে কম্পিত শান্তি পড়িয়া গিয়া মূর্ছিত হইলেন)

শরৎ : শান্তি—শান্তি, মূর্ছা গেছে। ওরে ভোলা, জল দে—পাখা আন।

(শুশ্রূষায় শান্তির চৈতন্য ফিরিল। তৎক্ষণে চক্রবর্তীও ফিরিয়া আসিয়াছেন)

হরিহর : চুকে গেছে, সব ঝঞ্ঝাট-গণ্ডগোল চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এ কি!

শরৎ : না না, এই তো জ্ঞান ফিরেছে।

হরিহর : মূর্ছা গিয়েছিল? তা এতে ঘাবড়াবার কি আছে? ওরে ভোলা, ওরে ভোলা, ওরে ভোলা—

ভোলা : আজ্ঞে।

হরিহর : ওগো, আমার শান্তির একটা ভাল বিয়ে দিও।' (উর্ধ্বে তাকাইয়া) ওগো, শুনছো তোমার শান্তিকে আজ হাত সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি, সে বড়লোক নয় কিন্তু এমন কলাকে আর কারও নেই। এস বাবা, তুলসীতলায় চল। আমাদের দু হাত এক করে দি।

(এতক্ষণে শান্তি ও অপরাহ্নকে শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া হরিহর চলিয়া গেলেন)

।। সপ্তম কান্ড ।।

(শরৎচন্দ্রের বাসা। কাল : সন্ধ্যা)

(কৃষ্ণদাস অধিকারী পরিচালিত শরৎচন্দ্রের প্রীতিভাজন এই পল্লীরই সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও অন্যান্য কয়েক-জন লোক রাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক একটি কীর্তন গান সহযোগে আসরে প্রবেশ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস অধিকারী অন্ধ থাকায় তাঁহার কন্যা মোক্ষদা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং গাহিলেন। গানের শেষাংশে নৃত্য সুরু হইল। শরৎচন্দ্র ও শান্তি গরদ-বস্ত্র পরিহিত হইয়া প্রবেশ করিলেন এবং হাইকমটে বসিলেন। সকলে আনন্দিত হইয়া হরিকমটের বাতাসা তুলসী লইলেন এবং সমবেত কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন)

শরৎ : সবাই তোমাকে কেমন অবাক হয়ে দেখছিল, সেটা চোখে পড়েছে?

শান্তি : আমাকে দেখছিল না। দেখছিল আমার পরা গরদের এই শাড়িখানা। ভাবছিল, এ শাড়ি আমার মতন মেয়ের গায় উঠে খেলো হয়ে গেছে। আর ভাবছিল—

শরৎ : আর কি ভাবছিল?

শান্তি : আশ্বিনের চাঁদে গ্রহণ লেগেছে।

শরৎ : ও, আশ্বিন মানে শরৎকাল। তার মানে, শরৎচন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে?

শান্তি : তা জানিনে, এতে এখন যা বোঝেন।—বুঝলেন কিছু?

শরৎ : কিচ্ছু বুঝিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি, তুমি আমার ঘরে আসাতে আমার অশান্তিটা দূরে হয়েছে। বুঝেছ?

শান্তি : (খুশিতে) হুঁ। মানে, আমি শান্তি তো।

শরৎ : এরপর আজ রাতে আর যে কয়েকজন আসবেন, তাঁদের কথা তো তোমাকে বলে রেখেছি। খাওয়া-দাওয়া, তারপর একটু আনন্দের আসর—

শান্তি : তার মানেই তো—

শরৎ : তা—হাঁ, একটু-আধটু—

শান্তি : শুনুন। আপনাকে একটা গল্প বলছি। এই বস্তিতে একজনের বউ-এর খুব অসুখ করেছিল। বাঁচাই কথা নয়। ম-কালীর কাছে তখন স্বামী মানত করল—মা তুমার বউকে যদি ভাল করে দাও তবে ও মেরে উৎসর্গ আমি সেই জিনিসটি চির-কালের জন্য তোমাকে উৎসর্গ করব যে জিনিসটি আমি সবচেয়ে ভালবাসি। আচ্ছা, এমন অসুখ যদি আমার কখনও হয়, তবে ঠাকুরকে কি দেবেন আপনি। মদ তো?

শরৎ : তার পক্ষে মেরে তুমি।

শান্তি : আমি আপনাকে এত ভালবাসি দেখেছেন আপনি।

(মোক্ষদার সাহায্যে কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণদাস : মা! সন্ধিটি কোথায়—তাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠিক যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। ওরে মোক্ষদা, প্রণাম কর—

(মোক্ষদা শরৎ ও শান্তিকে প্রণাম করিল)

(শরৎচন্দ্র ও শান্তি কৃষ্ণসাধককে প্রণাম করিলেন)

কৃষ্ণ : দীর্ঘজীবি হয়ে সিঁদুরে থাক। এত উঁচু মন তোমার, ভগবান তোমাকে আরও উঁচু করবেন শরৎবাবু।

শরৎ : না খেয়ে যাবেন না কিন্তু অধিকারী মশাই।

কৃষ্ণ : নেমন্তন্ন ছিল আমারই। কিন্তু এই রাতে মেয়েটাকে একলা ঘরে রেখে আসতে পারলাম না।

শরৎ : বেশ করেছেন—খুব ভাল করেছেন। ওটা আমার খেয়ালই ছিল না।

কৃষ্ণ : এই মেয়ে নিয়ে আমার যা বিপদ হয়েছে। রোজগারের ধান্ধায় বেরুনে সেখানে ছুকরিত হয়ে সাপ্তা করে বসে নিয়ে যেতে হয়।

শান্তি : আমাকেও তো একলাই থাকতে হয়। (মোক্ষদাকে) তুমি আমার কাছে থাকবে ভাই? (শরৎকে) থাকবে?

শরৎ : তোমার ইচ্ছা হয়, রাখ। অবশ্য যদি অধিকারীমশাই মত করেন।

কৃষ্ণ : বেশ যাও গো—বেঁচে থাকো। এখানে ওখানে গিয়ে গান গেয়ে রোজগার করতে পারব, মেয়েটার বিয়ের চেষ্টাও করতে পারব। জয়গুরু—জয়গোবি—

(শান্তি মোক্ষদার কাছে টানিয়া লইলেন। সুবলদাস বাহিরে গেলেন। সুরেন মালা ভিতরে এলেন)

শরৎ : এই যে সুরেন। তাই তো ভাবছিলাম তুমি গান গাইতে গাইতে গেলে কেন? যাত্রার খাওয়ার কথাটা তুমি ভুল গোল নাকি?

সুরেন : না না, ভুলবো কেন? আপনি তো আমাকে বলে রেখেছেন দা-ঠাকুর—আমাকে একখানা টপ্পা গাইতে হবে। ভুলে ঐ চিঠিটা বাড়িতে ফেলে এসেছিলাম। নিয়েছিলাম এটা আনতে। এই যে—(চিঠিখানি শরৎচন্দ্রের হাতে দিলেন। পরে শান্তিকে বলিলেন) কি বৌদি, আজ কি রান্না হচ্ছে?

শান্তি : কিছু রাঁধিনি। বললেন, হোটেলে ঢুকে থাকলে তোমাকে আমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব কখন? আজ রাঁধতে হবে না। খাবার আসবে এই হোটেল-এর সেই বামুন ঠাকুরের হোটেল থেকে। ঐ যে খাবার নিয়ে ভোলানন্দ এসে গেছে।

(মিষ্টির বাক্স আর ফুল লইয়া ভোলার প্রবেশ)

শান্তি : (ভোলাকে) খাবারগুলো আবার গরম করতে হবে। তুমি ততক্ষণ ব্যবস্থা করগে যাও। আমি আসছি।

ভোলা : হোটেলের মালিক তোমাকে ফুল আর এই মিষ্টির বাক্স দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন দিদি। ধর।

(ফুল ও মিষ্টির বাক্স শান্তির হাতে দিয়া ভোলা ভিতরে চলিয়া গেল)

শান্তি : (শরৎকে) এত ফুল দিয়ে আমি কি করব?

শরৎ : ভালই হোল, ফুল দিয়ে ঘরটা সাজিয়ে দাও।

শান্তি : (মোক্ষদাকে) যাও না ভাই এই ফুলগুলো নিয়ে আমাদের ঐ মৌবুরঘরটা সাজিয়ে দাও। (মোক্ষদা ফুলগুলি ও মিষ্টির বাক্স লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল)।

শরৎ : ঐ বামুন ঠাকুরের হোটেলে আমি অনেকদিন ছিলাম যে। বড় ভালবাসতেন আমাকে। তাই এত ফুল আর মিষ্টি দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করলেন।

মোক্ষদা : ও মাগো ভয়ে আমার ভরসা ছিল! দেখছি আসলে ফুলে, আসলে ভয়ে যাচ্ছি আমি। (শরৎকে) কি, আপনি কথা কইছেন না যে?

শরৎ : (শান্তিকে) সুরেনের এই চিঠিখানা পড়ে বড় ভাবনায় পড়েছি।

শান্তি : কেন, কি হয়েছে?

শরৎ : বেচারী বেকার হয়ে এতদিন বসেছিল। এক বন্ধু ওকে লেখে পাঠিয়েছে 'নাম্বট্' গোল্ড মাইন-এ। সেখানে গেলে ওর চাকরি হবে। কিন্তু ও যেতে চাইল না। বলল—এখানকার দেনা-পত্র শোধ করে সেখানে যেতে হলে ওর যা আছে, তার উপরে আরও গোটা পঞ্চাশেক টাকা দরকার। আমি বলেছিলাম—সুরেন, এতকাল গান শুনিয়ে যে আনন্দ দিয়েছ, তোমার ঐ পঞ্চাশ টাকা আমি তোমাকে উপহার দেবো। আজ সেখান থেকে চিঠি এসেছে, কাল ভোরে যদি ও নাম্বট্ রওনা না হয়, তবে ওর জায়গায় ওরা অন্য লোক নেবে। ওর চাকরিটা আর হবে না। এখন আমি পড়েছি বিপদে। হাতে যা ছিল, এইসব ব্যাপারে খরচপত্র করে ফেলেছি। ওকে এই পঞ্চাশটা টাকা আজ দেব কি করে! আচ্ছা, দু-চার জন বন্ধু-বান্ধব তো আজ আসছেন। দেখি, ধার পাই কিনা। তুমি ভেবো না সুরেন। দেখ তো, কারা বসি এলেন।

(সুরেন চলিয়া গেলেন)

শান্তি : এই যাঃ, টাকা তো আমারও চাই। ঘরে মা কালীর বেদীতে কতকটা টাকা দিয়ে আজ প্রণাম করব ভেবেছিলাম। আপনি তো আমাদের বন্ধির ব্যাঙ্ক। আমার টাকার খলিটা যে একবার চাই।

শরৎ : দিচ্ছি। (ড্রয়ার খুলিয়া খামটি বাহির করিয়া শিরোনাম পড়িলেন) শ্রীমতী শান্তি দেবী। নাও। (শান্তিকে খামটি দিলেন)

(শান্তি তাহা হইতে পাঁচ টাকার একটি নোট বাহির করিয়া শরৎচন্দ্রের দিকে আগাইয়া দিলেন)

শান্তি : (শরৎকে) ধরুন তো। ও ঘরে মা কালীর বেদীতে এই পাঁচ টাকা দিয়ে চলুন প্রণাম করে আসি। আর এই খামটাও ধরুন। এতে তা কম করেও গোটা পঞ্চাশেক টাকা হবে। এই টাকাটা নিয়ে আপনার আজকের অশান্তি দূর করুন।

শরৎ : শান্তি! না, না তোমার টাকা আমি নেব না।

শান্তি : আমি কি আপনার নয়?

শরৎ : কিন্তু টাকাটা—

শান্তি : টাকাটা কি আমার নয়? আমি যদি আপনার হই তো টাকাটাও আপনার। অবশ্য আমি যদি আপনার না হই তবে টাকাটা আমার। (শরৎচন্দ্র শান্তিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন)

শরৎ : তুমি আমার মান বাঁচালে—ধর্ম রাখলে—সুরেনটা বেঁচে গেল। এক ঢোক না খেলে এ আনন্দ আমার জমছে না। এস তো—

(শান্তির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া শরৎচন্দ্র শয়ন-কক্ষে চলিয়া গেলেন।...ক্ষণিক আনন্দোজ্জ্বল বাদ্য-বাদন অন্তে...সুরেন মালাকে লইয়া শরৎচন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ)

শরৎ : সুরেন, সমস্যার সমাধানটা গৃহলক্ষ্মীই করে দিলেন। এই নাও তোমার টাকা। (সুরেন মালাকে টাকা দিলেন।)

সুরেন : লক্ষ্মীর আশীর্বাদ যখন পেলাম, মনে হচ্ছে চাকরীটা আমার হবে। সত্যিই আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।

শরৎ : সুরেন, ইরাবতী বলেছে—খেতে বসবার আগে সে নাচবে। তুমি সবাইকে ডেকে আন। কজনই বা হবে। সবাইকে তো আর বলতে পারি নি। বুড়ো বয়সে বিয়ে করলাম, আনন্দের চেয়ে বাপ্, লজ্জাটাই বেশী। যাও, সকলকে তুমি ডেকে আনো। আমি ইরাবতী আর বাঈজিকে ডেকে আনছি।

(সুরেন চলিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিলেন—শরৎচন্দ্র অন্দরে গিয়া বাঈজি ও ইরাবতীকে লইয়া আসিলেন।...ইরাবতী নেচে গেয়ে নাচিয়ে নাচ শেষে হরিহর প্রবেশ করিয়া বলিলেন)

হরিহর : দয়া করে আপনারা সকলে আসুন, খাবার জায়গা করা হয়েছে।

শরৎ : হ্যাঁ ভাই, অবশ্য আর দেরী করা ঠিক হবে না। চল।
নেকে : হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন।

(শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সকলে চলিয়া গেলেন)

।। অষ্টম কাণ্ড ।।

(শরৎচন্দ্রের বাসা। কাল : সকাল।)

(ভোলা ও মোক্ষদার প্রবেশ। ভোলার হাতে কিছু রজনীগন্ধার গুচ্ছ ও পুষ্পমালা।)

মোক্ষদা : বাঃ ফুলগুলি তো বেশ ভাল এনেছিস ভোলা।
ভোলা : ভোলা মানেই জানবে ভাল। ভাল ছাড়া মন্দ কিছু করে তোমার ভোলা। এখন কি করতে হবে বল। আচ্ছা ছোটদি, ভোরবেলায় দেখছিলাম তুমি বিছানা বাঁধছ, বাক্স প্যাটরা গোছাচ্ছো। বলে দিয়ে যাবে বলেছিলে। তবে কি আজই চলে যাচ্ছ?
মোক্ষদা : সঠিক কি কেউ কিছু বলতে পারে ভোলা? বিছানা-পত্তর বাক্স-প্যাটরা বাঁধা-ছাঁদা এর আগেও তো কতবার হয়েছে, আবার খুলে ফেলতেও হয়েছে। কিন্তু, বাবা এবার আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে পারছেন না। যেতে তাঁকে হবেই—আজই। তাবনা চল বাধা হবে এক—কর্তার অসুখ। তা তিনি আজ অনেকটা ভাল আছেন। আমি চলে গেলে তুই খুব খুসি হবি, না ভোলা?
ভোলা : ছোটদি ওসব কথা বল না। বললে কিন্তু আমি ভাঁ করে কেঁদে ফেলব।
মোক্ষদা : ওরে বাবা! না না, ভাঁ করে কেঁদে তোমার দরকার নেই। এখন যা বলছি, চটপট করে ফেল দেখি! ইজিচেয়ারটা এখানে আন, তার সামনে সেই কাঠের চেয়ারটা বসিয়ে দিয়ে সেটা শান্তিদির ফোরসীটা নিয়ে যাও।
ভোলা : দিচ্ছি। কিন্তু এই সাত-সকালে এত ফুল আনছ কেন ছোটদি?
মোক্ষদা : কেন আনলুম, যে দেখবি এখন। নে, আর বকবক করার সময় নেই।
ভোলা : যাচ্ছি।

(ভোলা চলিয়া গেল এবং মোক্ষদার নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থাদি করিতে লাগিল। মোক্ষদার পিতা কৃষ্ণদাস অধিকারী আসিয়া দাঁড়াইলেন)

কৃষ্ণ : কিরে মোক্ষ, কর্তা আজ কেমন আছেন?
মোক্ষদা : অনেকটা ভাল বাবা। তবু ডাক্তারবাবুকে আজ সকালে আসতে বলা হয়েছে। আমার তো মনে হয়, এখন সেরে উঠছেন।
কৃষ্ণ : আজ আমরা তাহলে উঠতে পারব তো রে?
মোক্ষদা : মনে তো হচ্ছে পারব। আমি আমার বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে রেখেছি। এইবার এক ফাঁকে তোমার ঘরে গিয়ে তোমার জিনিস-পত্র গুছিয়ে বেঁধে-ছেঁদে দেব।
কৃষ্ণ : শরতের অসুখ। অসুখ দেখে যেতেও মন সরে না। কিন্তু ভাইয়ের মা চিঠি পেয়েছি, না গিয়ে উপায়ও নেই। এতকাল রক্ত-জলে খাটিয়ে গেলাম, গোবিন্দের কি ইচ্ছা, কোন সুরোহা হোল না। না হোল আমার চাকরি, না হোল তোর বিয়ে। ভাইটি আমার লিখেছে —ও মোটাই ঠিক করে ফেলেছি, তোমরা চলে এস দাদা। যাই, একবার হরিহরবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। বলতে গেলে উনিই আমার এ বাড়িতে এই দুটি বছরের বন্ধু।

(কৃষ্ণদাসের প্রস্থান। ইতিমধ্যে ভোলা চেয়ার ইত্যাদি সাজাইয়াছে। এক প্যাকেট ধূপকাঠি মোক্ষদা ভোলার হাতে দিলেন)

মোক্ষদা : এই ধূপকাঠিগুলো জ্বালিয়ে দে।
ভোলা : এখানে কোন পূজা-টুজা হবে নাকি ছোটদি?
মোক্ষদা : আন তো—দেখবি এখন।

(ভোলা ধূপকাঠি জ্বালাইতে চলিয়া গেল। মোক্ষদা শান্তির একটি আঁকাজোকা তৈলচিত্র ইজিচেয়ারের সম্মুখস্থ বেনারসী শাড়ি মণ্ডিত চেয়ারে রাখিয়া দিলেন। ভোলা ধূপকাঠিগুলি জ্বালাইয়া আনিল।)

মোক্ষদা : ধূপদানিগুলোতে এগুলো রেখে এই চেয়ারটাতে বসিয়ে দে।

(ভোলা বিস্মিতভাবে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে লাগিল। একটি পুষ্পপাত্রে দুইটি পুষ্পমালা রাখিয়া দিয়া ঐ আঁকাজোকা তৈলচিত্র সমন্বিত চেয়ারটি পুষ্পসজ্জায় সাজাইয়া দিল)

ভোলা : ছোটদি, আমি বুঝেছি ওটা কার ছবি। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। (কাঁদিতে লাগিল)।
মোক্ষদা : (ছবির আবরণ উন্মোচন করিয়া) হ্যাঁ রে, এই দেখ আমাদের সেই শান্তিদি। ভোলা, ভাইটি আমার! ছিঃ কেঁদোনা। জান তো কর্তার অসুখ? কেউ কাঁদলে উনি সইতে পারেন না। এইবার চলতো আমরা সবাই। ওঁকে ধরে এনে এখানে বসিয়ে দিতে হবে। এসো।

(ভোলাকে লইয়া অন্দরে মোক্ষদার প্রস্থান। বাইরে হইতে কৃষ্ণদাস আসিয়া দাঁড়াইলেন)

কৃষ্ণ : মোক্ষদা! কোথায় গেল? শোণিতের ছাপটি দেখিয়া কাছে গেলা আরো ভাল করিয়া দেখিলেন। মুখখানিতে কি মায়া—কি মমতা! চোখ দুটিতে কি করুণা! গোবিন্দের শ্রীমুখপদ্ম যেন দেখছি ঐ ছবিতে।

(কৃষ্ণদাস সমবেতোপযোগী একটি গান ধরিলেন।... ঐ গানের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া এখানে আনিলেন মোক্ষদা ও ভোলা। তাঁহাকে ইজিচেয়ারটিতে বসাইয়া দিলেন। মোক্ষদা একটি পুষ্পমালা শান্তির চিত্রে পরাইয়া দিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া চিত্রটিকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণদাস থামিলেন।)

শরৎ : ও, আজ সেই ১লা জুলাই। শান্তির মৃত্যুর তারিখ। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল!

(মোক্ষদা দ্বিতীয় মালাটি শরৎচন্দ্রের হাতে দিলেন। শরৎচন্দ্র একটু কুঁকিয়া বসিয়া মালাটি শান্তির ছবিতে পরাইয়া দিলেন। তৃতীয় মালাটি মোক্ষদা ভোলাকে দিলেন। ভোলাও উহা ছবিতে পরাইয়া দিয়া হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণদাস পুনরায় গান ধরিলেন। শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে এবং ভোলা ও মোক্ষদা মাটিতে বসিয়া কৃষ্ণদাসের বাকি গানটুকু শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের গান শেষ হইল। কৃষ্ণদাস শরৎচন্দ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

কৃষ্ণ : আজ তুমি কেমন আছ বাবা শরৎ?
শরৎ : অনেক ভাল। মনে হচ্ছে মরা আমার হোল না।
কৃষ্ণ : ছি বাবা, ও কথা বলতে নেই।
শরৎ : বলবার উপায়ও যে নেই অধিকারী মশাই। জানেন, একবার আমার হৃদরোগ হোল—হাট অ্যাটাক। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। শান্তি ছুটল দুর্গাবাড়ি। ফিরে এসে আমায় বলল—কোন ভয় নেই। মাকে আমি বলে এসেছি, মরবার, ওঁকে তুমি নিতে পারবে না। বরং আমাকে নিও। জানেন অধিকারী মশাই, এরপরে সত্যিই আমি সেরে উঠলাম। আর তার কিছুদিন পরেই দুর্নিবার স্নেহের আকর্ষণ হোল শান্তির আর তার খোকা। একই রাতে একই সঙ্গে—দুটি প্রাণী আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল চলে গেল। উঃ কি ভীষণ সেই রাত্রি! শোকের ভরে বাড়ি থেকে সব লোকজন পাড়াপড়শীরা এই আশঙ্কায়

এই মোক্ষদা, শান্তির সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী আপনার এই মোক্ষদা কাছে ছিল, তাই ওর হাতেই ওরা শেষ জলটুকু খেয়ে গেছে। মৃতদেহ দুটি সৎকারের জন্য লোক ডাকতে আমি বেরিয়ে পড়লাম। মৃতদেহ দুটি আগলে এই নির্জন পুরীতে সেই রাত্রিটুকু একা বসে রইল আপনার মেয়ে এই মোক্ষদা। এক নিরালা সন্ধ্যার ছায়া মৃতদের সৎকারের জন্য সেই ভীষণ রাত্রিতে আর কাউকে ধরে আনতে পারলাম না। মৃতদেহ দুটি ঠেলাগাড়িতে তুলে নিয়ে সৎকার করে ফিরে এসে দিবালি আর আমি ভোরবেলায়। কি অদ্ভুত সাহস—কি আশ্চর্য সহানুভূতি সেদিন আমি দেখে ছিলাম আপনার এই মোক্ষদার মনে। তারপরেও তো আমি বেঁচে রয়েছি এই পুরো বছর! না না, আমার মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই। আমার মৃত্যু হরণ করে নিয়ে গেছে শান্তি—নিজের জীবনটি আহুতি দিয়ে- তার মা পুণ্যির পাত্রে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) উঃ! মরিতে নিয়ে যাও সরিয়ে নিয়ে যাও আমার ঐ পরম শত্রুকে, সে আমাকে এমন করে একলা পরলোকে বসে হাসছে। আর যেন বলছে—তোমাকে বাঁচিয়ে তুলে সিঁথির সিঁদুর বজায় রেখে কেমনটি চলে এসেছি আমি। ওকে সরাও—সরাও, আমার চোখের সামনে থেকে সরাও।

(শরৎচন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী তোলা শান্তির চিত্র সম্বলিত চেয়ারটি অন্দরে রাখিয়া আসিল। কৃষ্ণদাস অশ্রুভরা চোখ মুছিতে মুছিতে অন্দরের দিকেই চলিয়া গেলেন। ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার : এই যে শরৎদা, আজ তো অনেকটা ভাল দেখছি। বাইরে এসে চেয়ারে বসেছ-ও। কাল আশাকরি বেশ ভাল ঘুম হয়েছিল?

শরৎ : হ্যাঁ, তা হয়েছিল। সেটা যাতে আর না হয় তার একটা ওষুধ চাই ডাক্তার।

ডাক্তার : কি আশ্চর্য! লোকে ঘুমের ওষুধ চায়, তুমি চাইছ ঘুম যাতে না হয় তার ওষুধ?

শরৎ : হ্যাঁ ডাক্তার। ঘুমোলেই যদি সব দুঃস্বপ্ন দেখি, সেটা কত বড় অসুখ একবার ভেবে দেখ ডাক্তার।

ডাক্তার : কি সব দুঃস্বপ্ন দেখ শরৎদা?

শরৎ : দেখি মানুষগুলো সব জন্তু হয়ে গেছে। পরিচিত সব লোক গুলো দেখি কেউ হয়েছে গরু, কেউ হয়েছে ভেড়া, কেউ বা হয়েছে সাপ, কেউ হয়েছে বাঘ। তুমি যে তুমি তোমাকেও একদিন দেখলুম তুমি একটি কুমীর হয়ে গেছ।

ডাক্তার : আমি কুমীর! তুমি বলছ কি শরৎদা?

শরৎ : আমি কুমীর! ব্যারাম সারাবার জন্য তুমি ওষুধ খেতে বসে আছ, তখন কে ব্যারাম সারাবে তুমি ওষুধ দিতে আসবে। এসেই গাঁক্ করে কামড়ে ধরবে এখন।

ডাক্তার : হাঃ-হাঃ-হাঃ—(হঠাৎ থামিয়া) তুমি রসিকতা করছো কিনা জানি না?

শরৎ : তা বলতে চাও বল। মানুষের জীবনটাই তো একটা রসিকতা।

ডাক্তার : আচ্ছা, তোমাকে একবার দেখছি।

(ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুকটি পরীক্ষা করিলেন)

ডাক্তার : হুঁ।

শরৎ : হার্ট তো দেখলে। হার্টটেশন মনে হচ্ছে কি?

ডাক্তার : না না হার্ট তোমার এখন ঠিকই আছে। তবে মদ খাওয়াটি তোমার বন্ধ করতে হবে।

শরৎ : আমি তো তোমাকে বলেছি, মদ খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ডাক্তার : ঘরে-হয় তো ছেড়েছ, কিন্তু বাইরে হয় তো খাও।

শরৎ : না না, ঘরে-বাইরে কোনখানেই খাই না। আমি প্রতিজ্ঞা করে মদ ছেড়ে দিয়েছি। এখন আফিম ধরেছি। (মোক্ষদাকে) মোক্ষদা এনে হচ্ছে তো?

(মোক্ষদা চলিয়া গেলেন)

ডাক্তার : প্রতিজ্ঞা করে ছাড়া কেন?

শরৎ : শুনবে? শোন বলছি—

ডাক্তার : না না, তুমি যখন বলছ আমি বিশ্বাস করছি। আর কিছু বলতে হবে না।

শরৎ : বলতে আমাকে হবেই। যে জন্য প্রতিজ্ঞাটা আমি করেছিলাম, সেটা মনে পড়লে আমার কাঁধে যেন একটা ভূত চাপে। তুমি শোন আর না শোন, ঘটনাটা না বলা পর্যন্ত আমি এতটুকু স্বস্তি পাবো না। যদি যেতে হয় চলে যাও। কিন্তু আমার জীবনের সেই আর একটি কাল-রাত্রির কথা আমাকে বলতেই হবে। নইলে আমার প্রায়শ্চিত্ত নেই।

ডাক্তার : বটে! বল তো শুনছি।

শরৎ : আমার বন্ধু হলধর চাটার্জি আর আমি এক রাত্রে একটা পার্কে বসে মদ খাচ্ছিলাম। মদ ফুরিয়ে গেল। রাত তখন অনেক। মদের দোকানও বন্ধ। পথে পথে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। (হঠাৎ কি যেন দেখিয়া একক সংলাপে)—এই চাটার্জি, ঐ যে আমাদের বর্মি বন্ধুর বাড়ি। লোকটার হার্ট ডিজিজ। ডাক্তার বলেছে—মদ খেলে মরে যাবে। তবু সে বউকে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়। চাটার্জি, কড়া নাড়। হ্যাঁ, ঐ যে দোতলার জানালা খুলে গেল। বর্মি বন্ধুর বউটি নেমে আসছে। কি? স্বামীর হার্টের অবস্থা ভাল নয়, ঘুমুচ্ছে? ঘুমুচ্ছে না হাতি! ঐতো আমাদের দেখে মদের বোতল হাতে তোমার পিছু পিছু তরতর করে নেমে এসেছে। না না, তুমি ছেড়ো না লক্ষ্মী। ওকে আমরা মদ খেতে দেব না—না, না বন্ধু। তোমার হার্ট আমেজড্, মদ খেলে তুমি মরে যাবে। তোমার হাতের বোতলটা আমাদের দাও। কি? এখানে বসে গল্প গুজোব করতে করতে যদি খাই তবেই বোতলটা খুলবে? নইলে দেবে না? তা বেশ তো, সে তো আরও ভাল।—কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তুমি মদ খাবে না।—সেই প্রতিজ্ঞাই তুমি করছ? বা-বা-বা! দেখ চাটার্জি, আমাদের বর্মি বন্ধু কি লক্ষ্মী ছেলে। মদ খেতে দেওয়া হয় না বলে মদ খাইয়েই খুশি। চরিত্রটা কত মহৎ একবার ভেবে দেখ চাটার্জি।—কি বলছ বোন?—তুমি ওর কথা বিশ্বাস করছ না? এখানে বসে পাহারা দেবে?—সারাদিন কাজকর্মে এত ক্লান্ত তুমি, কতক্ষণ পাহারা দেবে? তা বেশ তো, দাও।—দেখ, দেখ, বর্মি বন্ধু আমাদের কত উদার! নিজে খাচ্ছে না, কিন্তু আমাদের গ্লাসে সোডা ঢেলে দিচ্ছে।—পাশের বাড়িতে কি সুন্দর বাজনা বাজছে! শ্রবণ কর আর পান কর, পান কর আর শ্রবণ কর—ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যাও, বাটা-ভরা পান দেব গাল ভরে খাও।—আরও ঘুম পাচ্ছে। চাটার্জি দেখছ? বর্মিবন্ধু ফিস ফিস করে কি বলছে? তোমার সারা দিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত বউ ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ফাঁকে তুমি এক পেগ খেতে চাইছ? —না না, তুমি এক পেগ খেলেই তোমার পিপাসা আর মুখভে পাবে না।—একি চাটার্জি, তুমি এক পেগ ওকে ঢেলে দিলে! —না না, এ খুব অন্যায় হোল। কাজটা ভাল হোল না। আমার ভয় হচ্ছে এখুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমি বোনকে ডেকে তুলছি।—বোন বোন—ও ছো ছো বর্মি বন্ধুটা বোতলটা খালি করে দিলে, বোতলটা খালি করে দিলে!—বোন, বোন ওঠ, দেখ তোমার স্বামী কি বিকট চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।—ও ছো-ছো বরং, আমাকে নাড়ী দেখতে দাও, আমি নাড়ী দেখতে জানি।—ও ছো-ছো, সব শেষ!—লোকটা মরে গেছে—অমরাই মেয়ে ফেললাম। একটা ঘুমন্ত লোককে—ঘুম থেকে তুলে মদ খাইয়ে—আমরা খুন করলাম!—ওহো-হো,-ওহো-হো,-ওহো-হো—

(শরৎচন্দ্র আর্তনাদে ভাঙিয়া পড়িলেন)

এই সংলাপের মধ্যেই মোক্ষদা ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ঐ তন্ময় অবস্থা দেখিয়া কিং-

কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভোলা দরজার আড়াল হইতে উঁকি দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। শরৎচন্দ্র যখন শোকে ভাঙিয়া পড়িয়া আসনে বসিয়া পড়িয়া বিলাপরত, তখন মোক্ষদা ছুটিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্রকে ধরিলেন। ভোলাও অপর পাশে আসিয়া শরৎচন্দ্রকে ধরিল। শরৎচন্দ্র সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন এবং ইহাদের এইভাবে দেখিতে পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন ব্যাপারটি।)

শরৎ : সেই রাতের সেই মর্মান্তিক বিভীষিকা এখনও যখন মাঝে মাঝে দেখি, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সেই চরম রাতটিতেই ধর্ম-বন্ধুর সেই মৃত্যুশয্যাতেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মদ ছেড়ে দেবো—জীবনে আর মাতাল হবো না। আমার সে প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন করছি।

ডাক্তার : বাঁচান। শরৎদা, তোমার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল ঐ একটাই —হাঁ, ঐ মদ। তা সে ভয় যখন আর নেই, আর কোন ভাবনাও নেই।

(কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

ডাক্তার : এখন থেকে হার্টের উন্নতি হতে থাকবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার পা ফোলাটাও সেরে যাবে। ভেবে চিন্তে আমি একটা ওষুধ দেব এখন। সেটা নিয়মমত খেয়ে যাবে, দু-বেলা একটু হাঁটবে, আর বলকারক খাদ্য, বিশেষ করে দুধ আর কিছু ফল জোর খাবে। তোমার 'বড়দিদি' পড়ার পর হা-পিত্যেস করে বসে আছি তোমার পরের বই কবে পড়ব! তুমি শিগ্গির সেরে ওঠো শরৎদা—শিগ্গির সেরে ওঠো। তুমি আমাদের গর্ব।

(ডাক্তারের প্রস্থান)

কৃষ্ণ : যাক, এবার তবে গোবিন্দের ইচ্ছায় আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারলাম। সত্যিই গোবিন্দের কি দয়া দেখ। শরৎ, বাবা, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার আর মুখুর কলকাতা রওনা হওয়ার যে তারিখটি ঠিক হয়েছিল, সে তারিখটি হচ্ছে আজ। ভাবছিলাম তোমার এই শরীরের অবস্থা—তোমাকে ছেড়ে আমরা কি করে যাব!

(হন্তদন্ত হইয়া বা-থিনের প্রবেশ)

বা-থিন : ইরাবতী এর মধ্যে তোমার সঙ্গে কথা বলে গেছে, অধিকারী মশাইরা কলকাতা চলে গেলে তোমাকে আমাদের কাছে গিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তা ওঁদের কলকাতা যাবার সেই তারিখটি তো হোল আজ। ইরাবতী বলে দিয়েছে, ডাক্তারের অনুমতি পেলে আজ সকালেই তোমার দরকারী জিনিসপত্রশুদ্ধ আমাদের ওখানে তোমাকে নিয়ে যেতে। তা বরাত ভাল, ডাক্তারের সঙ্গেও পথে দেখা হয়ে গেল। তিনি আমার কাছে সব শুনে বললেন—খুব ভাল কথা। শরৎদার এখন একা থাকা উচিত নয়।

কৃষ্ণ : তা তোমাদের সঙ্গে শরৎ থাকলে আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতা রওনা হতে পারি বাবা। এ দেখছি গোবিন্দই সব আয়োজন করে দিচ্ছেন। জয়-জয় গোবিন্দের জয়।

বা-থিন : তাহলে শরৎদা, আমি গাড়ি ডেকে আনি?

শরৎ : আমি আর কি বলব! গোবিন্দের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আন গাড়ি। এঁরাও ব্যস্ত হচ্ছেন, আমিই বা আর একা থাকি কি করে! কথা কইবারও তো একটা লোক চাই।

বা-থিন : শহরে আমার একটু কেনা-কাটা আছে, সেটা সেরেই আমি গাড়ি নিয়ে আসছি, তুমি তৈরী থেকো শরৎদা।

(বা-থিনের প্রস্থান)

কৃষ্ণ : শোন, মুখু, আমাদের একটু দেরীই হয়ে গেছে। আমি গাড়ি ডেকে আনছি। জাহাজঘাটে যাবার পথে দর্গাবাড়িতে গাড়ি দাঁড়িয়ে মায়ের প্রসাদ নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন ওখানকার পাণ্ডা-ঠাকুর। রাত্রিকালে মায়ের প্রসাদ পেয়ে ত্রৈলোক্যের পাট তুলে দিয়ে যাবো। এও সেই গোবিন্দের ইচ্ছা। কি বল বেয়াই, আমি তাহলে গাড়ি ডাকি?

শরৎ : গোবিন্দের যখন ইচ্ছা, আমি আর কি বলব অধিকারীমশাই? ডাকুন গাড়ি। (কৃষ্ণদাস চলিয়া গেলেন।)

শরৎ : মুখু—(মোক্ষদা নতমুখে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন)।

শরৎ : তুমি তো চললে। আমরাও বা-থিনের কাছে যেতে হলে যা-যা দরকার গুছিয়ে দাও। ভোলা এ বাড়িতে থেকে বাড়ি পাহারা দেবে। হাঁ শোন, শান্তির ওই ফটোটা আমার সঙ্গে দিও।

মোক্ষদা : সে তো দেবই। আর কি দেব দাঠাকুর?

শরৎ : সে কি কোনদিন জেনেছি। সে জানতো শান্তি, আর এই দু বছর ধরে জেনেছ তুমি আর তোমার বাবা। আমি জানি তোমার কোন ভুল হবে না মুখু। ঐ তোমাদের গাড়ি আসার শব্দ পাচ্ছি। ভোলা! তোরা ছোটদির জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিয়ে গাড়িতে তুলে দে।

ভোলা : সেসব ছোটদি আগেই গুছিয়ে-টুছিয়ে রেখেছে, বাঁধা-ছাঁদাও হয়ে আছে। তুলে দিচ্ছি।

(ভোলা এজন্য চলিয়া গেল। মোক্ষদাও অন্দরে চলিয়া গেলেন। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া শরৎচন্দ্র বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণদাস প্রবেশ করিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ধীর ধীরে তাঁহার শ্যালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে তাঁহার মাথায় হাত রাখিলেন)

কৃষ্ণ : বাবা শরৎ, আমার সকল মন—সকল প্রাণ—সকল সজ্ঞান দিয়ে তোমায় আশীর্বাদ করছি বাবা। না না, তুমি বোসো—আমিও বসছি।

(শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়াই উপবিষ্ট কৃষ্ণদাসকে প্রণাম করিলেন)

কৃষ্ণ : শান্তি আমার মুখুর সব ভার নিয়েছিল। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, দু বছরের মধ্যেই সে চলে গেল। তুমি ভবঘুরে, আমাকে তোমার সংসারে এনে বন্দী করলে। দুটো সম্বল একসূত্রে সুখে-দুঃখে বাস করে এমন একটা মায়ার জাঁতাকে দুই বেহেতে চলে যাচ্ছ যে বয়েসে লোকে বাঁধন কাটতেই চায়—বাঁধনে ধরা পড়তে চায় না। গোবিন্দের পায়ে আমরা বাপ-বেটি নিত্য তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করব—এছাড়া তো আমাদের আর কোন ক্ষমতা নেই বাবা।

(ভোলা অন্দর হইতে বিছানা এবং একটি সুটকেশ লইয়া আসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণ : ভোলা, আমিও যাচ্ছি। কোথায় কি রাখবি দেখিয়ে দিচ্ছি। (শরৎকে) না না, তোমাকে আর উঠতে হবে না, তুমি বোসো (উচ্চকণ্ঠে) মুখু, আর দেরী করিসনে মা।

শরৎ : দেশে গিয়ে আমার আর সব ঠিকানায় চিঠি দেবেন। যদি কখনো কিছুতে ঠেকে পড়েন, অসঙ্কোচে জানাবেন। আমার যেটুকু সাধ্য অবশ্যই করব। আর, (একটু থামিয়া) আর, মোক্ষদার বিয়ের আগে আমি যেন যথাসময়ে খবর পাই। আমার কিছু দেবার ইচ্ছা আছে। ও শুধু দিয়েই গেল—পেল না কিছুই।

কৃষ্ণ : না না সে কি! ওর যদি বিয়েটা হয়—সে শান্তি আর তোমার আশীর্বাদেই হবে এ আমি জানি। আচ্ছা আসি।

(কৃষ্ণদাসের প্রস্থান। ধীর ধীর নত মুখে মোক্ষদা শরতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

মোক্ষদা : এই চাবির গোছটা রাখুন। আর এই মনি ব্যাগটা—ব্যাগে একশ দশ টাকা আট আনা আছে।

শরৎ : ও! কিন্তু এ টাকাটা তুমি পথে খরচ বাবদ নিয়ে যাও। তোমো না, আজই আমার মাইনে পাবার দিন।

মোক্ষদা : পথের খরচ আপনি আগেই বাবাকে দিয়েছেন টিকিট কাটবার সময়। ভোলার মাইনে, গোরালার পাওনা, ধোবার হিসেব, মুদির বাকি যতদূর মনে পড়ছে সব মিটিয়ে দিয়েছি।

শরৎ : হ্যাঁ! হ্যাঁ। দেনা-পাওনা সব তবে চুকে গেল। কিন্তু আজ শুধু বারবার সেই কালরাত্রিটির কথাই মনে পড়ছে—যে রাত্রে তুমি এই নরকের পুরীতে একা—একলা—রাতের অন্ধকারে দুটি মৃতদেহ নিয়ে বসেছিলে। শান্তির দেহ তোমার পাশে—আর খোকার দেহটুকু তোমার কোলে।

(মোক্ষদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন)

শরৎ : ঐ একটি রাত্রেই আমি চিনতে পেরেছিলাম, তুমি আমাদের কে—আর কতখানি। যদি বেঁচে থাকি, আমি তোমার বিয়েতে যাব মুখু।

মোক্ষদা : (আঁচলে বাঁধা একটি ছোট পুটলি বাহির করিয়া) এটা রাখুন।

শরৎ : কি ওটা?

মোক্ষদা : খোকাকে দুটো জামা আমি সেলাই করে দিয়েছিলাম। জামা দুটো তাকে পরিয়ে দিলে শান্তিদি ভারী খুসি হোত—সেই জামা দুটো।

শরৎ : ও! কিন্তু এ আমি কোথায় রাখবো মুখু? ও তোমার কাছেই থাক। আমি জানবো ঠিক জায়গাতে—ঠিক জিনিসটিই আছে। যেমন জানি, খোকা তার মা-এর কোলে শান্তিতেই রয়েছে।

(মোক্ষদা জামা দুটির পুটলিটি পুনরায় তাহার আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং বুক হইতে একটি পিতলের তৈরি নাড়ু-গোপালের একটি ছোট মূর্তি বাহির করিলেন)

মোক্ষদা : শান্তিদির পেতলের সেই নাড়ু-গোপালটি। শেষ-নিঃশ্বাসে তাঁর এই গোপালকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে-ছিলেন—এর খাওয়া-পরার ভার আমি তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম মুখু। আপনার ভার তো বা-ছিদ্দা নিলেন, কিন্তু এ'র ভার আমি কাকে দিয়ে যাব বলুন।

(শরৎ স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিলেন, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ : মুখু, সেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

(শরৎচন্দ্র মোক্ষদার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন কৃষ্ণদাসের সম্মুখে)

শরৎ : মোক্ষদাকে আপনি আমায় দিন। নইলে আমার শান্তির সংসার অচল হয়ে যাবে, অচল হয়ে যাব আমিও। হ্যাঁ, আপনার মোক্ষদাকে আমি ভিক্ষা চাইছি অধিকমরী মশাই।

কৃষ্ণ : (আনন্দে অধীর হইয়া) ওরে—ওরে মুখু। একি আমি স্বপ্ন দেখছি? গোবিন্দ তোমার একি দয়া! তোমার এ দয়া, আমার কল্পনারও যে বাইরে গোবিন্দ।

(ভোলা একটি বিছানা গাড়িতে তুলিতে যাইতেছিল)

কৃষ্ণ : না রে ভোলা, বিছানা যাবে না। গাড়ি থেকে আর সব জিনিস-পত্র শুদ্ধ তুলে নিয়ে আয়। গাড়োয়ানকে এই টাকাটা দিয়ে বল্, আমাদের যাওয়া হোল না।

(ভোলা নির্দেশ পালন করিতে গেল)

কৃষ্ণ : (শরৎচন্দ্রকে) এই দীন-হীন দরিদ্র-সেবকের এই তুলসী পাতাটি আমি তোমায় সম্প্রদান করছি শরৎ। মুখু, শরৎকে প্রণাম কর্।

(মোক্ষদা শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। শিবুরামও প্রণাম করিলেন। শরৎচন্দ্র কৃষ্ণদাসকে প্রণাম করিলেন)

শরৎ : মুখু কি সত্যসত্যই অধিকারী মশাই? শান্তির ওপর সত্যকার ভালবাসা। ভালবাসা পেয়ে আর কম হয় না। তাই আমি বলছি এখনও [illegible]

কৃষ্ণ : বাঃ বড় চমৎকার নাম। কিন্তু তোমার এই হিরণ্ময়ী অন্নার কাছে মোক্ষদাই থাকবে। ওই মেয়েই যে আমার মোক্ষ বাবা।

শরৎ : আপনারা ভেতরে যান। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কোথা থেকে কি হয়ে গেল! আমাকে তোমরা একটু একলা থাকতে দাও।

(শরৎচন্দ্র তাঁহার ইজিচেয়ারে গিয়া বসিলেন, কৃষ্ণদাস মোক্ষদাকে লইয়া ভিতরে গেলেন। চক্ষু নিমীলিত করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন শরৎচন্দ্র। হঠাৎ যেন দেখিলেন তাঁহারই রচিত 'বকুলদিদি'র নায়িকা মাধবীর ছায়ামূর্তি)

শরৎ : (চমকিত হইয়া) কে, কে ওখানে?

মাধবীর ছায়ামূর্তি : আমায় চিনতে পারছেন না শরৎবাবু? আপনার বড়দিদি গল্পের নায়িকা—মাধবী আমি। বিয়ে করে মনের আনন্দে সব ভুলে গেলেন নাকি, আপনারই কলমের খোঁচায় এই বালবিধবা মাধবীর সংসারে আপনভোলা অসহায় সুরেন্দ্রনাথকে স্নেহভরে আশ্রয় দিতে হোল আমায়। সেই স্নেহ গোপনে তিলে তিলে বেড়ে এই বালবিধবার মনে প্রেমের কুঁড়ি জাগিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও কোন অনাচার হয়নি। আমার প্রেমের বিন্দু-বিসর্গও কোনদিন জানতে পারেনি সুরেন্দ্রনাথ। বরং একদিন তাকে তাড়িয়েই দিলাম বাড়ি থেকে। কিন্তু শরৎবাবু, সেই অসহায় লোকটা সেদিন বুঝল সে বাঁচবে না—সেদিন ছোড়া ছুটিয়ে এল তার এই বড়দিদির কোলে মাথা রেখে মরতে।

শরৎ : হ্যাঁ তোমাদের দুঃখে আমার মনও কেঁদে উঠেছিল। জমি ফিরে এলে সুরেন্দ্রনাথ যখন জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? বড়দিদি?

মাধবী : আমি বলেছিলাম—না, আমি মাধবী। আমি যে তার বড়দিদি নয়—মাধবী, ওইটুকু তৃপ্তি আপনি অবশ্য আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু তাকে মেরে ফেলে সে তৃপ্তি আমায় কেড়ে নিলেন কেন শরৎবাবু?

শরৎ : পাষাণ সমাজের বুকে ঘা মারতে। যতদিন বাঁচব, এই হবে আমার কাজ। হ্যাঁ, পাথরের বুকে হাতুড়ি মেরে পাথর ভাঙাই হবে আমার কাজ।

মাধবী : নিজে মনের আনন্দে ঘর-সংসার করে, না?

শরৎ : আনন্দে—মনের আনন্দে—মনের আনন্দে ঘরসংসার...হাঃ-হাঃ (শরৎচন্দ্র উচ্চহাসা করিয়া উঠিলেন) মনে আমার কত আনন্দ, সে জানি আমি আর জানেন আমার অন্তর্যামী! শুনে রাখ মাধবী, আমার প্রথম জীবনে প্রেমের প্রথম যে ফুলটি ফুটেছিল—সে ফুটেছিল একটি বাল-বিধবার সাহিত্য কাননে। পরস্পরের প্রতিই আমাদের ছিল পরম অনুরাগ। বিধবা বিবাহের আইন ছিল—আইন আছে। কিন্তু হৃদয়হীন পাষণ্ড সমাজের অন্ধ সংস্কারের বাধাতে মিলন হোল না আমাদের। দু-দুটি জীবন এই সুন্দর সংসারে অন্তত হাহাকার হয়েই রইল।

মাধবী : তাই নাকি?

শরৎ : হ্যাঁ, আর তোমরা আমারই মানস-সন্তান। যে দুঃখ যে-জ্বালা আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে সারা জীবন, তার অংশ তোমাদেরও ভোগ করতে হবে বৈকি মাধবী। কারণ তোমরা আমারই উত্তরাধিকারী।

মাধবী : কিন্তু তবে এই বিদেশে কেন? ফিরে যান দেশে, ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে—নারীমেধ যজ্ঞের পীঠস্থানে—

শরৎ : নিশ্চয়—নিশ্চয় যাব—নিশ্চয়ই যাব। এখানকার কাজ আমার ফুরিয়েছে। এই ব্রহ্মদেশেও কিন্তু আমি কম জ্ঞান আহরণ করিনি, তা প্রয়োগ করতে যাব এবার ভারতবর্ষে।।

—য-র-নি-কা—

(নাট্যকার গ্রন্থস্বত্ব রায় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

CENTRAL LIBRARY

শরৎ কাহিনী মঞ্চে ও পর্দায়

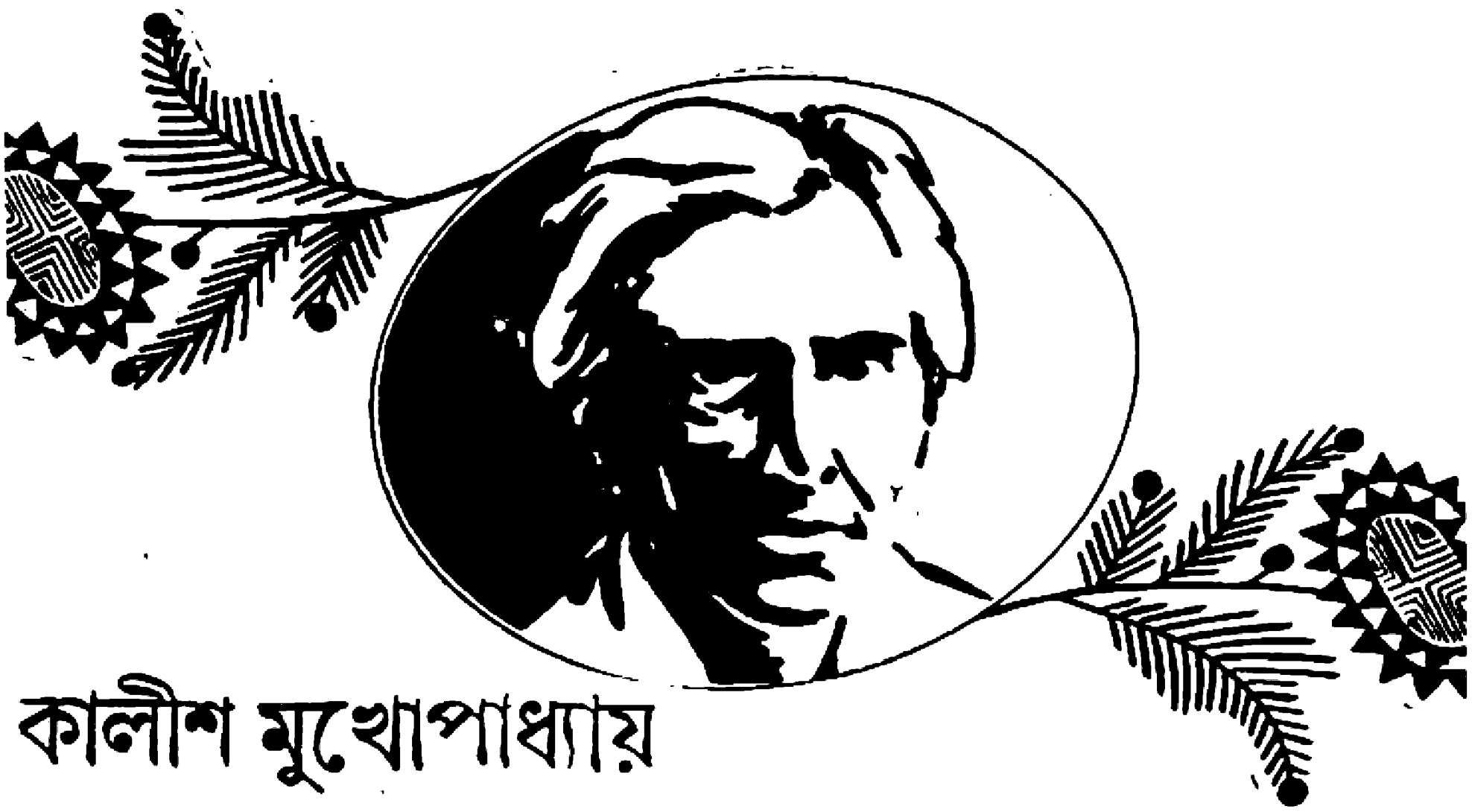

কালীশ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র সরাসরি কোন নাটক রচনা করেননি। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস বা কাহিনী নাট্যরূপায়িত হয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। উপন্যাস আর নাটক এক নয়। উপন্যাস বা গল্পের ভাষার মাধ্যমে কাহিনীর যে বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব—নাটকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাহিনীর ঘটনা নাটকে প্রত্যক্ষ-ভাবে ঘটিয়ে দেখাতে হয়। তাই নাটক দৃশ্যকাব্য বলে অভিহিত। সময়ের মাপকাঠি ছাড়া মঞ্চ ও আনুসাঙ্গিক এবং শিল্পীদের কথাও নাটকের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা যায় না। উচ্চ শ্রেণীর নাটকও অভিনয় এবং মঞ্চ-কৌশলের ত্রুটির জন্য ব্যর্থ হতে দেখা গেছে। সর্বোপরি নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে গুণগ্রাহী বা রসগ্রাহী দর্শকের ওপর। ষোড়শী (দেনাপাওনা), রমা (পল্লীসমাজ), বিজয়া (পণ্ডা), অচলা (গৃহদাহ), বিরাজবৌ এবং চরিত্রহীন সম্ভবত এই ছয়-খানা উপন্যাসের নাট্যরূপ শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং কমবেশী এগুলির সঙ্গে শরৎচন্দ্র জড়িত ছিলেন। সংখ্যার দিক থেকে রঙ্গমঞ্চে খুব কম শরৎ-কাহিনীই মঞ্চস্থ হয়েছে। শরৎকাহিনী চলচ্চিত্রের সাম্প্রতি যে প্রতিবন্ধকতা ছিল বা আছে সম্ভবত সেই প্রতিবন্ধকতাই অন্যতম কারণ কিনা বলতে পারি না।

অথচ নাট্যামোদীদের কাছে শরৎ-কাহিনীর আবেদন আজও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। মঞ্চ-মালিকেরা তো পুরোপুরি বিশ্বাস করেন শরৎ-কাহিনীর আকর্ষণ আজও দুর্বার।

নাটকের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও অভিনয়ের ওপর। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্য অভিনয়-দক্ষতা এবং শিক্ষকতায় শরৎকাহিনী বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে স্বীকৃতি পেয়েছিল অন্য কোন ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়নি। শরৎচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কথাই মনে হয় সর্বাগ্রে। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে শিশিরকুমারের প্রযোজনায় ষোড়শী, রমা, বিরাজবৌ, বিজয়া, অচলা (গৃহদাহ) মঞ্চস্থ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিশিরকুমার তাঁর অত্যাশ্চর্য বিশ্লেষণ-ক্ষমতার যেভাবে শিল্পীদের গড়ে তোলেন তা ছিল পরমবিস্ময়। শরৎচন্দ্র নিজেও এই বিস্ময়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'অল্পক' এই স্বল্পকালের মধ্যে শিশির কি করিয়া যে তাহার অভাব নূতন লোকগুলিকে এমন মানুষ করিয়া তুলিলেন—বিশেষ করিয়া তাহার নিজের অভিনয় দেখিবার সময় বহুবারই মনে হইয়াছে—দেশের সমস্ত অভিনেতা যে অভিনয়ে ইহার কাছে আপনাদের শিক্ষা করিয়া, মনে করেন—তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই, এই সত্য স্বীকার করার তাহাদের গৌরব আছে।' শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুণ্য এবং শিক্ষকতার দৃষ্টি শরৎ-চন্দ্রের যেমন শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি নাট্যরূপের ক্ষেত্রে অগাধ বিশ্বাস ছিল নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর ওপর। সেজন্যই কর্তৃপক্ষ ভিন্ন নাট্যকারকে দিয়ে চরিত্রহীনের নাট্যরূপ দেবার জন্য অগ্রসর হলে শরৎচন্দ্র প্রথমে বিরুদ্ধে অস্বীকৃত হন এবং যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে নাট্যরূপ দেবার সর্তে কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হলেই চরিত্রহীনের মঞ্চস্থের বিরুদ্ধে করেন। এ বিষয়ে তাঁর ভাষাতেই বলি : 'যোগেশ যদি নাট্যরূপ দেয় তবেই আমি বইখানি দিতে প্রস্তুত আছি।'

'বিরাজবৌ' শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার রচনা নয়। অথচ এই [illegible] প্রথম মঞ্চস্থ হয় ৩ আগস্ট ১৯২৩ গ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে। নাট্যরূপ দিয়ে-ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাট্য-রূপ শরৎচন্দ্রের পছন্দ হয়নি। কানাইলাল

অমৃত
CENTRAL LIBRARY

ষোড়শী নাটকে জীবানন্দ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবর্তীকালে সম্ভবত বিলাতযো
। গিয়েছিলেন বলে আমার মনে

২৭ খৃষ্টাব্দে আলফ্রেড থিয়েটারে
পরিচয় গ্রহণাহ্ন মঞ্চস্থ করেছিলেন।
। দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মিত্র।
মুখোপাধ্যায় 'অচলা' চরিত্রে অভিনয়
পরবর্তীকালে গৃহদাহের নাট্যরূপ
নামে মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু গৃহদাহের
াট্যরূপই জনপ্রিয়তা অর্জন করে না।

লোর নাট্যশালায় নব-দিগন্ত তখন
ছটায় প্রদীপ্ত। একদিকে আর্ট
রের সম্মিলিত প্রতিভা অপরদিকে
প্রতিভার ভাস্বর। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের
াগে 'নরনারায়ণের' ২৭ রজনী
রের পর অসুস্থ হয়ে শিশিরকুমার
ত্র যান। দেনা-পাওনার নাট্যরূপ-
এই সময় থেকেই। কর্ণওয়ালিশ
ে 'নাট্য-মন্দির' নিয়ে শিশিরকুমার
াড়া জাগিয়েছেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৬ আগস্ট মঞ্চস্থ হলো দেনা-
নাট্যরূপ 'ষোড়শী'। শিশিরকুমার ও
চারুশীলা ষোড়শী। যোগেশ চৌধুরী
রঞ্জন ভট্টাচার্য শৈলেন চৌধুরী ও
হইলেন অন্যান্য চরিত্রে। মূল উপ
নাট্য-সংঘাত নাটকে বেশী তীব্র
ফুটে উঠেছে। নাটকের কাহিনী ও
বিন্যাসে ষোড়শীই দেখা দিয়েছে স
রূপে। তাই ষোড়শী নামকরণও য
যেমন সার্থক বিজয়ার ক্ষেত্রে। জী
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের পরিস
মধ্যে যে চমৎকারিত্বের আস্বাদ পাও
মূল উপন্যাসে তা পাওয়া যায় ন
ষোড়শী শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
অন্যতম।

জীবানন্দের প্রধান পরস্পরবিরো
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিন্যাস শিশির
অভিনয়ে তা প্রকট হয়ে উঠেছিল।
ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যত্র ক
শিশিরের অভিনীত জীবানন্দকে

কিন্তু বাবার ইচ্ছায় অভিনীত হবার পর নাটক মঞ্চস্থ করবার নিয়মাবলী জারী করলেন। স্বাধীনতা লাভের পর রংমহল রঙ্গমঞ্চ ফিরে পাবার নতুন করে পথের দাবী মঞ্চস্থ হয়। এবার সাব্যসাচী— কমল মিত্র অপরাজিত—ছবির গাঙ্গুলী সংঘমিত্রা— সাবিত্রী গুপ্তা ভারতী পূর্ণিমা প্রেমে—সিদ্ধু গাঙ্গুলী আর অন্যান্য চরিত্র মিহির ভট্টাচার্য অভিনয় করেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে রংমহলে চরিত্রহীনের পুনরাভিনয়ে ধর্মদাস সতীশ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চরিত্রহীন বাদে পথের দাবীর প্রথমাভিনয়ের পর দর্শকদের প্রতি মঞ্চ মালিকদের দৃষ্টি পড়লো নাট্যাভিনেতা ব্রজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাট্যকার্যালয়ে দেবদাস মঞ্চস্থ হবার পর। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩ জুলাই নাট্য-ভারতীতে দেবদাস মঞ্চস্থ হয়। জহর গাঙ্গুলী দেবদাস আর পার্বতীরূপে অভিনয় করেন সরযূ-বালা। নাট্যকারের সৃষ্ট বসন্ত চরিত্রে অভিনয় করেন নরেশ মিত্র। বসন্ত চরিত্র নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল শেষ পর্যন্ত নিবেদিত হয় নাট্যকারের মৃত্যুর কাছে। দেবদাস নতুন করে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়। তখন দেবদাস আর বসন্ত চরিত্রে অভিনয় করেন ছবি বিশ্বাস আর নির্মলেন্দু লাহিড়ী। দুইয়ের অভিনয়ই স্মরণীয় হয়ে আছে। স্মরণীয় হয়ে আছে পার্বতীরূপে নাট্য-সম্রাজ্ঞী সরযূবালার অভিনয়। শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে দেবদাসের এক বিশেষ অভিনয়ে দেবদাস-এর অভিনয় শিশিরকুমার আর আমি পাশাপাশি বসে দেখেছিলাম। উভয়ের অভিনয় দেখে মুগ্ধ শিশিরকুমারের অভিমত শিশিরকুমারের নির্দেশেই উভয়ের কাছে আমি পৌঁছে দিয়েছিলাম।

দেবদাসের জনপ্রিয়তার পরই যেন বিরাট আলোড়ন এলো বাংলা রঙ্গমঞ্চে নূতন কাহিনীর জন্য।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিধায়ক ভট্টাচার্য নাট্যরূপায়িত 'বিপ্রদাস' মঞ্চস্থ হলো শ্রীরঙ্গমে। বিপ্রদাস পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে মঞ্চস্থ হলেও বিপ্রদাসের কৃতকার্যতার গৌরব ছিল বিশ্বনাথের। নামভূমিকায় তিনিই অভিনয় করেন। বন্দনা চরিত্রে ছিলেন মলিনা দেবী। বিপ্রদাসের উদ্বোধন রজনীর দর্শক সমাগম দেখে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলেছিলেন : আমি বড় ক্লান্ত। বড় পরিশ্রান্ত। তাই বিশ্রামের প্রয়োজন। এই দর্শকদের ওপর দিয়ে অত্যাচার অনিয়মও চলেছে অনেক। কিন্তু আজ তবু আমার বিশ্রাম নিতে মন সরছে না। এই পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। সামনে আমার অগণিত দর্শক।"

১৯৫৪ ১২ মার্চ মিনার্ভা সাড়ম্বরে দেবদাস মঞ্চস্থ করে। রংমহল ২২ জুন উপহার দিলেন নাটকের সুখান্ত। রংমের সুখান্ত অভিপ্রেত নয় বলে। নাট্যরূপ দেন নরেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত। এই সময় বিশ্বরূপার পুনরাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু চৌধুরী বামাবিহারী চরিত্রে অভিনয় করেন। অমল বানার্জি আর কাজে পুনরায় ছিলেন নরেন আর বিরজা চরিত্রে।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শিশিরকুমারের প্রযোজনায় দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যরূপায়িত বিলুর ছেলে মঞ্চস্থ হলো শ্রীরঙ্গমে। দেবনারায়ণ গুপ্ত কালো নাথ, অনুপমার প্রেম, বিসর্জন, পরিণীতা প্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি বহু-কাহিনীরও নাট্যরূপ দেন এবং নিষ্কৃতি শ্রীকান্ত চরিত্রে অভিনয় করেন। অমল বানার্জি আর কাজে পুনরায় ছিলেন নরেন আর বিরজা চরিত্রে।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শিশিরকুমারের প্রযোজনায় দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যরূপায়িত বিলুর ছেলে মঞ্চস্থ হলো শ্রীরঙ্গমে। দেবনারায়ণ গুপ্ত কালো নাথ, অনুপমার প্রেম, বিসর্জন, পরিণীতা প্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি বহু-কাহিনীরও নাট্যরূপ দেন এবং নিষ্কৃতি শ্রীকান্ত চরিত্রে অভিনয় করেন। অমল বানার্জি আর কাজে পুনরায় ছিলেন নরেন আর বিরজা চরিত্রে।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শিশিরকুমারের প্রযোজনায় দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যরূপায়িত বিলুর ছেলে মঞ্চস্থ হলো শ্রীরঙ্গমে। দেবনারায়ণ গুপ্ত কালো নাথ, অনুপমার প্রেম, বিসর্জন, পরিণীতা প্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি বহু-কাহিনীরও নাট্যরূপ দেন এবং নিষ্কৃতি শ্রীকান্ত চরিত্রে অভিনয় করেন। অমল বানার্জি আর কাজে পুনরায় ছিলেন নরেন আর বিরজা চরিত্রে।

সারাবছর বদহজম, অজীর্ণতায় অনেকে অযথা ভোগেন... অনেকে ভোগেন না ...কারণ

এ্যাকোয়া টাইকোটিস্

এ্যাকোয়া টাইকোটিস্ এর ওপর ভরসা রাখুন

প্রাকৃতিক ভেষজ সমৃদ্ধ এ্যাকোয়া টাইকোটিস্ মুহূর্তে আপনাকে বদহজম, অজীর্ণতার কষ্ট থেকে রক্ষা করে। আপনার আরাম এনে দেয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

একটি সেরা উৎপাদন।

BC/G/47 GEN

২১ ডিসেম্বর বিধায়ক ভট্টাচার্য নাট্যরূপায়িত 'বৈকুণ্ঠের উইল' দিয়ে।

বিধায়ক ভট্টাচার্য নাট্যরূপায়িত অন্য ছবিগুলি কালিকায় মঞ্চস্থ হয়। জনপ্রিয়তা অর্জন করেও বৈকুণ্ঠের উইল বিশেষ জনের প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হয়।

রংমহলে মঞ্চস্থ হয় অনুপমার প্রেম। ছিনাতায় কাশীনাথ-এ ছবি বিশ্বাস বাংলা মঞ্চে তাঁর কয়েকটি চরিত্র অভিনয় করেন সরযূবালা। রংমহলে 'নিষ্কৃতি' জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ছবি গাঙ্গুলী পভা দেবী রাণীবালা প্রভৃতি ছিলেন অভিনয়ে।

ছবি বিশ্বাসের প্রযোজনায় ধর্মতলার কারনিথিয়ান থিয়েটারে সুলতা মঞ্চস্থ করেন স্বামী। ছবি বিশ্বাস আর সরযূবালা ছিলেন নায়ক-নায়িকা চরিত্রে। সতু সেন আলো এবং রঙ ফোলনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দর্শকদের সামনে ঘরের গালারেই বাস্তবের জল পড়ার দৃশ্যটি খুবই প্রশংসনীয় হয়।

কিছুদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিচ্ছিন্নভাবে চলচ্ছবির পথের দাবী দেবদাস প্রভৃতি মঞ্চস্থ হলেও নিয়মিত শরৎ-কাহিনী অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে ওরিয়েন্ট থিয়েটার এবং শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিয়তমা চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবসানে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর বিচ্ছিন্ন অভিনয়ের সামনেও একটা

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫-১১৩৯
প্রতি বৃহস্পতি ৬॥
শনি রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬॥

বঙ্কিমচন্দ্রের
কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রধান উপভোক্তা : অহীন্দ্র গুপ্ত
নাট্যরূপ : তুলসী মুখার্জী
নির্দেশনা : রবীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
রূপসজ্জা : বিভূতিভূষণ
গান ও সুর : চন্দ্রীদাস বসু

ভ্রমর অহীন্দ্র গুপ্ত বঙ্কিম ঘোষ রোহিণী মঞ্জুশ্রী। হরলাল রায়চৌধুরী সতীন্দ্র ভট্টাঃ রূপসজ্জা মজুমদার মজু ভট্টাঃ ঝুমা মুখার্জী এবং অসীমকুমার ও সুব্রতা চট্টোঃ
—অভিনয় চলছে—

ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত গ্রন্থ ডঃ জিতেন ঘোষের
গ্রীক ট্র্যাজেডির তিন কবি
এস্কিলাস, সোফোক্লিস ইউরিপিদিস জীবনী ও নাট্যালোচনা।
গ্রীক ও রোমক কমেডির চার রূপকার
আরিস্টোফানিস, মিনান্দার প্লটাস টেরেন্স : জীবনী ও নাট্যালোচনা। ৫৲
প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার, বুক ল্যান্ডার্স, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলিকাতা—১২। বিশ্বেশ্বরী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৪

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত দেবদাস চিত্রে প্রমথেশ (দেবদাস) ও অমর মল্লিক (চুনিলাল)।

সাময়িক চাঞ্চল্যকরতা দেখা দিয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা অপসারিত হয় বলেই আমার মনে পড়ে।

সলিল মিত্রের প্রযোজনায় শিশির মল্লিক আর যামিনী মিত্রের যুগ্ম পরিচালনায় স্টার থিয়েটার নতুন করে স্বারোদ্ঘাটন করেন শ্যামলী দিয়ে। যামিনী মিত্র বিদায় নিলে শিশির মল্লিকের একক পরিচালনায় ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় শরৎচন্দ্রের পরিণীতা। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সরযূ, অসিতবরণ প্রভৃতি অভিনয়াংশে থাকেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী নীহার নির্মিত স্টার মঞ্চে সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হলো শ্রীকান্ত।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ২ জুন শ্রীকান্তের পরবর্তী অংশ নিয়ে মঞ্চস্থ হয় রাজলক্ষ্মী। তিনখানা নাটকই পরিচালনা করেন শিশির মল্লিক। নাট্যরূপ দেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। আলো ও দৃশ্যপট পরিচালনায় থাকেন সতু সেন। রঙ্গমঞ্চে শরৎ-কাহিনীর জনপ্রিয়তা এবং মর্যাদার মূলে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার চিরস্মরণীয়। ষোড়শী বিরাজবৌ বিজয়া এই তিনটি শরৎ-কাহিনীর ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মন্দা (পল্লীসমাজ)-এর ক্ষেত্রেও শিশির ভাদুড়ীকে অস্বীকার করা যায় না। চলচ্চিত্রে তাঁরই পরিচালনায় পল্লীসমাজ চিত্রায়িত হয়। বিন্দুর ছেলের সর্ব কৃতিত্ব শিশিরকুমারের। বিপ্রদাসের ক্ষেত্রে অংশত। এই দুটি নাটকের মূল অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি। সম্মিলিত অভিনয়ের কথা আমি বলছি না।

ষোড়শী চৌধুরী নাট্যরূপায়িত চরিত্রহীন এবং শচীন সেনগুপ্ত নাট্যরূপায়িত পথের দাবী আর দেবদাসের কথাও বিশেষভাবে বলতে হয়। দেবনারায়ণ গুপ্তের বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, পরিণীতা বিধায়ক ভট্টাচার্যের বিপ্রদাস বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চন্দ্রনাথ-এর নাট্যরূপ শরৎ-কাহিনীকে মঞ্চলাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছে।

মহেশ, মন্দিলার ফল, অরক্ষণীয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায় নাট্যরূপায়িত বিভিন্ন শরৎ-কাহিনীর অভিনয় দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। কিন্তু দুর্বল নাট্যরূপে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শরৎ-কাহিনীর মর্যাদা রক্ষিত না হওয়াতে বেদনা অনুভব করেছি।

রঙ্গমঞ্চের চেয়ে চলচ্চিত্রে শরৎ-কাহিনীর জনপ্রিয়তা বেশী করে অনুভূত হয়। প্রায় বেশীর ভাগ শরৎ-কাহিনী চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। শুধু বাংলায় নয়—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং একাধিকবার চিত্রায়িত হয়েছে এক-একটি কাহিনী। এদিক থেকে মনে হয় রূপালী পর্দায় শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকে আজকের জনপ্রিয় উত্তমকুমারের পক্ষেও ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। রঙ্গমঞ্চে যেমন শিশিরকুমার চলচ্চিত্রে তেমনি শরৎ-কাহিনীর মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তার মূলে প্রমথেশ বড়ুয়ার কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। অথচ প্রমথেশ মাত্র দুখানি শরৎ-কাহিনীর চিত্ররূপ দেন। দেবদাস আর গৃহদাহ।

নির্বাকযুগে জীবনে আলো ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মনমোহন থিয়েটারে মুক্তিলাভ করে। চিত্রখানির প্রথমার্ধ পরিচালনা করেন শিশিরকুমার আর শেষার্ধ নরেশ মিত্র।

দেনাপাওনা চিত্রে জীবানন্দ দুর্গাদাস
বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয়ে দুজনেই ছিলেন। চিত্রখানি যোজনা করেছিলেন তাজমহল পিকচার্স। ৯২৪ খৃষ্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত এদের চন্দ্রনাথ রিচালনা করেন নরেশ মিত্র। নামভূমিকায় লেন দুর্গাদাস।

নরেশ মিত্রের পরিচালনায় নির্বাক দেব- স ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পেয়েছিল। জ্ঞান র্যা আর তারকবালা (লাইট) অভিনয় রেছিলেন দেবদাস আর পার্বতী চরিত্রে। রাকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় শ্রীকান্ত ১৩০ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পায়। কান্ত নার্জি আর শান্তিকুমারীকে দেখা গিয়ে- ল শ্রীকান্ত আর পিয়ারী বাইজী চরিত্রে। টিশ ডোমিনিয়ান ফিল্ম প্রযোজিত চরিত্র- নি পরিচালনা করেন ধীরেন গাঙ্গুলী। ১৩১ খৃষ্টাব্দে চিত্রখানি মুক্তি পায়। ত্রীশ আর সাবিত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন মা গুপ্ত আর শীলা টনকীনস। চারু বাবু প্রমথেশ সম্পর্কে লিখিত রায়ের পরিচালনায় 'স্বামী' মুক্তি পায় ২৯৩১ খৃষ্টাব্দে।

নির্বাক ছবি মুখর হয়ে উঠলো। সারা বিশ্বের রুপালী পর্দা উঠলো ঝলমলিয়ে। নির্বাক যুগের ইন্টারন্যাশনাল সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সে রূপান্তরিত হলো। নিউ থিয়েটার্সের জয়-রথের জয়যাত্রা শুরু হলো। শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা দিয়ে। মহাস্থবির-জাতক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত দেনা-পাওনা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তি পায়। জীবানন্দ আর ষোড়শী চরিত্রে অভিনয় করেন দুর্গাদাস আর নিভাননী।

শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ শিশিরকুমারের পরিচালনায় চিত্রায় মুক্তি পেল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১ জুলাই। শিশিরকুমার অভি- নয় করেন রমেশ চরিত্রে। জেঠাইমা আর রমা চরিত্রে অভিনয় করেন কঙ্কাবতী আর প্রভা। তৃতীয় শরৎ কাহিনী হিসেবে নিউ থিয়েটার্স 'বামুনের মেয়ে' নির্বাচন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হলো দেবদাস আর তার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন প্রমথেশ বড়ুয়া। দেবদাস—প্রমথেশ। পার্বতী —যমুনা। ভুবন চৌধুরী—পরিচালক দীনেশ দাস। চুনীলাল—পরিচালক অমর মল্লিক। চন্দ্রমুখী—চন্দ্রাবতী। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ চিত্রায় মুক্তি পেল দেব- দাস। ২১ সেপ্টেম্বর নিউ সিনেমায় মুক্তি পেল হিন্দি সংস্করণ। হিন্দিতে দাবগাস —দেবদাস। যমুনা দেবী—পার্বতী। রাজ- কুমারী—চন্দ্রমুখী। প্রমথেশ পাজু ছদ্মনামে মহেনের চরিত্রে অভিনয় করেন।

ভারতীয় চিত্রজগতে দেবদাস কী রকম আলোড়ন এনেছিল ভারতের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার নিরঞ্জন পালের মন্তব্য থেকেই তা জানা যাবে। প্রমথেশের জীবনীচরিত লিখবার সময় সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে নিরঞ্জন- বাবু প্রমথেশ সম্পর্কে লিখিত

শরৎ-জন্মশতবর্ষে অবশ্য পাঠ্য কয়েকখানি বই

শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা : অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল—৩-৫০ **শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী** : অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল—৯-০০ গত এক দশকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রকাশিত এমন কোনো গ্রন্থ নাই যেখানে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণীর উল্লেখ নাই। শরৎ সাহিত্য আলোচনা ও গবেষণায় এ গ্রন্থ অপরিহার্য।

Sarat Chandra Chatterjee : Humayun Kabir — Rs. 4/- The Fire & The Betrothed Eng. Trans by S. L. Ghosh From Grihadaha and Datta.

এক সমুদ্র দুই কবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়—৫-৫০ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। **ছড়া কথা** : গল্প সঙ্কলন : নন্দিনী ভট্টশালীর ওড়িয়া গল্পগ্রন্থ কেতকি কুমার বঙ্গানুবাদ; ৪-০০ উৎপল দত্তর নাটক বিদ্রোহী ডলো—৪-৫০; **উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য** : ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ৯-০০; **ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা** : ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য—৮-০০;

Bengali for Foreigners : Sefali Nundy — Rs. 5/- Stalin Era : Anna Louise Strong — Rs. 4/- :

শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থ—সাময়িক পত্রে শরৎচন্দ্র : অরুণ রায়চৌধুরী : ১

পপুলার লাইব্রেরী : ১৯৩।১বি, বিধান সরণি; কলিকাতা-৬

পশ্চিমের পাঁচালি
ডঃ শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ৪-০০
বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল
অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ২৫-০০
হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস
বিশ্বকুমার ভট্টাচার্য ও বালীকুমার ভট্টাচার্য ১০-০০
আরামবাগের ইতিকথা
চুনীলাল বসু ৩-০০
সরল কৃষি-বিজ্ঞান ১০-০০
প্রাথমিক উদ্যান-বিদ্যা ৭-৫০
বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
মৃত্তিকা-বিজ্ঞান
হরীন্দ্রনাথ মজুমদার ১২-০০
ডেভিড কপারফিল্ড
পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় ২-৫০
মা : ম্যাক্সিম গোর্কী
অনুবাদ : নারায়ণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৬-০০
চেকভের গল্প
অনুবাদক : বিমল দত্ত ৫-০০
দেশী-বিদেশী গল্প
অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪-০০
দেশী-বিদেশী
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪-০০
লীলুর পিকনিক
অমিতাকুমারী বসু ৩-০০
সোনার পাখী
অমিতাকুমারী বসু ৩-৫০
আকাশ জয়ের গল্প
বীরেন দাশ ৩-০০
অমর এ্যাডভেঞ্চার
বীরেন দাশ ২-০০
কথা-কথালী
বালীকুমার ৪-০০
রায় বড়ুয়ার শিকার-কাহিনী
হিরণ্ময় ঘোষাল ৩-৫০
বিদেশী রূপকথা
ইন্দিরা দেবী ২-৫০
ছোটদের গর্কি কবি দাস ২-৫০
ছোটদের মাইকেল মধুসূদন ২-০০
ছোটদের শেকস্‌পীয়র ২-৫০
ছোটদের মিলটন ২-৫০
ছোটদের বার্নার্ড শ ২-৫০
ছোটদের টলস্টয় ২-৫০
আটলাস গার্ডনার বিমল দত্ত ২-০০
ঔপন্যাসিক পরশুরাম বিমল দত্ত ২-০০

অশোক পুস্তকালয়
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

চরিত্রহীন, দেবদাস ও নিষ্কৃতি—শরৎচন্দ্রের তিনটি নাটকে যথাক্রমে অহীন্দ্র চৌধুরী (কৈলাস খুড়ো), ছবি বিশ্বাস (দেবদাস) ও জহর গাঙ্গুলী।

শুধু পরিচালনাই করেন নি, চিত্রনাট্যও করেছেন; নামভূমিকাটিকে অভিনয় রূপায়িত করেছেন; প্রত্যেকটি ই তিনি শিল্প-শৈলীর পরিচয় দিয়ে শচীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন : দেব- প্রথম বাংলা ছবি—যা যথার্থ মূর্তি এবং নাটকীয়তা স্বার স্ফুটতর চলনশীল ছবির মালার ভিতর দিয়ে। সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে বলে তার তি গতি ক্ষুণ্ণ হয়নি।" 'দেবদাস' কেন ষি চলচ্চিত্র শিল্পের বিষাদশশী হয়ে -তার স্বপক্ষে অধিক বিশ্লেষণ রাজন।

রের শরৎকাহিনী একাধিকবার বাংলায় রূপায়িত হয়েছে সেগুলির মধ্যে দ, বিজয়া, দেনাপাওনা (ষোড়শী নামে রবার চিত্রায়িত হয়) জালো ও ছায়া দিবেদন নামে প্রথমবার চিত্রায়িত হয়),

ক-পত্র
ন নামে

দনা করিবেন 'বিচিত্রা'
গ্রাহকবর্গের সহযোগিতা
য। যোগাযোগ করুন :
ী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গৃহদাহ, পল্লীসমাজ, অরক্ষণীয়া, ছেলে, বিরাজবৌ, বৈকুণ্ঠের উইল, পি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

একবার করে চিত্রায়িত হয়েছে প মশাই, কাশীনাথ, রামের সুমতি, নি চন্দ্রনাথ, মামলার ফল, ছবি, অনুরাধা, মন্দির, শুভদা, বামুনের মেয়ে, হরি নববিধান, পরেশ, বর্ণচোর, মেজদিদি, গুয়া (রসচক্র), পথনির্দেশ, পথের দাবী। সব্যসাচী), কমললতা, রাজলক্ষ্মী ও শ্রী ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি (শ্রী পর্ব নিয়ে পৃথকভাবে তিনখানি বাম্বেতে হিন্দিতে বিমল রায়ের পরিচ দেবদাস ও পরিণীতা নির্মিত হয়। পূর্বে পণ্ডিতমশাইর হিন্দি চিত্ররূপ নি এবং রামের সুমতির ছোট্টা ভাই নির্মিত কলকাতার পৃথকভাবে হিন্দিতে নি হয়েছিল বিন্দুর ছেলে (ছোটি মা) শুভদার হিন্দি চিত্ররূপ। নিউ থি দেবদাস, গৃহদাহ (মঞ্জিল), দেনাপাওনা দিদি (বড়িদিদি) প্রভৃতির হিন্দী নি দিয়েছিলেন। পীযূষ বসুর পরিচ পথের দাবীর দ্বিতীয় চিত্ররূপ উত্তা অভিনীত সব্যসাচী মুক্তিপ্রতীক্ষায়। তৃতীয় বারের জন্য চিত্রে রূপায়িত

বঙ্গসমস্ত চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্র বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রতিশ্রুতি বর্তমান আলোচনার এখানেই শেষ হলো।

শরৎচন্দ্র (সংক্ষিপ্ত জীবনী)

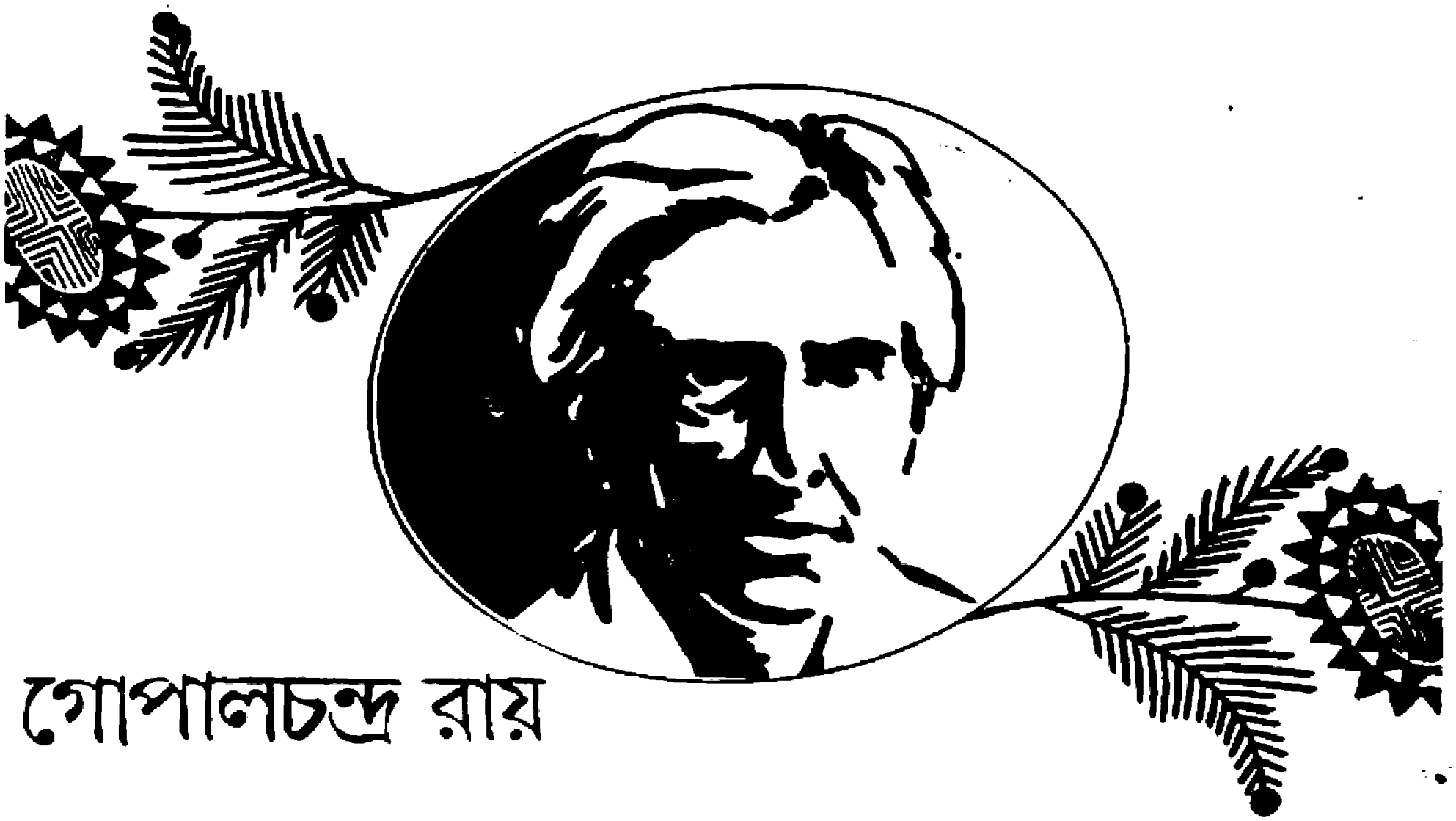

গোপালচন্দ্র রায়

হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর একটি ছোট গ্রাম। ওয়াট ইস্টার্ণ রেলওয়ের বাঙ্গেল রেল স্টেশন থেকে মাইল দুই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র) শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। প্রভাস-চন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র নামে শরৎচন্দ্রের আরও দুই ছোট ভাই এবং অনিলা দেবী ও সুশীলা দেবী নামে দুই বোনও ছিলেন। অনিলা দেবী ছিলেন ভাই-বোনেদের মধ্যে সবার বড় আর সুশীলা দেবী ছিলেন সবার ছোট।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল এনট্রান্স পাস করে কিছুদিন এফ-এ পড়েছিলেন। তিনি অকালকুষ্মাণ্ড প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই অল্প কিছুদিন চাকরি করা ছাড়া আর কখনও কিছুই করেন নি। গল্প-উপন্যাস লিখতেন; কিন্তু ঐ অবসর সময়টুকুই কোন লেখা সম্পূর্ণ করতেন না। স্বভাব-অনটনের জন্যই তিনি বেশীর ভাগ সময় স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তাই শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অনেকগুলো বছর কেটেছিল ভাগলপুরে মামার বাড়িতে।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ২৪-পরগণা জেলার হালিশহরে। কেদারবাবু ভাগলপুরে কালেকটারি অফিসের কেরানি ছিলেন। তিনি ভাগলপুরেই সপরিবারে বাস করতেন। কেদারবাবুর ছোট চার ভাই পরিবারসহ তাঁর কাছেই থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ বছর সেই সময় তাঁর পিতা তাঁকে গ্রামের (দেবানন্দপুরের) পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। পাঠশালায় শরৎচন্দ্র এখানে দু-তিন বছর পড়েন। পাঠশালায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তিনি যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমনি ছিলেন দুরন্ত।

শরৎচন্দ্র যখন পাঠশালায় পড়তেন, সেই সময় স্থানীয় সিদ্ধেশ্বরী ভট্টাচার্য দেবানন্দপুরে একটি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল স্থাপিত হলে শরৎচন্দ্রের পিতা শরৎচন্দ্রকে পাঠশালা থেকে এনে সিদ্ধেশ্বরীর মশাইয়ের স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই স্কুলেও শরৎচন্দ্র বছর তিনেক পড়েন।

এই সময় শরৎচন্দ্রের পিতা বিহারের ভিহিরিতে একটা চাকরি পান। চাকরি পেয়ে তিনি ভিহিরিতে চলে যান। যাবার সময় তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে রেখে যান। পরে তিনি পরিবার ভিহিরিতে নিয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু পড়বার জন্য ভাগলপুরেই থেকে গেলেন। তবে ছুটিতে অবশ্য তিনি মাঝে মাঝে ভিহিরিতে বাবা-মার কাছে যেতেন।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে এলে তাঁর মাতামহ তাঁকে ভাগলপুরের দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি ক্লাসে ভর্তি করে দেন। ঐ ক্লাসে শরৎচন্দ্রের মাতামহের কনিষ্ঠ পুত্র অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্রনাথও পড়তেন। সে বছর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে শরৎচন্দ্র এবং মণীন্দ্রনাথ উভয়েই পাস করেছিলেন।

ছাত্রবৃত্তি পাস করে শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরের জেলা স্কুলে সেকালের সেভেনথ ক্লাসে অর্থাৎ বর্তমানের ক্লাস সেভেন বা সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

ছাত্রবৃত্তিতে তখন ইংরাজী পড়ানো হত না। তবে বাংলা আর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় একটু বেশী করেই পড়ানো হত। শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাস করার ফলে জেলা স্কুলের সেভেনথ ক্লাসের বাংলা অঙ্ক ইতিহাস তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল। তাঁকে কেবল ইংরাজীই যা পড়তে হত। ফলে সে বছরের শেষে পরীক্ষায় ইংরাজী এবং অন্যান্য বিষয়েও শরৎচন্দ্র এত বেশী নম্বর পেয়েছিলেন যে, শিক্ষকমশায়রা তাঁকে ডবল প্রমোশন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সেকালের সেভেনথ ক্লাস থেকে সিকসথ ক্লাস টপকে একেবারে ফিফথ ক্লাসে উঠেছিলেন। তখনকার দিনে স্কুলের নীচের দিক থেকে এইভাবে ক্লাস গণনা হত—নাইনথ ক্লাস এইটথ ক্লাস সেভেনথ ক্লাস সিকসথ ক্লাস ফিফথ ক্লাস ফোরথ ক্লাস থার্ড ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস ও ফার্স্ট ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাস হল বর্তমানের ক্লাস টেন বা দশম শ্রেণী।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র জেলা স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে উঠলেন, সেই সময় তাঁর পিতার ভিহিরির চাকরিটিও চলে যায়।

চলে যায়। শরৎচন্দ্র তখন তাঁর এক বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়িতে যান। পেগুতে গিয়ে তিনি তাঁর বন্ধু অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের অনেক দিন ছিলেন।

মণিবাবুর বাড়ীতে থাকাকালে পার্কসার্কস ওয়ার্কস একাউন্টস ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রকুমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একদিন পরিচয় বন্ধু শরৎচন্দ্রকে বেকার ছেলে ১৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিজের শরৎচন্দ্রের একটা চাকরি করে দেন। এই চাকরী পেয়েই পেগু থেকে চলে আসেন। এই চাকরি পাওয়ার রৎচন্দ্র মাঝে লাগলকীবনে কিছু ধানের ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ ন। শরৎচন্দ্র মণিবাবুর দেওয়া এই ১৯১৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত ন। ১৯১২য় শরৎচন্দ্রের অফিস একউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের ত হয়েছিল।

চন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় বেশীর ভাগই থেকেছেন শহরের উপকণ্ঠে পাজনডং অঞ্চলে। এখানে শহরের লোক মিস্ত্রীরাই প্রধানত থাকত। মিস্ত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা

তিনি তাদের চাকরির দরখাস্ত তেন, বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে অসুখে ঘিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি করতেন, বিপদে সাহায্যও করতেন। শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি ং দাদাঠাকুর বলে ডাকত। শরৎ-চন্দ্র এদের নিয়ে একটা সন্ধীর্তনের দলও করেছিলেন।

রেঙ্গুনে থাকাকালে ১৯১২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র একবার অফিসে এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। এই সময় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফৎ যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে একদিন তাঁর পরিচয় হয়। পরিচয় হলে ফণীবাবু তাঁর কাগজে লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে লেখা পাঠিয়ে দেবেন বলে কথা দেন।

ঐ কথা অনুযায়ী শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে তাঁর রামের সুমতি গল্পটি পাঠিয়ে দেন। ফণীবাবু এই গল্প তাঁর কাগজে ১৩১৯ সনের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। রামের সুমতি যমুনায় প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র এক গল্প লিখেই একজন মহাশক্তিশালী লেখক হিসাবে সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে পরিচিত হন।

ইতিপূর্বে ১৩১৪ সনে ভারতী পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছিল, তখন অনেকের মতে রবীন্দ্র-নাথও এই লেখা পড়ে শরৎচন্দ্রকে প্রতিভা-বান লেখক বলে বুঝেছিলেন। বিভূতিভূষণ ভট্টের সতীর্থ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের লেখার খাতা থেকে 'বড়দিদি' নকল করে এনেছিলেন এবং পরে শরৎচন্দ্রকে না জানিয়ে এটি ভারতীতে প্রকাশ করেছিলেন।

রামের সুমতি প্রকাশিত হলে, তখন নবপ্রকাশিত ভারতবর্ষ এবং সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার কর্তৃপক্ষও তাঁদের কাগজের

প্রকাশিত হল :

শরৎ-কথা সুবোধ নাগ ৬-০০

মিস্ট্রি মার্ডার নিশাচর ৭-০০

পলাশের রঙ নীল চন্দ্রনাথ ১০-০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

প্রথম প্রেম দ্বিতীয় পুরুষ ৬-০০

আসন্ন প্রকাশ

অনিল রায়

কফি থেকে কফিন ৭-০০

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ৪০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলি-৯

CENTRAL LIBRARY

কথা শরৎচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে থাকেন। শরৎচন্দ্র যমুনার জন্য গল্প উপন্যাস ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে আরম্ভ করেন। শেষে যমুনা ছাড়া কেবল ভ্রমণবৃত্তান্তই লিখতে থাকেন এবং ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাঁর বইও প্রকাশ করতে শুরু করেন। যমুনা-সম্পাদক ফণী পালই অবশ্য প্রথম তাঁর বড়দিদি উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সময় ফণীবাবুর বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকারও তাঁদের দোকান এম সি সরকার এণ্ড সন্স থেকে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ পণ্ডিত মশাই প্রভৃতি কয়েকটি বই প্রকাশ করেন।

১৯১৬ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে শরৎচন্দ্র হঠাৎ দুরারোগ্য পা ফেলা রোগে আক্রান্ত হন। তখন তিনি স্থির করেন আফিসে এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে কবিরাজী চিকিৎসা করবেন। অফিসে লম্বা ছুটি চাইতে সাহেবের সঙ্গে কথা হয়। ফলে শরৎচন্দ্র চাকরীতে ইস্তফা দিয়েই রেঙ্গুনের জন্য রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে চলে আসেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে সপরিবারে এসে প্রথমে হাওড়া শহরে ৬নং বাজে শিবপুরে ভাড়া বাড়ীতে ওঠেন। এ বাড়ীতে তিনি প্রায় ৮ মাস ছিলেন। তারপর এ বাড়ী ছেড়ে তিনি পাকাই ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে যান। ঐ বাড়ীতে তিনি প্রায় ১ বছর ছিলেন। তারপর এখান থেকে শিবপুর ব্রাঞ্চ স্কুলের কাছে ৪৯।১ কালী-কৃষ্ণ মুখার্জি লেনে গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলেন। এইখানে থাকার সময়েই তিনি তাঁর দিদির গ্রাম হাওড়া জেলার বালির খালের শ্রীবিন্দপুরের কাছেই সামতাবেড়ের মামার কিনে একটা সুন্দর মাটির বাড়ী তৈরী করান। বাড়ীটি একেবারে গঙ্গার ধারেই। শরৎচন্দ্র ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া শহর ছেড়ে এই সামতাবেড়ের বাড়ীতে চলে যান।

হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই শরৎচন্দ্র তাঁর বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাই ঐ সময়টাকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।

এই বাজে শিবপুরে থাকাকালেই ১৯২১ খৃস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি তখন দেশবন্ধুর আহ্বানে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তিনি হাওড়ায় থাকতেন বলে দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি করেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তাকে ১৯২২ খৃস্টাব্দে তিনি একবার হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে চাইলে দেশবন্ধু তা হতে দেন নি।

শরৎচন্দ্র যাঁহাসে কংগ্রেসের একজন ডেটারান্ট হলেও কখনই 'কন্ধু ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সকল সংগ্রামী বা সংগ্রামরত বিপ্লবীদের সুখে দুঃখে যোগ থাকতেন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা সংক্ষেপে বি ভি দলের সর্বাধিনায়ক প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ কলকাতা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বিপ্লবী রচনা সমাজ প্রভৃতি ছাড়াও বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু বাবু, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি খ্যাতনামা বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। বিপিনবাবু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা হতেন। শরৎচন্দ্র বহু বিপ্লবীকে নিজের বিভলবার ও বন্দুকের গুলী এবং অর্থও সাহায্য করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্য সেনকেও তিন তাঁর বৈপ্লবিক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। পরিচয় হয়েছিল বেড়ালকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে বিচিত্রার অধিবেশনে। শরৎচন্দ্রের বালাবন্ধু, ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎচন্দ্র বিচিত্রার আসরে ১৩২৩ সালের ১৪ই চৈত্র তারিখে তাঁর বেনামী গল্পটি পড়েছিলেন।

পরে নানা সূত্রে এঁদের উভয়ের মধ্যে

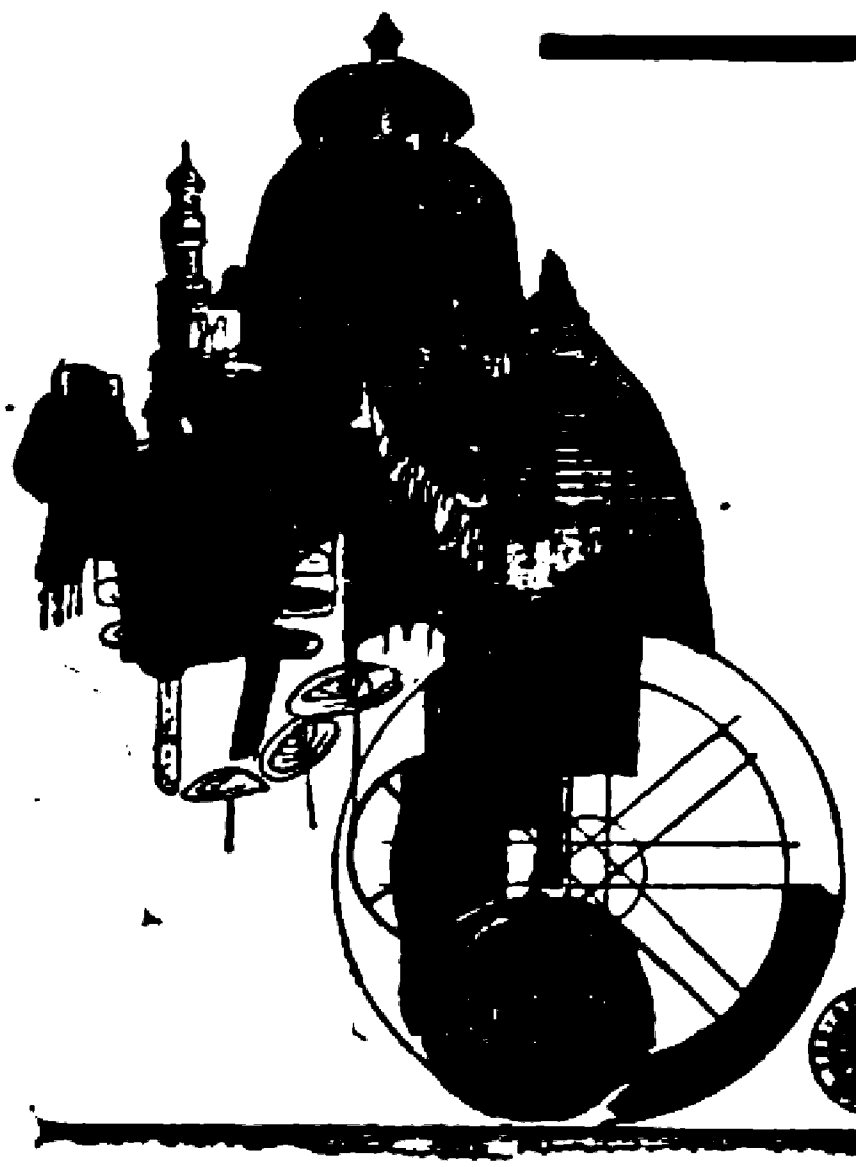

ঐক্যের চক্র

আমাদের পূর্বসূরীদের বহুমুখী প্রতিভার অবদান ভারতের সুসংহত সংস্কৃতি। আপাতঃ দৃষ্টিতে আকৃতিগত পার্থক্য তাদেরও এই সংস্কৃতির ধারা অন্তর্নিহিত রয়েছে ভারতের ঐক্য যা সমগ্র দেশবাসীকে এক ও অবিচ্ছেদ্য করে রেখেছে। আর এই সাংস্কৃতিক সংহতিতে ভারতীয় রেলওয়ের অবদান অপরিসীম ও অমূল্য। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত—হিমালয়ের কোল কন্যাকুমারী—ভারত মাতার বাণী ব'য়ে চলেছে রেলওয়ে চক্র

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

আরও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। শরৎচন্দ্র নানা প্রয়োজনে একাধিকবার শান্তিনিকেতনে ও ও জোড়াসাঁকোয় কবির কাছে গেছেন। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় বাড়ী করলে সেখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি একবার শরৎচন্দ্রের বাড়ীতেও গিয়েছিলেন।

কবির সত্তর বছর বয়সের সময় দেশবাসী যখন কলকাতার টাউন হলে তাঁকে অভিনন্দন জানায় সেই অভিনন্দন সভার বিখ্যাত মানপত্রটি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কবিও নিজে একবার শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে যখন থেকে বাস করতে থাকেন, তখন থেকে ঐ অঞ্চলের দরিদ্র লোকদের অসুখে চিকিৎসা করা তাঁর একটা কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোগী দেখে তিনি শুধু ওষুধই দাতব্য করতেন না অনেকের পথ্যও কিনে দিতেন। হাওড়া শহরে থাকার সময় সেখানেও তিনি এই রকম করতেন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড় অঞ্চলের বহু দুঃস্থ পরিবারকে বিশেষ করে অনাথ বিধবাদের মাসিক অর্থ সাহায্য করতেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থাকার সময় অল্প ৩-৪টি মাত্র গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন।

আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় কলকাতার বালীগঞ্জে একটা বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। এটি তৈরি হয়েছিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। বাড়িটি দোতলা এবং দেখতে সুন্দর। এই বাড়ির ঠিকানা হল—২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড।

কলকাতার বাড়ি হলে তিনি কখনো কলকাতায়, আবার কখনো সামতাবেড়ে এইভাবে কটাতেন। কলকাতায় থাকাকালে কলকাতার তখনকার সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দুটি নাম-করা প্রতিষ্ঠান রবিবাসর ও রসচক্রের সদস্যরা তাঁকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। এঁরা কখন কখন শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনাও জানিয়েছেন। রসচক্রের সদস্যরা শরৎচন্দ্রকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করেছিলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক উপহার দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একবার বি-এ পরীক্ষার বাংলার পেপার-সেটার বা প্রশ্নকর্তাও নিযুক্ত করেছিলেন। এসব ছাড়া, দেশবাসীও তাঁকে কখন অপরাজেয় কথাশিল্পী' সাহিত্য সম্রাট' এই আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। বৈঠকখানা বুধ সংঘ, শিবপুর সাহিত্য সংসদ, যশোহর সাহিত্য সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং দেশবাসীও একাধিকবার তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র কেবল ভালমানুষ গায়ক, বাদক, অভিনেতা ও চিকিৎসকই ছিলেন না, তাঁর চরিত্রে আরও অনেকগুলি গুণ ছিল। তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি সবার আগে চোখে পড়ে, তা হল—মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন দরদী মানুষ। মানুষ, এমনকি জীবজন্তুরও দুঃখ-দুর্দশা দেখলে বা তাদের দুঃখের কাহিনী শুনলে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় এজন্য তাঁর চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ত।

পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতিই তাঁর দরদ ছিল বেশী। আবার সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজ-পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি তাঁর করুণা ছিল আরও বেশী। পতিতা নারীদের ভুল পথে যাওয়ার জন্য তিনি হৃদয়ে একটা বেদনাও অনুভব করতেন।

শরৎচন্দ্র জীবজন্তুর প্রতি স্নেহবশতঃ সি এস পি সি এ-র অর্থাৎ কলকাতা পশু-ক্লেশ নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন বহু বছর।

এক সময় অবশ্য তিনি একজন ছোট খাট শিকারীও ছিলেন। তখন ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে এবং বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। পরে এসব ছেড়ে দেন। তিনি বরাবরই নম্র সাঁতারু ছিলেন। সাপুড়েদের মতই তিনি অনায়াসেই বিষধর সাপও ধরতে পারতেন।

আর তিনি ছিলেন অসাধারণ অতিথি পরায়ণ, বন্ধুবৎসল ও অত্যন্ত পরোপকারী মানুষ। রীতিমতই ধার্মিক এবং বেশ পল্লীপ্রেমিকও ছিলেন। বিলাসী না হলেও কিছুটা সৌখীন ছিলেন—বিশেষ করে বেশভূষায় ও লেখার ব্যাপারে। তিনি ঘরোয়া বৈঠকে খুব গল্প করতে পারতেন বন্ধুদের সঙ্গে বেশ পরিহাস-রসিকও ছিলেন। আত্মপ্রচারে সর্বদাই বিমুখ ছিলেন এবং নিজের স্বার্থের জন্য কারুকে কিছু বলা কখনও পছন্দ করতেন না।

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ কয়েক বছর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। একটা-না-একটা রোগে ভুগছিলেনই। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি কিছুদিন জ্বরে

বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে আমাদের আধুনিকতম অবদান :

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত

ক। দণ্ডকারণ্যের অন্ধকারে ১০৲ খ। পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা

বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নৃতত্ত্বমূলক ভ্রমণ কাহিনী। ভৌমিয়র এলউইন যার প্রধানতম নায়ক।

দরিদ্র পুরুলিয়াবাসীর ছোট-খোপ-নাচা কিভাবে বনচরের আমেরিকার চিত্ত জয় করলো তার সরস কাহিনী।

গ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন ৮৲

প্রখ্যাত নাট্যকার অনালোচিত এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশিষ্ট আলোচনা

অধ্যাপক শ্রীসনৎ কুমার মিত্র—প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা

পশ্চিমবঙ্গের বোলটি জেলার বৈচিত্র্যময় লোক-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান এভাবে হাতের মুঠোয় আর কখনো আসেনি। সঙ্গে আছে গ্রন্থাগার কর্তৃক গৃহীত অর্ধশতাধিক দুর্লভ আলোকচিত্র। বঙ্গ-সংস্কৃতিকে জানতে এমন সকলের পক্ষেই একটি প্রয়োজনীয় hand book - [কুড়ি টাকা মাত্র]

সদ্য প্রকাশিত আমাদের কয়েকটি অবিশ্মরণীয় গ্রন্থ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কলকাতার নট ৬৲

চিরঞ্জীব সেনের নীল আতঙ্ক ৮৲

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের মুখর বন্দী ১২৲

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস। ৫/ ১এ, কলেজ রো। কলিঃ ৯।

১৯১৩	মে	... বিরাজ বৌ (উপনাস)
	জুলাই	... বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (গল্প-সমষ্টি)
	আগস্ট	... পরিণীতা (গল্প)
	সেপ্টেম্বর	... পণ্ডিতমশাই (উপন্যাস)
১৯১৫	ডিসেম্বর	... মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প (গল্প-সমষ্টি)
১৯১৬	জানুয়ারী	... পল্লী-সমাজ (উপন্যাস)
	মার্চ	... চন্দ্রনাথ (উপন্যাস)
	আগস্ট	... বৈকুণ্ঠের উইল (গল্প)
	নভেম্বর	... অরক্ষণীয়া (গল্প)
১৯১৭	ফেব্রুয়ারী	... শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (উপন্যাস)
	জুন	... দেবদাস (উপন্যাস)
	জুলাই	... নিষ্কৃতি (গল্প)
	সেপ্টেম্বর	... কাশীনাথ (গল্প-সমষ্টি)
	নভেম্বর	... চরিত্রহীন (উপন্যাস)
১৯১৮	ফেব্রুয়ারী	... স্বামী (গল্প-সমষ্টি)
	সেপ্টেম্বর	... দত্তা (উপন্যাস)
	সেপ্টেম্বর	... শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস)
১৯১৯	জানুয়ারী	... ছবি (গল্প-সমষ্টি)
	মার্চ	... গৃহদাহ (উপন্যাস)
	অকটোবর	... বামুনের মেয়ে (উপন্যাস)
১৯২০	এপ্রিল	... নারীর মূল্য (সন্দর্ভ)
	আগস্ট	... দেনা-পাওনা (উপন্যাস)
১৯২১	অকটোবর	... নব-বিধান (উপন্যাস)
১৯২৬	মার্চ	... হরিলক্ষ্মী (গল্প-সমষ্টি)
	আগস্ট	... পথের দাবী (উপন্যাস)
১৯২৭	এপ্রিল	... শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (উপন্যাস)
	আগস্ট	... ষোড়শী (দেনা-পাওনার নাট্যরূপ)
১৯২৮	আগস্ট	... রমা (পল্লী-সমাজের নাট্যরূপ)
১৯২৯	এপ্রিল	... তরুণের বিদ্রোহ (সন্দর্ভ)
১৯৩১	মে	... শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)
১৯৩২	আগস্ট	... স্বদেশ ও সাহিত্য (সন্দর্ভ-সংগ্রহ)
১৯৩৩	মার্চ	... শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস)
১৯৩৪	মার্চ	... অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প-সমষ্টি)
	ডিসেম্বর	... বিজয়া (দত্তার নাট্যরূপ)
১৯৩৫	ফেব্রুয়ারী	... বিপ্রদাস (উপন্যাস)
		[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]
১৯৩৮	এপ্রিল	... ছেলেবেলার গল্প (তরুণপাঠ্য গল্প-সমষ্টি)
	জুন	... শুভদা (উপন্যাস)

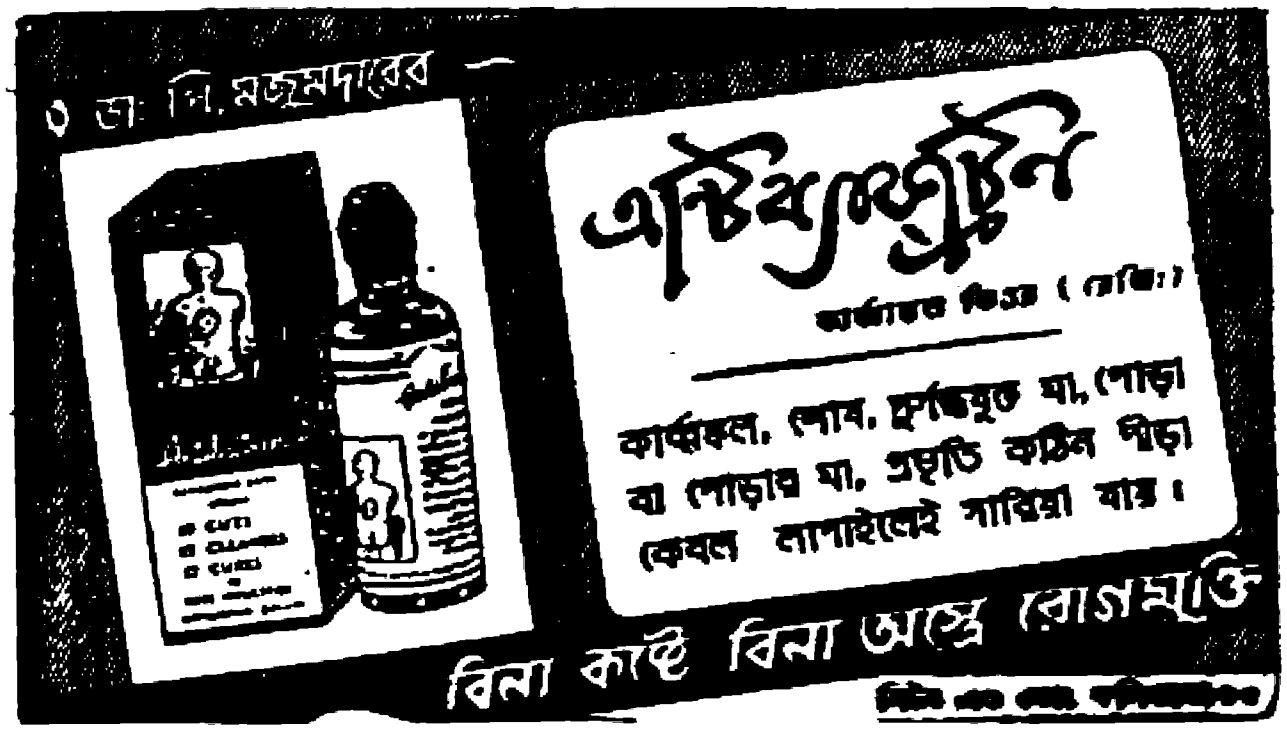

দেওঘর বেড়াতে যান। সেখানে তিন-চার মাস থাকেন।

দেওঘর থেকে এসে কিছুদিন সুস্থ থাকার পর শরৎচন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে আবার অসুখে পড়লেন। এবার তাঁর পাকাশয়ের পীড়া দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতে এই রোগ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। যা খান তাদো হজম হয় না। তার উপর পেটেও যন্ত্রণা দেখা দেয়।

শরৎচন্দ্র এই সময় সামতাবেড় গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। চিকিৎসা করাবার জন্য কলকাতার বাড়িতে এলেন। কলকাতার ডাক্তাররা এক্স-রে করে দেখলেন, শরৎচন্দ্রের বৃক্কতে ক্যানসার ত হয়েইছে, অধিকন্তু এই ব্যাধি তাঁর পাকস্থলীও আক্রমণ করেছে।

ডক্তাররা স্থির করলেন, শরৎচন্দ্রের পেটে অস্ত্রোপচার করা ছাড়া আর উপায় নেই। শরৎচন্দ্র ৩নং ভিকটোরিয়া টেরাসে 'পার্ক নার্সিং হোমে' ভর্তি হলে, সেখানে তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু এতেও কিছু হল না। ফল ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী (বাংলা ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ) বেলা দশটার সময় সকলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৬১ বছর ৪ মাস।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেন—যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির স্বল্প চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।

এর কয়েকদিন পরে ১২ই মাঘ তারিখে কবি আবার শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে এই কবিতাটি লিখেছিলেন—

> যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
> ক্ষতি তব ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

সব শেষে শরৎচন্দ্রের রচিত গ্রন্থগুলির প্রকাশের একটা কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দিয়ে দিলাম। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থগুলি ছাড়া শরৎচন্দ্রের কিছু অসমাপ্ত এবং টুকরো লেখাও আছে—

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লি.-এর পক্ষে শ্রীসুধাংশুর সরকার কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ২৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।
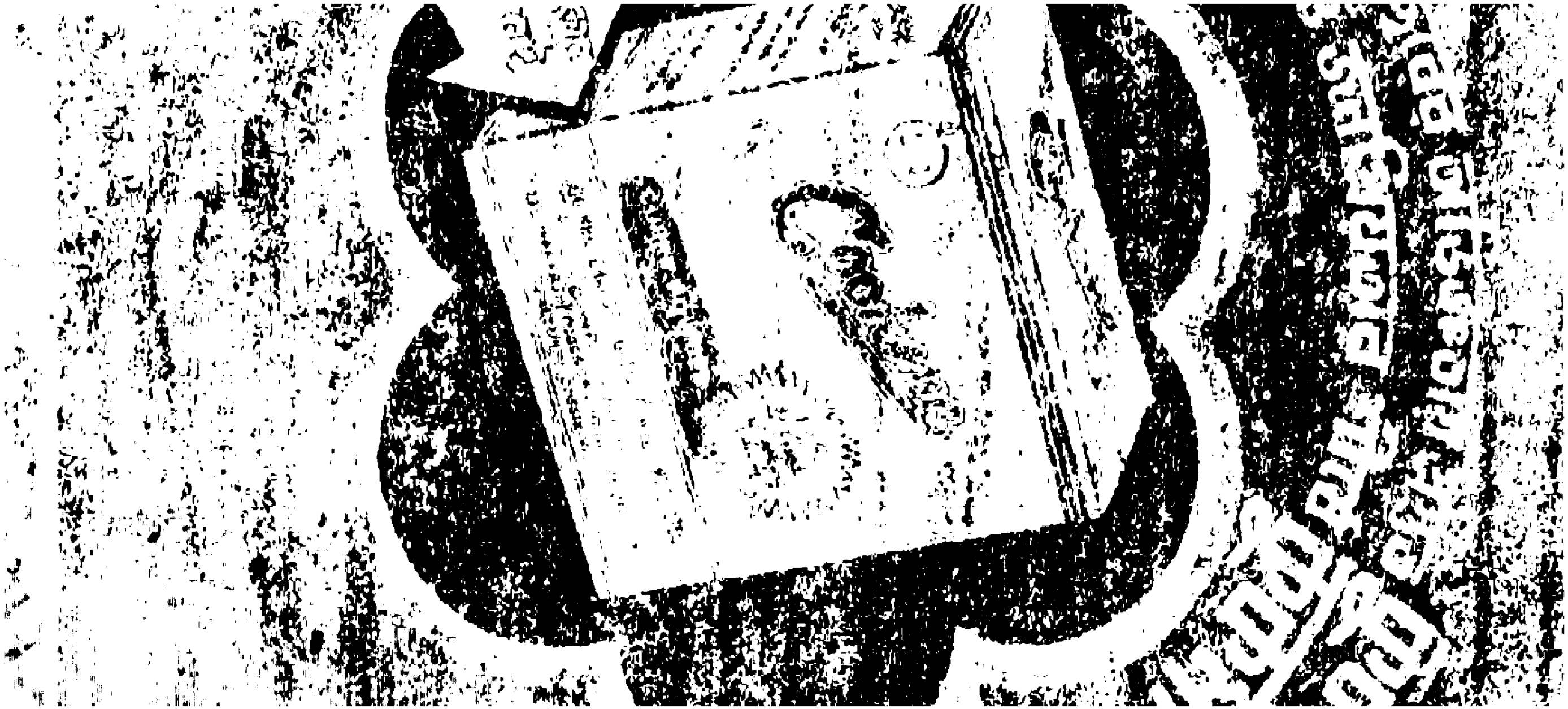
CENTRAL LIBRARY